মহাপ্রস্থানের পথে

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

[এই গ্রন্থের রচনাকাল বাংলা সন ১৩৩৯—১৩৪০]

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মহাপ্রস্থানের পথে

অষ্টম সংস্করণ

চার টাকা

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত
ও প্রভু প্রেস, ৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

"উদয়াচলের সে তীর্থপথে আমি
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী,
দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে ।
...   .
জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা,
অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমেষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।

ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
একূল হইতে নব জীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।
...   .
হে মোর সন্ধ্যা, যাহা কিছু ছিল সাথে
রাখিনু তোমার অঞ্চল-তলে ঢাকি।
আঁধারের সাথী, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখী।"

মহাপ্রস্থানের পথে

উপক্রমণিকা

মনের মানুষ মেলে না সংসারে, মানুষের মন তাই সঙ্গীহীন। আসলে আমরা সবাই একা। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন হয় বাইরের প্রয়োজনে —বন্ধুত্বের প্রয়োজন, সৃষ্টির প্রয়োজন, স্বার্থের প্রয়োজন।

সেদিন কম্বলা, ঝোলা, লোটা ও লাঠি নিয়ে যখন নিতান্ত একাকী হিমালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করতে হ'লো, সঙ্গী পেলাম না বলে' সেদিন কারো উপর অভিমান করিনি, নিরাসক্ত নির্লিপ্ত মানুষ চললো নিরুদ্দেশ হয়ে।

প্রথম বৈশাখের চিতা জ্বলচে চারিদিকে, সমগ্র আর্যাবর্ত জুড়ে চলচে সূর্যদেবের অভিশাপের অগ্নিবৃষ্টি, ধূ ধূ করচে চারিদিকের ফসল কাটা মাঠ, সারা আকাশ মেঘের তৃষ্ণায় খাঁ খাঁ করচে,—এমন দিনে কাশী হয়ে ছুটলাম হরিদ্বারের দিকে। যখন আমরা স্থাণু, সীমাবদ্ধ, গৃহগতপ্রাণ, শহর-সভ্যতার জোয়াল কাঁধে নিয়ে চোখে ঠুলি বেঁধে ঘুরি, তখন বুঝিনে এর বাইরে আছে বৃহত্তর জগৎ, উদার জীবন; প্রতিদিনের লাভ-ক্ষতি, সঙ্কীর্ণ জীবনের তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতার পিছনে আছে যে একটি পরম আহ্বান, একথা ভুলে যাই। চারিদিকে যেমন জমে জঞ্জাল, তেমনি জোটে মানুষ; কিন্তু যেদিন আসে পথের ডাক, যেদিন বাজে দূরের ব্যাকুল বাঁশি, সেদিন আমাদের গা-ঝাড়া দিয়ে একা-একাই ছুটে বেরুতে হয়। তখন আর অপেক্ষা নেই, পিছনে চাওয়া নেই।

পার হ'লো ফয়জাবাদ, পার হ'লো লক্ষ্ণৌ, পিছনে রইল বেরিলী, গাড়ি চললো ছুটে। আমার এই যাত্রার পথে কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছিল না,

আয়োজন ছিল না, এ যেমন বিশৃঙ্খল তেমনি আকস্মিক। রাত্রিশেষে লাক্‌সার অতিক্রম করে যখন হরিদ্বারে এসে পৌছলাম, তখন চেয়ে দেখি এ একেবারে নতুন রাজ্য! শীতের হাওয়ায় সর্বশরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেচে; এমন ঠাণ্ডা যে হাত-পা জড়িয়ে যায়। গরম থেকে মুক্তি পেয়ে আনন্দ হ'লো, শরীরে এল উৎসাহ, গতির চাঞ্চল্য। রাত্রিশেষের অন্ধকার, মাথার উপরে নক্ষত্র-খচিত কালো আকাশ, আশে পাশে কৃষ্ণকায় প্রহরীর মতো পাহাড়ের সারি, মধুর শীতল বাতাস—এদেরই ভিতর দিয়ে পথ চিনে চিনে চললাম ধর্মশালার দিকে। ধর্মশালাই তীর্থযাত্রীর পথের অবলম্বন।

হিমালয়ের যতগুলি প্রবেশ-পথ আছে তাদের মধ্যে হরিদ্বার হচ্ছে প্রশস্ত ও সুগম। এখানে তিনটি মাত্র ঋতু—বর্ষা, শীত এবং বসন্ত। নিকটে গঙ্গার নীলধারা, কলস্বনা, উপল-মুখরা। নদীর তীরে তীরে সন্ন্যাসীগণের আস্তানা ও আসন, ধুনি জ্বলচে, গঞ্জিকা চলচে; বেদ, গীতা, তুলসীদাসের আলোচনা। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান,—কুশাবর্তে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ—কোথাও চাঞ্চল্য নেই, জীবন-সংগ্রাম নেই, নির্বিবাদ এবং নির্লিপ্ত। এ সময়টায় বহু যাত্রীর ভিড়, অনেকেরই পথ বদরীনারায়ণের দিকে, চোখে-মুখে উৎসাহ, যাত্রার আয়োজন, তাদেরই সঙ্গে পাণ্ডা ও কুলীদের কচ্‌কচি। ছোট শহর, ছোট বাজার,—বাজারে শীতকালের আনাজ-তরকারি থরে থরে সাজানো—ওদিকে ভোলাগিরির ধর্মশালা ও আশ্রম। আশ্রমে বাঙালীর কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তিই বেশি। সকলেই গৃহবিরাগী, গেরুয়াধারী, মুণ্ডিতমস্তক—ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান অনেক আছেন, কোথাও তাঁরা আত্মপরিচয় দেন না, দেবার কথাও নয়, গঙ্গার তীরে এই আশ্রমে তপস্যায় তাঁরা জীবনকে উৎসর্গ করেচেন। শুনলাম, এই মনোরম নিভৃত যোগাশ্রমের মধ্যেও মানুষের ছোটোখাটো

কলহ সংশয় ও বিদ্বেষ মাঝে মাঝে সংযম ও তপস্যার আবরণ সরিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। তীর্থযাত্রী ছাড়াও অনেকে এখানে এসেচেন স্বাস্থ্য ফেরাতে।

সমুদ্রের তীরে আত্মহারা মানুষ যেমন নিরুপায় ভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, হিমালয়ের তীরে দাঁড়িয়ে তেমনি করে দূরের দিকে একবার তাকালাম। লক্ষ্যহীন নিরুদ্দিষ্ট পর্বত-শ্রেণী, এর কোথায় আরম্ভ আর কোথায় শেষ কিছুই বোঝবার উপায় নেই। কোন্‌দিকে বদরীনাথ?—শুধু মেঘের পরে মেঘ, পাহাড়ের পর পাহাড়—উত্তুঙ্গ, কঠিন, নির্দয়। আমি যে আসলে নার্ভাস, ভয়চকিত, আরামপ্রিয়, দুঃসাহস আছে অথচ সাধ্য নেই—একথা এমন করে এর আগে আর বুঝতে পারিনি। মনে হ'লো এখনো সময় আছে, ফিরে যাই, কিংবা এখানে কোনো আশ্রমে আত্মগোপন করে থেকে মাস দুই পরে দেশে ফিরে গিয়ে বলবো, ঘুরে এলাম!! অথচ ইতিমধ্যেই ভালো একটা লোহা-বাঁধানো লাঠি কিনেচি, ক্রেপ্‌ সোল্‌ ক্যাম্বিসের জুতো কিনেচি। ইসব্‌গুল, মিছরি, রান্নার মশলা, হরীতকী এবং আমাশয়ের ওষুধের পুঁটলিতে কাঁধের ঝোলাটা ভারী হয়ে উঠলো। যাত্রীদের কাছ থেকে আসচে অবারিত উৎসাহ ও উদ্দীপনা। কত ভয়, কত দুশ্চিন্তা, কত সান্ত্বনা। কী করি, পথের বিপদ ও কষ্টের গল্প শুনে প্রাণের ভয় বুকের মধ্যে গুরগুর করে উঠচে, কেমন করে ফিরি! দেশ থেকে যদি একটা বিপদসূচক জরুরী টেলিগ্রাম আসে ত বাঁচি'—এর চেয়ে জেলে যাওয়া যে ছিল ভালো। একবার মনেও হ'লো পথের ধারে দাঁড়িয়ে বার দুই 'বন্দেমাতরম্‌' উড়িয়ে না-হয় গ্রেপ্তারই হই,—কিন্তু মুখে আর আওয়াজ নেই, কণ্ঠে নেই শক্তি, হৃদয়ে নেই সাহস, কেবল নিরুপায় অনু-শোচনায় দূর রেলপথের দিকে একবার তাকালাম।

না, ফেরবার আর উপায় নেই, সঙ্গী নেই, বন্ধু নেই, পরিচিত কেউ নেই। যাত্রীদের মধ্যে প্রায় সবাই সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে এসেচে, ফেরবার আশা তারা আর হয়ত করে না, বিলিব্যবস্থা শেষ হয়ে গেচে, জীবনের মূল্য নিজেদের কাছে তাদের আর কিছুই নেই, হেঁটে হেঁটে দেহ ক্ষয় করে একদিন হয়ত কোথাও অন্তিম শয্যা পাতবে! এই ধর্মশালা থেকেই শীঘ্র একদল বাঙালী যাত্রী বদরীনাথ রওনা হবে। তাদের সঙ্গে একটি মাত্র পুরুষ, আর সবাই বৃদ্ধা এবং প্রৌঢ়া। স্ত্রীলোকদের পুণ্যকামনা এবং তীর্থযাত্রার আগ্রহ পুরুষের চেয়ে বেশি, এর পিছনে একটি তত্ত্ব হয়ত আছে, কিন্তু সে কথা এখন থাক্। পুরুষটি ব্রহ্মচারী, মুণ্ডিতমস্তক, নাম জ্ঞানানন্দ স্বামী, জাতিতে বাঙালী, বয়সে যুবক, ভদ্র এবং শিক্ষিত, মাথায় সিল্কের গেরুয়া-পাগড়ি, পায়ে মোজা ও জুতো, গায়ের জামা চাদর গেঞ্জি গেরুয়ায় ছোপানো,—অবস্থাপন্ন বলেই মনে হ'লো। সঙ্গে তাঁর মা আছেন, আর আছেন জনকুড়ি সহযাত্রিনী। সহজেই আলাপ জমে উঠলো। বললেন, 'আপনার যাবার ত কোনো কারণ নেই! এই দুর্গম পথ···কত বিপদ···আপনি বাড়ি ফিরে যান্!'

বললাম, 'সে কি, ফিরে যাবো? আমিও যে গেরুয়ায় কাপড়-চাদর ছুপিয়ে নিয়েচি, স্বামীজি!'

স্বামীজি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখে একটু হাসলেন। বললেন, 'সন্ন্যাস নিচ্ছেন নাকি? সে ত আপনার জন্যে নয়! আমার মনে হয় আপনার ফিরে যাওয়াই ভালো, এ বড় কঠিন পথ। তা ছাড়া গেরুয়া নিলেই ত আর, মানে··সন্ন্যাসী হতে গেলে তার মন্ত্র আছে, শোধন আছে, নানা ক্রিয়াকলাপ···আপনাদের জন্যে আমাদের হয় বদনাম, লোকে আমাদের বিশ্বাস করতে চায় না!'

আরো দু'চার কথা উপদেশ দিয়ে তিনি উঠে গেলেন। তাঁকে আর জানাতে পারলাম না যে, আমি সারাপথ এগিয়ে আসতে আসতে পিছিয়ে যাবার চেষ্টাই করেছি। কে যেন ভূতের মতো আমাকে টান্‌চে।

দু'দিন ধরে' পথে বাজারে নদীর ধারে মন্দিরে-মন্দিরে ঘুরে বেড়ালাম। কাকে জানাই মনের কথা? বাইরে উৎসাহ প্রকাশ করেচি, যাবার আয়োজন করেচি, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে আমার আর এতটুকু ইচ্ছা নেই—এ কথা আজ কে বিশ্বাস করবে? হায়, তবু যেতে হবে, আমায় না দেখে বাবা বদরীনাথের দিন আর কাট্‌চে না, আমাকে তাঁর চাই! বুঝলাম না এটা দৈববুদ্ধি, না দুর্দৈব!

তৃতীয় দিন অপরাহ্নে যাত্রা। যাঁদের সঙ্গে ধর্মশালায় থাকতে অল্প পরিচয় হয়েছিল তাঁদের কাছে ম্লান হেসে বিদায় নিলাম। ধর্মশালার ম্যানেজার একটি বাঙালী ছোকরা, নাম—চাটুয্যে, গাইয়ে-বাজিয়ে, মধুর ব্যবহারে তিনি সকল যাত্রীকে মুগ্ধ করেচেন। তিনি সকরুণ চোখে বিদায় দিলেন। পথে নেমে এলাম। পরণে গৈরিকবাস, কাঁধের একদিকে দড়ি দিয়ে বাঁধা কম্বল, আর একদিকে ঝোলা, হাতে লাঠি ও দড়ি-বাঁধা লোটা, পায়ে ক্যাম্বিসের নতুন জুতো। চোখে শূন্য দৃষ্টি, হৃদয়ে অবসন্নতা, আত্মগ্লানি, প্রাণে ভয়, দেহ নিরুৎসাহ,—এমনি করেই টল্‌তে টল্‌তে পথ দিয়ে চললাম। বাজার পার হয়ে এলাম বড় রাস্তার উপর, হৃষীকেশ পর্যন্ত মোটরবাস্‌ পাওয়া যায়। গলা শুকিয়ে উঠেছিল, এক ঘটি সরবৎ খেয়ে গাড়িতে এসে উঠলাম। দশ আনা ভাড়া, পনেরো মাইল পথ। কে যেন পিছন থেকে ঠেল্‌চে। হায়রে, "মন না রাঙায়ে কি ভুল করিলে, বসন রাঙালে যোগী।"

বেলা দেখতে দেখতে গড়িয়ে এল, পাহাড়ের পদতল থেকে মাথার

দিকে রোদ উঠ্‌লো, এক একজন করে' হৃষীকেশের যাত্রী এসে গাড়িতে চড়ে বসলো। কত জটলা, কত কলরব। মাথায় পাগ্‌ড়ি-বাঁধা, খোঁচা-খোঁচা দাড়িগোঁফ,—একটি সাধু এসে উঠলেন। তাঁর বয়স অল্প মনে হওয়াতে এবং তাঁর কাছেও ঝুলি-লোটা দেখে সাহস করে' করুণ কণ্ঠে বললাম, 'আপ কাঁহা যায়েঙ্গে, সাধুজি?'

মুখের দিকে চেয়ে তিনি হাসলেন। গাড়ি ততক্ষণে ছেড়েচে। তাঁর হাসি সন্ন্যাসীর স্বর্গীয় হাসি নয়, বন্ধুর হাসি। বললেন, 'বদরীনারায়ণ। ওঁ নমো নারায়ণায়!'

চুপ করে' মুখ ফিরিয়ে রইলাম। একটু আনন্দ হ'লো, যাক্ সঙ্গী পেলাম! কিন্তু সে-আনন্দ প্রকাশ ক'রে' দুর্বলতার পরিচয় দিতে বাধলো। মিনিট খানেক পরে ঝুলির ভিতর থেকে দু' খিলি সাজা পান বা'র করে' হাত বাড়িয়ে সাধুটি স্মিতহাস্যে বললেন, 'লিজিয়ে মহারাজ, খাইয়ে।'—বলে' অন্য হাতে তিনি বিড়ি বা'র করলেন।

মুখের দিকে মুখ তুলে তাকালাম। তিনি আবার হাসলেন। হেসে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'কোথা থেকে আসচেন?'

হেসে বললাম, 'এতক্ষণ চিনতে পারিনি, আপনি বাঙালী?'

'হ্যাঁ, আপনি বদরীনাথ যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

চলন্ত গাড়ির মধ্যে আলাপ চল্‌তে লাগ্‌ল। নাম তাঁর পাগ্‌লা ভোলা ব্রহ্মচারী; ব্রহ্মচারী বলেই পরিচিত। বহুদিন হ'লো সংসার ত্যাগ করেচেন, পরিব্রাজক হয়ে বহু দেশ পর্যটন করেচেন। সংসারে কে আছে এবং কে নেই তার হিসাব রাখেন না, রাখার প্রয়োজনও নেই। ভগবদ্‌গীতা তাঁর মুখস্থ,—সংসার মায়া, কর্মত্যাগেই মুক্তি, ভগবানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও

পরিপূর্ণ আত্মদান ছাড়া মানুষের গতি নেই, তুচ্ছ জীবন, মোক্ষলাভই পরম লক্ষ্য। ভক্তিভরে তাঁর বাণী শুন্‌ছিলাম। তিনি বিড়ি টান্‌তে টান্‌তে আলাপ করছিলেন। বাস্তবিক, জীবনে এই প্রথম সৎসঙ্গ পেলাম!

গঙ্গার তীরে তীরে গাড়ি চল্‌চে, কোথাও উঁচুনীচু পার্বত্য পথ, মাঝে মাঝে উপলখণ্ডময় শীর্ণস্রোতা ঝরণা, কোথাও কোথাও সন্ন্যাসীর আস্তানা, ছোট ছোট দেবালয়, নদীর ওপারে পাহাড়, নীচে বাব্‌লার ঘন জঙ্গল। গাড়ি ছুটে চলেচে। বাঁ দিকে রেলপথ দেরাদুনের দিকে গেচে, ছোট ছোট স্টেশন্ জনবিরল, দক্ষিণে হৃষীকেশের পথ। পথে যেতে পড়ল ভীমগোড়া চটি। এখানে আছে একটি গুহা, পুরাকালে ভীমের অশ্বক্ষুরাঘাতে গুহার ক্ষত নাকি গভীর হয়েছিল। তারপর এল সত্যনারায়ণের মন্দির, মন্দিরের কাছে কালীকম্বলীওয়ালার সদাব্রত চটি। যাঁরা দাগী সাধু সন্ন্যাসী, তাঁরা বিনামুল্যে এখানে আহার ও আশ্রয় পেয়ে থাকেন। গাড়ি কয়েক মিনিটের জন্য থামলে ব্রহ্মচারী নেমে মন্দির দর্শন করে এলেন। দেব, দ্বিজ ও সন্ন্যাসীতে তাঁর অবিচলিত ভক্তি!

দিনের অবসান হয়েছে, পশ্চিম দিগন্তের রক্তলেখা ইতিমধ্যে কখন ম্লান হয়ে গেচে, বনচ্ছায়া ও পর্বতের অন্ধকারে ঝিল্লিরব জেগে উঠেছে, গাড়ি এসে থামলো হৃষীকেশের এক ধর্মশালার নিকটে। সবাই নেমে এলাম। এতক্ষণে একটু নির্ভয় হয়েচি। কাছেই কালীকম্বলীওয়ালার বিরাট-ধর্মশালা, এখানেই তাঁদের হেড আপিস। এই কম্বলীওয়ালা ছিলেন এক সাধু। অখ্যাত, নগণ্য এই সাধু গিয়েছিলেন বদরীনাথে, সম্বল ছিল একখানি মাত্র কালো কম্বল। পথে পেয়েছিলেন অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট, উপবাসে দিন কাট্‌ত, দরিদ্র যাত্রীদের কাছে দরিদ্র সাধুর ভিক্ষাও জুটতো না। কিন্তু এই মহাপুরুষ একদিন নাকি আপন পরিশ্রম ও চেষ্টায়,

হৃদয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে দেশে দেশে ভিক্ষা সংগ্রহ করে নিরুপায় সাধু-সন্ন্যাসীর দুঃখ লাঘব করেচেন। তাঁরই কৃপায় এখন পথের মাঝে মাঝে 'সদাব্রত' প্রতিষ্ঠা হয়েচে। আজ তিনি এ জগতের কোথাও নেই, কিন্তু অসংখ্য নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর নতমস্তকের প্রণাম নিরন্তর তাঁর পদপ্রান্তে গিয়ে পৌছয়।

ব্রহ্মচারী বললে, 'আমাকেও ত সদাব্রত নিতে হবে দাদা! গরীব লোক, সেই আশাতেই ত এসেচি। আপনি একটু বলে কয়ে দিন্ দয়া করে।'

ভিতরে লোকজনের জটলা, কোলাহল, যাত্রীর ভিড়, তারই ভিতর দিয়ে পথ কেটে গদীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। হিসাবপত্র নিয়ে গদীর ম্যানেজার ও কেরানি বসে রয়েচে। আশেপাশে প্রায় জন পঁচিশ তিরিশ সাধু-ভিক্ষুক করজোড়ে করুণনেত্রে দণ্ডায়মান। কেউ কেউ প্রত্যাখ্যাত হয়ে আপন আপন অবস্থার কথা নিবেদন করচে, কেউ বদরীনারায়ণের শপথ করে বলচে, সে প্রকৃতই সন্ন্যাসী, পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে ভ্রমণের সখ নিয়ে সে আসেনি, সে নিতান্তই নিরুপায় তীর্থযাত্রী। ভাবগতিক দেখে ব্রহ্মচারীর মুখখানি শুকিয়ে গেল। এবং যখন সত্যিই শুন্‌লো, সেও সদাব্রতের টিকিট পাবে না, তখন সে সেইখানে বসে পড়ে বললে, 'কি হবে দাদা, আমি যে অনেক আশা করে···শুনেছিলাম যে আসে সে-ই টিকিট পায়!'

এ কথা সে জানে না, পৃথিবীতে এত বড় দানশীলতা কোথাও নেই। দান সম্বন্ধে কড়াকড়ি আছে বলেই দানের এত মূল্য!

এতএব নিরাশ হয়ে ব্রহ্মচারীকে ফিরতে হ'লো। তার মুখের চেহারা দেখে ভয় পেলাম, যে উৎসাহ ও আনন্দ দেখেচি তার পথে, সেটুকু

নিঃশেষে মুছে গেল, কণ্ঠ হ'লো রুদ্ধ, সর্বহারার মতো হতাশা-ম্লান চোখে তাকিয়ে সে বললে, 'তবে ফিরে যাই……সামান্য পাঁচ সাত টাকা নিয়ে এতদিনের পথ…… ফিরেই যাই তাহ'লে!'

মনটা খারাপই হয়ে গেল! বললাম, 'ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায়ই বা কী, সত্যি ত আর উপবাস করে পথ হাঁটা যায় না।'

পরমুখাপেক্ষার চেহারাই এমনি। যখন সে আশায় জ্বলে তখন দাবানল, যখন নিবে যায় তখন সে একেবারেই ভস্মস্তূপ। ব্রহ্মচারী যখন নিতান্ত বালকের মতো সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে লাগল, সে সময় স্পষ্টই অনুভব করলাম, ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস তার শিথিল হয়ে এসেছে! সদাব্রত না পেয়ে তার দারিদ্র্যের সত্য রূপটি আমার চোখে বিসদৃশ হয়ে ফুটে উঠল।

নীলধারার তীরে এসে বসলাম। অন্ধকার নদী, তরঙ্গসঙ্কুল, জলের উপরে নক্ষত্রের আলো ঝল্‌মল্ করচে, ভয়ভীষণ ও রহস্যময়; পর্বতের গভীর গহ্বর থেকে কালো জল বন্য জন্তুর মতো চীৎকার করে ছুটে আসচে, স্রোতের অবিশ্রান্ত শব্দে চারিদিক মুখর। তীরে বহুদূর পর্য্যন্ত কোথাও কোথাও ধুনি জ্বালিয়ে সন্ন্যাসীরা আসন পেতেচে। একটি নিরুদ্বেগ নিবিড় প্রশান্তি। তপস্যার উপযুক্ত স্থান বটে।

একখানা বড় পাথরের উপর দু'জনে নিঃশব্দে বসে ছিলাম। পাথরের গা বেয়ে জল ছুট্‌চে। একাই যাবো, তাকে ফিরে যেতেই হবে, কিন্তু কী বলে সান্ত্বনা দেবো তাই ভাবছিলাম, অথচ এক্ষেত্রে সকল সান্ত্বনাই উপহাসের মতো শোনাবে! আমার এ সমস্যার সে নিজেই সমাধান করে' নিল। অন্ধকারে সে তার আবেগ-আকুল দুই চোখ তুলে আমার একটি হাত ধরে বললে, 'দাদা, এত পরিশ্রম আমার পণ্ড হ'লো, ফিরেই তবে যেতে হবে, কি বলেন?'

বললাম, 'তাই ত ভাবচি।'

সে বললে, 'ভদ্রলোকের ছেলে আমি, তবু আপনার কাছে বলতে আমার বাধবে না, যদি কখনো দিন পাই আপনার দেনা আমি শোধ করব। ফিরে আর যাব না, পথে যেন উপবাস না করতে হয়, এই আপনার কাছে প্রার্থনা। ফিরে আর আমি যাবো না, দাদা।

'কত দুঃখে যে এসেচি সে আপনাকে কী বল্‌ব! ছ'শো মাইল পথ হেঁটে একদিন হরিদ্বারে এসে পৌচেছিলাম······আর কোনো সাধ নেই দাদা, বুঝলেন? একটিমাত্র আশা, মনের মতন একটি মঠ করে যাবো। বহুকাল থেকে বদরী যাবার ইচ্ছে, কতদিন ভেবেছি মনে মনে—,

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বললাম, 'চলুন, যা হবার তাই হবে। ফিরে গিয়ে আর কাজ নেই, উপবাস যদি করতেই হয়, দুজনেই একসঙ্গে করব। চলুন, রাত কাটাবার একটা জায়গা দেখে নিইগে।'

অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় ব্রহ্মচারী শুধু বললে, 'চলুন দাদা।'

অনেক অনুসন্ধান এবং সুপারিশের পর হাসপাতালের পাশে এক যাত্রিশালায় রাত্রিবাসের জায়গা পাওয়া গেল। যাত্রিশালার দালানে জায়গা অতি সঙ্কীর্ণ। অন্ধকারে বসে জনকয়েক গাড়োয়ালী কুলী-মজুর জটলা করছিল, শ্রদ্ধাসহকারে আমাদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে বসল। ভিতরে চেয়ে দেখি, একদল যাত্রী। বাংলা ভাষায় তাদের আলাপ শুনে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। একটি প্রায়-বৃদ্ধ ব্যক্তি অভ্যর্থনা করে বসালেন। সমস্ত ঘর জুড়ে জন পনেরো স্ত্রীলোক এখানে ওখানে ছড়িয়ে শুয়ে রয়েচে। বললাম, 'কোথা থেকে আসচেন আপনারা?'

'কালীঘাট থেকে। আপনারা?'

'আমি আসচি কাশী থেকে, উনি পরিব্রাজক!'

লোকটির এতখানি দাড়ি, যাত্রাওয়ালার মতো মাথার চুল, পরণে গেরুয়া, গায়ে একটা গরম ওয়েস্ট-কোট, পায়ে পাহারাওয়ালার মতো কালো বনাতের ফেট্টি বাঁধা। ছোট্ট একটা কল্‌কেয় তামাক সাজছিলেন। বললেন, 'আপনি ?'

বললাম, ব্রাহ্মণ,—আহা হা, করেন কি ? আমি যে বয়সে অনেক ছোট !'

'তা হোক, কেউটের বাচ্চা।' বলে' তিনি হঠাৎ জোর করে আমার পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিলেন। বললেন, 'বুড়োমানুষ, এতগুলি মেয়েছেলে নিয়ে এই দুর্গম পথে···একটু দেখবেন দয়া করে। পথের সঙ্গী !'—ঝুলি থেকে দু'টি বিড়ি তিনি আমাদের বা'র করে দিলেন।

তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আবার বাইরে এলাম। আলো-জাল্‌বার উপায় ছিল না। অন্ধকারে কম্বল ছড়িয়ে পাশাপাশি দু'জনে শুয়ে পড়লাম। ব্রহ্মচারী হাই তুলে তুড়ি দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার অভ্যাস মতো বলে উঠলো, 'ওঁ নমো নারায়ণায়, ওঁ তৎসৎ।'

বললাম, 'আমরা ত কেউ পথ চিনিনে, যাব কোন্‌দিকে ?'

'একই পথ, দ্বিতীয় নেই। পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে চল্‌বো দাদা, ভয় কি ? ওঁ নমো নারায়ণায়।'

অনেক গল্প চললো। অনেক পথের ইতিহাস, কত দেশ, কত রাজ্যের কথা। ব্রহ্মচারীর পথের জীবন বহু দিনের, কিন্তু তার বিপুল অভিজ্ঞতার ভিতর থেকে তার আত্মোপলব্ধি হয়নি। সে জীবনকে দেখেচে গীতার ভিতর দিয়ে, বেদের কয়েকটা শ্লোকে, মহাভারত ও রামায়ণের কয়েকটা ঘটনায়, ভগবানের প্রতি তথাকথিত পূর্ণ বিশ্বাসে। ধর্মের আলোচনায় তার হৃদয়াবেগের পরিচয় পাওয়া যায়, ধর্মজ্ঞতা ও জ্ঞানের প্রকাশ পাওয়া

যায় না। সংসারে সবই সে অবলীলাক্রমে বিসর্জন দিয়ে এসেচে, দেয়নি শুধু আশা। আশা নিয়ে সে বাঁচে, আশা নিয়ে তার তীর্থ পর্যটন, আশা নিয়েই তার ধর্মজীবন।

তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে শুয়ে শুয়ে তার কথা শুনে চলেচি। সে এক সময় বললে, 'কত জায়গায় আসন পাতলাম, বুঝলেন দাদা, বাঁকুড়ায় জয়নগর আছে জানেন ত, সেই গ্রামের এক গাছতলায়···তারপর গেলাম বৃন্দাবন, বৃন্দাবন থেকে সোজা জ্বালামুখী······উহু স্থবিধে হ'লো না—এলাম হরিদ্বারে। কিন্তু এখানেও তাই, সেই ধুনি জ্বালিয়ে মূর্খ সন্ন্যাসীর দল বসে বসে গাঁজা টিপ্‌চে, সেই তাদের ক্ষিধের সময় ক্ষিধে পায়······বিশেষ করে ওই নেশাখোর সন্ন্যাসীর দল আমার ভালো লাগে না। কী হয় ওতে বলুন ত? নেশার চোখেই যদি দুনিয়াকে দেখলাম—

ক্লান্তি এসেচে শরীরে; চোখ বুজে বললাম, 'তা ত বটেই।'

ব্রহ্মচারী হেসে বললে, 'তবে নিন্দে আমি করিনে দাদা। আমি বলি, নেশাই যদি দিনরাত করলে তবে সাধনার সময় কোথায়? সাধনা চাই, তপস্যা। যে-আসনে বসবে সে-আসনে একদিন আগুন জ্বলে উঠ্‌বে, নাক টিপে নাভিশ্বাস······নিন্দে আমি করিনে, তবে কি জানেন—'

সে নিজেই আবার বললে, 'দরকার মতো খাওয়া ভালো, সময় মতো, শরীর মন দুই-ই থাকে তাজা···ধরুন বেশ শীত পড়লো, ঠাণ্ডার দিন, কিম্বা ধরুন রাতে ঘুম হচ্চে না, হ্যাঁ তখন বুঝি···নিন্দে আমি করিনে দাদা, ওটা খাওয়া ত আর পাপ নয়, পাপ বললেই পাপ···ধরুন কে না খায়!'

বললাম, 'তা ত বটেই!'

'আমিও কি আগে খেতাম? কেমন যেন জম্‌তো না, ওটা অভ্যেসের কথা, হ্যাবিট্ ইজ্ দি সেকেণ্ড নেচার···হাঃ হাঃ হাঃ···

আপনি ত সবই জানেন দাদা, শিক্ষিত লোক আপনি।' বলতে বলতেই সে হঠাৎ আবার বলে' উঠলো, 'একটু কিনেছিলাম সেদিন, সেই গাঁজা রয়েচে ট্যাঁকে। খেতে আমার ইচ্ছে হয় না, কী হবে ও-সব, বদ্ অভ্যেস্! আঃ আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েচে দেখচি, এক হাত সাজবো দাদা?'

নির্জন, নিস্তব্ধ রাত্রি চারিদিকে তখন থম্ থম্ করচে। গঙ্গার জলের শব্দ এতদূর থেকেও শুনতে পাচ্ছিলাম।

যাত্রা

বৈশাখ ১৯, ১৩৩৯। সেদিন প্রথম আমাদের পদব্রজে যাত্রা শুরু হ'লো। কাঁধে বোঝা আর হাতে লাঠি নিয়ে দুই বন্ধুতে পথে নেমে এলাম। পাথর ও কাঁকরের পথ। বাঁ দিকে দূর পর্বতের চূড়ায় টিহরীর রাজপ্রাসাদ তাজমহলের ছবির মতো, তারই নীচে দেরাদুনের গভীর অরণ্য। দক্ষিণে প্রভাত-সূর্যের নিঃশব্দ সমারোহ আকাশে-আকাশে প্রসারিত হয়ে চলেচে। প্রস্তরসঙ্কুল শুষ্কপ্রায় চন্দ্রভাগা নদী পেরিয়ে কিছুদূর যেতে এলো মৌনী বন। বনের গায়ে সামান্য একখানি গ্রাম, ভরত-শত্রুঘ্নজীর মন্দির। মন্দির পার হয়ে ধীরে ধীরে চললাম। পাহাড়ের চড়াই শুরু হ'লো, আমাদের গতি হ'লো মন্থর। পাহাড়ের পথে যেতে যেতে গল্প করা চলে না। মুখ যখন বন্ধ থাকে, মন তখন আপন কাজ করে যায়। মাইল দুই পথ পার হতেই আমাদের যথেষ্ট পরিশ্রম হ'লো, নতুন জুতো পায়ে লাগচে, ব্রহ্মচারী চল্‌চে বকের মতো টপ্‌কে টপ্‌কে, বহুকাল পরে তার পায়ে উঠেচে জুতো, জুতো পরার উল্লাসে তার পা দুখানা কথা কইতে কইতে চলচে। অনেক উঁচুতে উঠে পথ আবার নীচের দিকে নাম্‌লো। পার্বত্যপথ আপন ইচ্ছায় যাত্রীদের টেনে নিয়ে যায়। সমতল ভূমিতে যেমন আমাদের অবাধ স্বাধীনতা, যেদিকে খুশি এঁকে বেঁকে চল্‌তে পারি, এখানে তার উপায় নেই, এখানে তুমি পথের অধীন, পথের নির্দেশেই তোমাকে যেতে হবে। ক্রমে জলের শব্দ প্রখর হয়ে উঠলো, বুঝলাম নীচে নেমেচি। আরো কিছুদূর এসে লছমনঝুলা পেলাম, গঙ্গার নীলধারার পরে পুল, দু'দিকে লোহার কাছি দিয়ে বাঁধা টানা

সাঁকো। বদরীনারায়ণের পথের প্রায় সমস্ত পুলই লছমনঝুলার আদর্শে তৈরী, পার হতে গেলে সমস্তটা দোলে, পুল ছিঁড়ে পড়ে যাবার ভয় হয়, আমোদও লাগে। পুল পার হয়ে কয়েকজন বাঙালী পুরুষ ও মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লো। আমরা বদরীনাথের পথে পা বাড়িয়েচি শুনে তাঁরা বিস্মিত হলেন, শুভেচ্ছা জানালেন, নমস্কার করে বিদায় দিলেন।

সম্মুখে গগনস্পর্শী নীলকণ্ঠ পর্বত, তারই নীচে দক্ষিণে স্বর্গাশ্রমের শ্বেত মন্দির, হাঁসের পালকের মতো শাদা, পদতলে গঙ্গার নীল স্রোতপ্রবাহ। বিদায় স্বদেশ, বিদায় সভ্যতা, বিদায় জনসমাজ! আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিত, মনে মনে সকলের নিকট বিদায় নিলাম। চোখে আমাদের সুদূরের পিপাসা, অন্তরে উদ্দীপনা ও উৎসাহ, বুকে দুঃসাহসিক পথযাত্রার দুর্জয় আনন্দ। আমরা গৃহবিরাগী, কিন্তু তবু মন ভারাক্রান্ত হয় কেন? কেন এমন করে পা কাঁপে, কেনই বা গলার ভিতরে কী যেন ঠেলে ওঠে? হয়ত এমনিই হয়! মানুষের এই ছেড়ে চলে যাওয়ার পিছনে আছে একটি অনন্ত বেদনার সুর। এত মায়া, এত মমতা, এত হৃদয়াবেগের খেলা, তথাপি ঠিক সময় চলে যেতে হয়, বিদায় নিতে হয়! একদিন হয়ত সকালের এই নির্মল আলো, উজ্জ্বল রোদ চোখ থেকে মুছে যাবে; হয়ত এই আকাশ, এই গঙ্গা, এই পর্বতমালা, ধরিত্রীর চারিদিকের এই মনোরম ঐশ্বর্যসম্ভার হারিয়ে আমি বিদায় নেবো, সেদিনের হয়ত আর দেরিও নেই, সেদিনও এই মরজগতে এমনি করেই চলবে আনন্দ-কলরব। কিন্তু যে-ক্ষুধা, যে-আশা, যে-স্বপ্ন যাবার বেলায় পথের প্রান্তে ফেলে যাবো তার দিকে কেউ ফিরেও চাইবে না!

কষ্টদায়ক বন্ধুর পথ, প্রস্তরসঙ্কুল, মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে পত্রপল্লবের ভিতর এক একটা ঝরনার শব্দ শুনতে পাচ্চি। শেষ বসন্তের

ঝরাপাতায় পথ আচ্ছন্ন, মানুষের সমাগম প্রায় নিঃশেষ হয়ে এলো, আর সাড়াশব্দ নেই। নতুন জুতো পায়ে লাগচে! পিঠে বাঁধা কম্বল ও ঝোলার দড়িতে কাঁধ কন্ কন্ করচে, শরীর ক্লান্ত হয়ে এলো। নানা জনের নানা উপদেশ পেয়েছিলাম, কিন্তু সে উপদেশ মাত্র, পথে এসে তার সার্থকতা খুঁজে পেলাম না, খেই হারিয়ে গেল। ঘণ্টা দুই চলবার পর ব্রহ্মচারী শুষ্ককণ্ঠে বললে, 'আসুন দাদা, একটু বসে যাই, জলতেষ্টা পেয়েচে।'

ছায়াশীতল পথের প্রান্তে দুজনে বসলাম। নীচে নদীর কলধ্বনি, বনময় পাহাড়, কাছেই একটি অতি ক্ষুদ্র মন্দির, নিভৃত ও প্রশান্ত,—পূজারী আমাদের পানীয় জল দিলেন। জল খেয়ে ব্রহ্মচারী বিড়ি টানতে লাগলো। গল্প করার আর কিছু নেই, কী গল্পই বা করবো?—আস্তে আস্তে পা ছড়িয়ে সেইখানে শুয়ে পড়লাম।

সংসারে হৃদয়াবেগের মূল্য নেই জানি, তবু এই পথের ধারে শুয়ে কোথায় যেন অভিমান ভরে' উঠতে লাগলো। সখের বশে দেশভ্রমণ করে' বেড়ানো আমার পেশা নয়, যারা হৈ চৈ করে দলবদ্ধ হয়ে হাওয়া বদ্‌লাতে বেরোয় তাদের কথা ধরিনে, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে যাদের ভাবালুতা আসে সেই স্বল্পপ্রাণ উচ্ছ্বাসসর্বস্ব লোকগুলোকেও জানি, অথচ নিজেকেও ত এদের থেকে আলাদা করে দেখতে পারিনে। আজ যে সবাইকেই ভালো লাগচে! যারা বন্ধু, যারা বিরূপ, যাদের ফেলে এসেচি, যে জন্মভূমি আমার পরমায়ুকে সঞ্জীবিত করেছে, সমাজ ও লোকালয়, অখ্যাত ও অনাদৃত, কেউ ত আমার পর নয়! আজ আমার সন্ন্যাসীর বেশ, কিন্তু সে যে শুধু পরিচ্ছদ, শুধু বহিরাবরণ, দেশের কথা মনে হলেই যে এখনো দেহের লক্ষ লক্ষ স্নায়ু ঝন্‌ঝন্ করে বেজে ওঠে! অবলীলাক্রমে সেদিন যে-মমতার আশ্রয় ছেড়ে এসেছি,

উদাসীন হয়ে যাদের কাছে বিদায় নিয়েচি, আজ এই সন্ন্যাসের কৃত্রিম আবরণের নীচে বিচ্ছেদ-কাতর মন বলচে, 'তোমরা আমায় ভুলে যেয়ো না, আমি আছি, বেঁচে আছি।'

একদিন সবাই মরবে, কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাওয়ার মতো সান্ত্বনাহীন মৃত্যু আর কিছু নেই! আমরা নিরুপায়, দুর্বল, ভাগ্যের ক্রীড়নক, তবু যে আমরা নিরন্তর বেঁচে থাকতেই চাই! এই বাঁচার চেষ্টা অবিশ্রান্ত চলেচে সমস্ত পৃথিবীময়। কেউ বাঁচে নবজীবনসৃষ্টির মধ্যে, কেউ শিল্প ও সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে বাঁচে, কেউ খ্যাতি ও যশ আহরণ করে বাঁচতে চায়,—এই যে সমাজ, সভ্যতা, বিজ্ঞান, সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা, এদের মূলে রয়েচে মানুষের বাঁচার অনন্ত পিপাসা। যারা জীবনকে অসার জেনে মোক্ষপ্রাপ্তির ক্ষুধায় তীর্থভ্রমণে পা বাড়িয়েচে তাহারাও চায় বাঁচতে, তাদেরো দেখেচি পথের ধর্মশালায় নিজ নিজ নাম লিখে রাখার কি অপরিসীম আগ্রহ আর অধ্যবসায়!

ব্রহ্মচারী গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলো। বল্‌লে, 'চলুন দাদা, বেলা হয়ত বারোটা হয়ে গেচে, ক্ষিধে পেয়েচে আপনার নিশ্চয়ই।'

নিশ্বাস ফেলে ঝোলা ও কম্বল বাগিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, 'ক-মাইল হাঁটা হলো ব্রহ্মচারী?'

পথে মাইল-পোস্ট আছে। ব্রহ্মচারী মনে মনে হিসেব করে' বল্‌লে, 'মাইল পাঁচেক।'

আরো কিছুদূর এসে গরুড় চটি পাওয়া গেল। একখানা বড় ধর্মশালা। নীচে একটি দোকান, দোকানে বেশি দামে সব আহার্যই পাওয়া যায়। ধর্মশালার পাশে সুন্দর একখানি বাগান ও জলাশয়। নিকটে পাহাড়ের গায়ে একটি খরস্রোতা ঝরণা, তারই জল এই জলাশয়টিতে

যাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত হয়। চটিতে রান্নার জন্য পিতলের বাসন পাওয়া যায় এই সর্তে যে, চটিওয়ালার নিকট ডাল আটা ঘি চাল ইত্যাদি কিন্‌তে হবে। যারা কিছু কিন্‌বে না, তাদের পক্ষে চটিতে স্থান পাওয়া কঠিন। অনেক চটিতে মাথা পিছু দু'পয়সা দিলেও আশ্রয় পাওয়া যায়। সকল চটিতেই প্রায় একই নিয়ম। এবেলার মতো এখানেই বিশ্রাম, ওবেলায় আবার যাত্রা। চটির দোতলায় তখন বহু যাত্রীর সমাবেশ হয়েচে! বিশ্রামান্তে দুই বন্ধুতে রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হলাম।

এমনি করেই আমাদের যাত্রা। দু'বেলা রান্না, দু'বেলা বাসন মাজা, দু'বেলা পথ হাঁটা। দুপুরবেলায় আহারাদির পর অগাধ নিদ্রা, মাছির তাড়নায় মরা মানুষের মতো আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া; বিকালবেলা আবার পথ হাঁট্‌তে শুরু করা, সন্ধ্যায় কোনো এক চটিতে আশ্রয় নেওয়া, আহারান্তে জানোয়ারের মতো ঘুম, সন্ধ্যারাতেই ঘুমে অচেতন। চটিগুলো আস্তাবলের মতো, তিন দিক বন্ধ, এক দিক খোলা, গাছের গুঁড়ি ও ডাল-পাতা দিয়ে তৈরী, কাঁকর-পাথর মেশানো মাটি দিয়ে লেপা, নিতান্ত দরিদ্র ও সামান্য। আমরা যাত্রীর দল গিয়ে সাজপোষাক ছেড়ে গা এলিয়ে দিতাম। ক্লান্তি আর অবসাদে মুখে কথা ফুট্‌তো না।

যাত্রীরা এসেচে নানা দেশ থেকে। কেউ দক্ষিণী, কেউ সিন্ধি, কোনো দল পাঞ্জাবী, খোট্টা, মাড়োয়ারী, উড়িয়া, গুজরাটি, মারহাট্টি, —বাঙালীর দল এদের মধ্যে ছড়ানো। সাধারণ ভাষা উর্দু এবং হিন্দির সংমিশ্রণ। দু'চারজন ছাড়া সকলেরই পায়ে জুতো, বেশির ভাগ জুতোই ক্যাম্বিসের, তলায় রবারের সোল, এই জুতোই সুবিধা। হাতে একগাছা লাঠি নিতেই হবে, নৈলে শেষ পর্যন্ত পথ চলা অসম্ভব। লাঠিই পথের একমাত্র উপকারী ও নিঃস্বার্থ বন্ধু। অনেক যাত্রী যায়

গাড়োয়ালী কুলীর পিঠে, কুলীদের অসীম শক্তি। কাণ্ডিওয়ালা তাদের নাম। কাণ্ডিটা একটা ঝুড়ির মতো, পিঠের দিকে বাঁধা থাকে, তাতে মালও যায়, মানুষও যায়। কাণ্ডির উপরে স্ত্রী-যাত্রীই বেশি সংখ্যায় ওঠে। ডাণ্ডিগুলো ঈজি-চেয়ারের ধরণ, তলায় ডাণ্ডা লাগিয়ে চারজন কুলী কাঁধে তুলে নিয়ে পাল্কীর বেহারার মতো চলে। সম্রান্ত যাত্রীরা ডাণ্ডি করেই যায়, এইটিই সকলের চেয়ে আরাম-দায়ক। ঝাঁপানও আছে, মড়ার খাটের মতো তার চেহারা, আসনপিঁড়ি হয়ে বসে যেতে হয়, পথশ্রম বাঁচে বটে কিন্তু আরামটুকু নেই। প্রথম-প্রথম যাত্রীরা দলে দলে উৎসাহের সঙ্গে হাঁটতে থাকে, দু'চারদিন ছ'দিনের পর দেখা যায় তাদের গতি হয়েচে মন্থর, কেউ চল্‌চে খুঁড়িয়ে, কেউ হাঁটচে লেংচে, কেউ পড়েচে পিছিয়ে, কেউ রোগাক্রান্ত, কারো এসেচে বিতৃষ্ণা, কেউ গেল ফিরে। প্রথম দিকে যাদের দেখেছিলাম সুস্থ, সবল, প্রফুল্ল ও মিষ্টভাষী, —কয়েকদিন পরে দেখা গেল দেহ তাদের শীর্ণ, ধূলোয় ও রোদে মলিন, করুণকাতর দৃষ্টি, পায়ের হাঁটুতে হয়ত ধরেচে ব্যথা, মুখে চোখে অস্বাভাবিক বিতৃষ্ণা, অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজ। কাছে এসে দাঁড়ালে ভয় করে। যাত্রীদের এই অবস্থা কুলীরা বোঝে। তাই যারা বেকার কুলী তারা পিঠে খালি কাণ্ডি ঝুলিয়ে দিনের পর দিন ধৈর্যসহকারে দলবদ্ধ যাত্রীদের পিছনে পিছনে হাঁটতে থাকে। ক্রমে ক্রমে দেখা যায় একটি একটি করে তাদের খরিদ্দার মিল্‌চে, তখন তারা গরজ বুঝে বেশি দর হাঁকে, এবং তা দিতে হয়; গরজ বড় বালাই। এ পথে সভ্যসমাজের মতো চুরি-ডাকাতি রাহাজানি এসব কিছু নেই, যাত্রীরা এদিক দিয়ে যথেষ্ট নিরাপদ। কুলীরা বিশ্বাসী, ভদ্র ও সরল। অর্থের প্রতি তাদের মোহ আছে কিন্তু তার জন্য দুষ্প্রবৃত্তি নেই। তারা বিবাদ করবে কিন্তু প্রবঞ্চনা

করবে না। তারা দরিদ্র বটে, কিন্তু দারিদ্র্য তাদের হৃদয়কে কলুষিত করেনি। বিত্তহীন, কিন্তু চিত্তহীন নয়।

উত্তরাখণ্ডের গঙ্গার তীরে তীরে আমাদের পথ। এপারে বৃটিশ গাড়োয়াল, বাঁ-দিকে নদী, ওপারে টিহরী-গাড়োয়াল। করদ রাজ্য, নামেমাত্র স্বাধীন। গঙ্গা, অলকানন্দা ও মন্দাকিনীই সাধারণত সেই রাজ্যের নির্দিষ্ট সীমানা। গাড়োয়ালীদের গ্রাম কোথাও কোথাও দু'মাইল পর্যন্ত উঁচুতে অবস্থিত। গ্রামবাসীরা সকলেই অবস্থাপন্ন বল্‌তে হবে। সকলেই চাষী। পাহাড়ী ঢালু জমিতে খাঁজ কেটে কেটে তারা এক আশ্চর্য উপায়ে শস্য উৎপাদন করে—গম, আলু, অড়হর, কপি সরষে ইত্যাদি। বয়সে যারা যুবক, কিংবা বোঝা বহনে সমর্থ বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়, তারা চৈত্রের শেষে পথে নেমে আসে, হরিদ্বারে গিয়ে যাত্রীদের ধরে, বোঝা পিঠে নিয়ে পাহাড়ে ওঠে। হরিদ্বার থেকে মেহলচৌরী পর্যন্ত তাদের গতিবিধি সীমাবদ্ধ, এর বাইরে যাবার হুকুম তাদের নেই। মেহলচৌরী গাড়োয়াল জেলার শেষ সীমানা। পৃথিবীতে কোথাও যে সমতল ভূমি আছে, শহর আছে, রঙ্গালয় আছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, এ তারা ভাবতেই পারে না। রেলপথে যে ট্রেন দৌড়য়, জলে যে জাহাজ ভাসে, মাঠে যে ফুটবল খেলা হয় এ তাদের কাছে স্বপ্ন। শীতের দিনে এরা কেমন করে' বাঁচে জানিনে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে 'কম্বল মুড়ি দিয়ে রাত কাটাতে হয়। কুলীরা জাতিতে প্রায়ই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, যাত্রীদের সঙ্গে তারা শোয়, বসে, গল্প করে, ভুরা তামাক টানে, কিন্তু তাদের ছোঁয়া তারা খায় না! আহার সম্বন্ধে তাদের বিস্ময়কর শুচিতা। আমিষ ভক্ষণ তারা পাপ মনে করে। জীবহিংসা তাদের একেবারেই নেই। তাদের মেয়েরা ঘরের কাজ নিয়েই কেবল বসে থাকে না, তারাও চাষ করে, গৃহপালিত

পশুর তদ্বির করে, কম্বল বোনে, জামা কাটে, তেল-ঘী তৈরী করে, পাহাড়ের বন থেকে কাঠ কেটে আনে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে পিঠের উপর বেঁধে নিয়ে ভ্রমণে বেরোয়! পথে যেতে যদি কোনো গ্রাম পড়ে অমনি বয়স্থা মেয়েরা ও বালক-বালিকারা বেরিয়ে এসে যাত্রীদের কাছে হাত পাতে। বলে, 'এ শেঠজি, এ রাণা, সুই-সুতা দেও, পাই-প্যায়সা দেও, এ রাণা, দে রাণা!'—সুই-সুতো এবং সিকি পয়সা ছাড়া তাদের ভিক্ষা করবার আর কিছু নেই। যদি পুরো একটি পয়সা পায় ত মহা খুশী, যেন অপ্রত্যাশিত ঐশ্বর্য হাতে এল। ছুঁচ-সুতোয় তাদের অদ্ভুত আসক্তি। এ বস্তুটি গাড়োয়াল জেলায় নাকি মেলে না।

চতুর্থ দিন প্রাতে উৎরাই পথে আমরা ব্যাসঘাটের দিকে চললাম। পর্বতচূড়া থেকে জলধারার মত যাত্রীরা নেমে চলেচে। যখন কোনো নদী পার হতে হয় কিম্বা এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে চড়তে হয় তখনকার পথ উৎরাই। উৎরাই পথে নামবার সময় বিপদ আছে—হোঁচট্ খাওয়া বা পা পিছলানোর ভয়। অতি সন্তর্পণে এবং সতর্কতার সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা নামতে নামতে বিরক্তি ধরে। পায়ের হাঁটুতে জোর লাগে, ব্যথা জমে, শেষ পর্যন্ত পা খারাপ হয়ে যায়। চড়াই পথে উঠতে-উঠতে কোমর-পিঠ-ঘাড় কন্‌কন্ করে, বুকের মধ্যে ব্যথা ধরে, দাঁতে-দাঁত চেপে মুখের যন্ত্রণা হয়। দূরে চড়াই পথ আছে সংবাদ পেলে আমরা ভীত হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাই—যেন আসন্ন বিপদ পথে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করে রয়েচে।

আকাশ সেদিন প্রাতে মেঘে মেঘে মলিন। নয়ার নদী ও গঙ্গার সঙ্গমে হু হু করে হাওয়া উঠেচে। নূতন এক রাজ্যে উত্তীর্ণ হয়ে এসেচি। আজ সকাল পর্যন্ত বত্রিশ মাইল পথ হাঁটা হ'লো। সমতল ভূমিতে এইটুকু

পথ অতিক্রম করতে আমাদের পরিশ্রম সামান্যই হয়, কিন্তু এ যে পাহাড় —দুর্গম, দুরারোহ, প্রস্তরসঙ্কুল। এ পথের শেষ নেই, বিচ্ছেদ নেই,— একঘেয়ে, যন্ত্রণাদায়ক পথ। নয়ার নদীর পুল পার হয়ে ব্যাসগঙ্গার তীরে এক চটিতে এসে উঠলাম। গতদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কয়েকটা চটি পার হয়ে এসেচি,—নাইমুহানা, বিজনী, বান্দর, শেমালু, কান্দি ইত্যাদি। বান্দর চটিতে সেদিন রাত্রে এক কাণ্ড! নিদ্রিত অবস্থায় আমাদের দুই বন্ধুকে প্রকাণ্ড এক পাহাড়ী সাপ সস্নেহে আলিঙ্গন করেছিল, কিন্তু কী সৌভাগ্য, চুম্বন করেনি! লাঠির ঘায়ে সাপ মরলো কিন্তু সেই সূত্রে এক পণ্ডিতজির সঙ্গে জম্‌লো বন্ধুত্ব। পণ্ডিতজির বাড়ি মধ্যভারতের বুরহানপুর জেলায়। একা মানুষ, পাকা তীর্থযাত্রী। বছরখানেক থেকে তিনি পরিব্রাজক হয়ে সকল তীর্থ ঘুরচেন। সন্ন্যাসী-যোগীর বেশ, তাই রেলওয়ে কোম্পানী তাঁর কাছে কখনো ভাড়া আদায় করতে পারেনি। না পারার কারণও ছিল, তাঁর চতুর ও মধুর আলাপে বনের পশুও বশীভূত হয়। লোকটির বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পয়ষট্টির মধ্যে। রোগা ও দীর্ঘ দেহ, কয়েকটা দাঁত নেই, চাতুর্য ও ভগবদ্‌ভক্তির সংমিশ্রিত দীপ্তিতে দুটো চোখ উজ্জ্বল, গলায় ছড়া চার পাঁচ রুদ্রাক্ষের মালা, জপে বসে থলিটি খুলে ফোঁটা-চন্দন-তিলক সেবা করেন, মুখে বোল্ ছিল 'সীতারাম'। ইতিমধ্যে আমরা দলে একটু পুরু হয়েছি, সেই কালীঘাটের যাত্রীরা এসে মিলেচে। দীর্ঘকেশ, গঞ্জিকাসেবী বৃদ্ধ দাদাটি এসে পৌছেচেন, তাঁর পিছনে আছে এক পাল বুড়ী। বুড়ীদের উৎসাহ, ধৈর্য ও সহনশীলতা দেখে বিস্মিত হতে হয়।

চারুর-মা'র কোমর ভাঙ্গা, কুঁজো হয়ে চলে, আখের ছিবড়ের মতো শীর্ণ কঙ্কাল দেহ, কালীঘাটে দুধ বিক্রি করে খায়; অনেকগুলি গোরুর

মালিক সে। সংসারে তা'র এক মেয়ে আর কয়েকটি গোরু ছাড়া আর কেউ নেই। মেয়ের নাম চারু।

'শুনচ, অ বা'ঠাউর, ভাদুর যেদিন ছেলে হ'লো···কী বিষ্টি, তেমনি অন্দকার। আমি বলি, আর বুঝি বিউতে পারে না···কিন্তু কানি, জুমুনি, পাগ লি, ওদের বেলা···'

'কি বকিস্ লা চারুর-মা, গজর গজর করে?,—বামুন-বুড়ি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—'এই জন্যে তোকে আন্‌তে চাইনি। গরুর আদিখ্যেতা শুন্‌তে শুন্‌তে···যদি এতই কুট্‌কুটুনি তবে এলি কি জন্যে? আমি মরি শীতের জ্বালায়, আর তুই···দে তোর কম্বলখানা আমার গায়ে চাপিয়ে।

'আহা, শোনো না গল্পটা বামুন-মা? তা'পর, বুঝলে বা' ঠাউর—?'

'থাম্ থাম্ আ মর্, অবাধ্য মাগি...ছুঁস্‌নি আমাকে, ওইখানে সরে বোস্, ইত্যিজাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমার জাতধর্ম আর কিছু রইল না। দেশে গিয়ে প্রাচিত্তির না করলে আর—'

অস্পৃশ্যা চারুর-মা অপ্রস্তুত হয়ে সরে যায়।

দাদার সঙ্গে আছে অম্‌রা সিং। যুবকটি পাণ্ডার লোক, পথনির্দেশক হয়ে যাত্রীদের বদরীনাথ পর্যন্ত পৌঁছে দেবার ভার নিয়ে এসেচে। শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ-সন্তান। কিছু লেখাপড়াও জানে, দেবপ্রয়াগ থেকে কিছুদূরে পাহাড়ের কোন্ এক গ্রামে তার বাড়ী। বৎসরান্তে অর্থ উপার্জনের জন্য হরিদ্বারে নেমে যায়। যাত্রীদের সুখ-সুবিধার দিকে তার প্রখর দৃষ্টি,—সামান্য বিশ তিরিশ টাকার জন্য প্রায় সাড়ে তিনশো মাইল তাকে হেঁটে যেতে হয়। লোকটি ভদ্রবেশী বর্বর নয়, ভদ্রই।

ব্যাসঘাটে প্রকৃতির অপূর্ব প্রকাশ। উদার পর্বতশ্রেণী, মেঘকজ্জল আকাশের ছায়া নেমেচে নদীতে, নদীর প্রস্তর-আবর্তে ঘুরে ঘুরে লক্ষ

লক্ষ সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে চলেছে স্রোতের কলকল্লোল,—দূর-বিস্তার বালির চড়ায় কোথাও কোথাও এক আধজন সন্ন্যাসী জপে বসেচে। ঘনশ্যাম বনরেখা, তার ভিতর দিয়ে ঝরণার শব্দ, একটি অনির্বচনীয় অবকাশ! কিন্তু বিশ্রামের সময় আমাদের নেই। এই স্বপ্নরাজ্যের শোভা যেমন এক চোখে দেখেচি, তেমনি অন্য চোখে ছিল পথের জ্বালা, অপরিমিত দুঃখ, অসহ্য কষ্ট। এখনো ভাবচি, কেমন করে ফিরে যাই, দু'চারজনকে ফিরে যেতে দেখচি, আমার যাওয়াই বা এমন কী অপরাধ? এখনো সময় আছে, কখনো তিনদিন হাঁটলে জন্মভূমিকে স্পর্শ করতে পারি, পথ এখনো গভীরে ডুবে যায়নি, এরপরে অনুশোচনার আর অন্ত থাকবে না! ফিরে গেলে লোকলজ্জা একটা আছে জানি, কিন্তু সেই সামান্য লোকলজ্জার কাছে এমন জীবনকে বলি দেবো? না, মরতে আমি পারব না; মৃত্যুতে আমার বড় ভয়!

'তুমি কেন এলে বাবা তীর্থ করতে? এই অল্প বয়সে—

বললাম, 'তীর্থ করতে আমি ত আসিনি!'

'তবে? তবে এলে কেন এই দুর্গমে বাবা? হ্যাঁ গা, অ ছেলে?

'এমনি বেড়াতে এসেচি বুড়ী-মা।'

'বেড়াতে এসেচ! ও মা কি হবে গো, বেড়াবার কি আর জায়গা পেলে না? বিয়ে হয়নি বুঝি?'

হেসে বললাম, 'বিয়ে হ'লে কি কেউ আসে না এ পথে?'

একজন বললে, 'আহা, সে বাবার দয়া! যাকে টানেন সেই—'

বললাম, 'বাবার দয়া যে চায় না সে কেন আসে বুড়ি-মা?'

বুড়ী চোখ কপালে তুলে বললে, 'বাবার দয়া চায় না, এমন মানুষ···সে যে নাস্তিক, বাবা!'

মাইল কয়েক রাস্তা গিয়ে কানাঘুষোয় শুনলাম, আমার মতো নাস্তিক আর ভূ-ভারতে নেই! নিন্দা এলো, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আসতে লাগ্‌লো, আমার প্রতি বুড়ীদের শ্রদ্ধা ও স্নেহ বিলুপ্ত হ'লো, পথে আমার মতো অহঙ্কারী, আত্মম্ভরী, নাস্তিক যাত্রীর দেখা পাওয়া মহাপাপ। নতমস্তকে তাদের মন্তব্য মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য গতি ছিল না!

'ও কিছু না, বুঝলে দাদা, ওসব মেয়েমানুষের কথা। পাগলে কী না বলে আর ছাগলে—' ব্রহ্মচারী বলে।

'কী বল্‌চে, আমি ত শুন্‌তে পাইনি!'

'শুন্‌তে না পাওয়াই ভালো! বলে কানে দিয়েচি তুলো আর পিঠে বেঁধেচি কুলো।' ওসব মেয়েমানুষের কথায় কান দিতে নেই—ওরা ভারি পুণ্যি করতে এসেছে!'

সেদিন বহু পথ অতিক্রম করে' সন্ধ্যায় দেবপ্রয়াগে এসে পৌছলাম। পথের ধারে বসে' আছেন এক উলঙ্গ সন্ন্যাসী, নির্বিকার, নির্লিপ্ত; পাশে এক ভক্ত শিষ্য দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছে। নবাগত যাত্রী দেখে সে মুখ তুল্‌লো না, বোধ হয় ঘুমোচ্ছিল। পাশে ধুনি জ্বলচে। একখানা পাথরের উপর খানিকটা কাঁচা ভাঙ তৈরী করা রয়েচে। ভক্তি-ভরে তাঁর পায়ের কাছে মিনিট কয়েক নিমীলিত নেত্রে বসে' একসময় উঠে সরে পড়লাম। বাস্তবিক, সন্ন্যাসীর মতো সন্ন্যাসী বটে!

দেবপ্রয়াগ ছোট একখানি পাহাড়ি শহর। অলকানন্দা এসে এখানে গঙ্গার সঙ্গে মিলেচেন। যেন নীলাম্বরী পরা দুটি যমজ বোন বহুকাল পরে পরস্পরের দেখা পেয়ে গলাগলি করচে। এখানে আছে রামচন্দ্রের মন্দির। শোনা গেল, দেবপ্রয়াগে উত্তর-পুরুষদিগকে আগমন করতে দেখে পূর্বপুরুষরা পিতৃলোকে আনন্দে নৃত্য করেন। ইচ্ছেটা বংশধরগণের

হাতে গ্রহণ করেন পিণ্ড, পিতৃলোকে বোধ করি নিত্য দুর্ভিক্ষ! শহরের মধ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সামান্য কিছু কিছু এখানে আছে। গুটিকয়েক ধর্মশালা, কম্বলীবাবার আশ্রম ও দাতব্য ঔষধালয়, ছোট্ট একটি বাজার, একটি বিদ্যালয় ও ডাকঘর।

আজকের মতো যাত্রা শেষ হ'লো। ক্লান্ত মন ও ভগ্ন দেহ নিয়ে অমরা সিংহের নির্দেশক্রমে আমরা সবাই এসে একটি ধর্মশালায় উঠলাম। বাঁচলাম,শহর দেখে বাঁচলাম, মানুষের সমাগম এবং লোকালয় দেখে বাঁচলাম। এই হিমালয়ের রাজ্য এবং মহাপ্রস্থানের পথ, যার আদি আছে কিন্তু অন্ত নেই, মনুষ্যজাতি এর মধ্যে কোথাও যে বাসা বেঁধেছে, সমাজ গঠন করেচে, এখানেও যে আছে জীবন-সংগ্রাম, সুখ-দুঃখ, আশা আনন্দ, এ আমরা আগে বুঝতেই পারিনি। আমরা সবাই উদাসীন সমাজচ্যুত তীর্থযাত্রীর দল, বায়ুতাড়িত শুষ্ক ও ম্লান ছিন্নপত্র; নিতান্ত বৈরাগ্যে আমরা শহরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাদের অন্তরের সঙ্গে আজ এর কোথাও যোগ নেই।

সামান্য জলযোগান্তে কম্বলশয্যা গ্রহণ করা গেল। পাশে ব্রহ্মচারী, মাথার কাছে বৃদ্ধ দাদা; ওদিকে বুড়িদের মধ্যে বিড়ালের মতো কোলাহল বেধেচে। কা'র গায়ে কা'র পা ঠেকে গেচে, কা'র মিল্‌চে না পয়সাকড়ির হিসাব, দেশে কে লিখবে চিঠি, কা'র জামাই আসতে মানা করেছিল, মাছির কামড়ে আর চুলকানিতে কা'র পায়ে ঘা ফুটেচে, তারই যন্ত্রণা ও কাতরোক্তি—এমনিতর নানা জটলা। বামুন-মার গলার আওয়াজ মাঝে মাঝে সেই জটলাকে তীরের ফলার মতো বিদীর্ণ করে' ছুটোছুটি করছিল।

পরম যত্নে ও আগ্রহে ছোটো কল্‌কেটি সেজে দাদা অন্ধকারে দেশালাইটি

এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'জালো দাদা, তুমি না ধরিয়ে দিলে টেনে সুখ নেই। সাঁপিটা দেখচি শুকিয়ে গেছে।'

ময়লা একখানা ন্যাকড়া জলে ভিজিয়ে তিনি কল্কের তলায় জড়িয়ে নিলেন।

ব্রহ্মচারী অনুগত ভক্তের মতো প্রসাদ পাবার ইচ্ছায় গুটি গুটি উঠে বস্‌ল। ঘুমের আগে দু'টান না টান্‌লে তার ঘুম আসে না!

ধূমপান করতে করতে দাদা বললেন, 'গোপাল ঘোষ মানুষ চেনে, যা তা লোকের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব নেই। তোমাকে পথে কুড়িয়ে পেলাম দাদা, তোমার মতন মানুষ•••হ্যাঁ, কেউটের বাচ্চা বটে!'—বলে কল্কেটা ছেড়ে দিয়ে তিনি মাথা গুঁজে শুয়ে পড়লেন।

ব্রহ্মচারী তাঁর কথা লুফে নিয়ে বলে উঠ্‌লো, 'এত বড় ধার্মিক বুঝলেন গোপালদা, সমস্ত পথ আমাকে খাওয়াতে খাওয়াতে এসেচেন দাদা, আপনার ঋণ আমি এ জীবনে—'

অর্থাৎ গুরু ও শিষ্য দু'জনেই তখন নিবিড় নেশায় মশগুল।

বললাম, 'ব্রহ্মচারী, নিন্দা আর প্রশংসা এখন আমার কাছে একই বস্তু। কিন্তু আপনার পক্ষে এসব যে বেমানান।'

'কী দাদা?'

'এই আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাটা। সন্ন্যাসীর সব চেয়ে বড় লক্ষণ নির্বিকার হওয়া।'

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আলাপ হতে লাগ্‌ল। কত তার মনের কথা, কত জল্পনা-কল্পনা। বললে, 'পূর্ণ বিশ্বাস ভগবানে না থাকলে···মঠ যেদিন তুল্‌বো সেদিন আপনি তা'র ভার নেবেন, দাদা।

মঠ আমি করবই। এখন কিছুদিন চল্‌বে আমার ভিক্ষাবৃত্তি, দরকারের জন্যেই টাকা···যেমন করেই হোক, ছলে-বলে-কৌশলে···'

ব্রহ্মচারী কিয়ৎক্ষণ কী যেন ভাবতে লাগল। তারপর বললে, 'নেশার মুখে তবে খুলেই বলি আপনাকে, ক'দিন ধরে আপনার কাছে পরামর্শ নেবার জন্য···বলেই ফেলি আপনাকে। গোপালদা কি ঘুমোলেন?'

গোপালদার সাড়া না পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চুপি চুপি সে বললে, 'কিছু টাকা জমিয়েচি দাদা, এই ধরুন হাজার খানেক, এখনো হাজার দুই টাকা লাগবে অন্তত। ভেবেচি কি জানেন? বাংলা দেশেই যাবো—জল-হাওয়া ভালো এমন এক গ্রামে। দিন তিনেক আগে রাতের বেলা লুকিয়ে এসে গ্রামের শেষে মাঠে, এক গাছতলায়—'

মুখ তুলে তার দিকে তাকালাম।

'লজ্জা আর আপনাকে করবো না, বলেই ফেলি,' ব্রহ্মচারী লজ্জিত চোখ দুটো নামিয়ে বললে, সেই গাছতলায় মাটি খুঁড়ে এক শিবলিঙ্গ পুঁতে সরে পড়বো। তিনদিন পরে সন্ন্যিসির বেশে যাবো সেই গ্রামে,—বল্‌বো, এসেচি কৈলাস থেকে আদেশ নিয়ে, বটবৃক্ষমূলে হবে বাবার আবির্ভাব, স্বয়ম্ভু মহাদেব, মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে এসেচি।

উৎসাহিত হয়ে বললাম, 'তবে আমাকেও একটু ঠাঁই দিয়ো ব্রহ্মচারী, আমি তোমার বিজ্ঞাপন প্রচার করবো,—দেখো যেন গাছটা বেশ প্রাচীন হয়! প্রাচীনের ভক্ত আমরা ভয়ানক।'

ব্রহ্মচারী খুশী হয়ে বললে, 'ব্যাটারা দেশটাকে বোঝে না, দেব-দেবতার ব্যবসাই এদেশে সবচেয়ে জমাটি কারবার।'

বললাম, 'তুমি আর-একটা কাজ ক'রো ব্রহ্মচারী, ওই সঙ্গে অমনি

তুক্‌-তাক্‌ ওষুধের ব্যবসাটাও খুলে দিয়ো। যে-মেয়ের ছেলে হয় না, স্বামীর সঙ্গে যার বনিবনা নেই, হিস্টিরিয়ার মাদুলী, যার অম্বলের ব্যারাম তার জন্যে—'

উৎসাহ ও আনন্দে হেসে উঠে ব্রহ্মচারী বল্‌লে, 'আর এক কল্‌কে স্থল্‌পা সাজি, দাদা?'

এদিকে চরসের প্রাদেশিক নাম স্থল্‌পা। ব্রহ্মচারীর বড় প্রিয়।

সকালবেলা ঘুম ভাঙলো। ক্লান্তি ও অবসাদে আচ্ছন্ন শরীর। মাথা তুল্‌তে ইচ্ছা হচ্ছিল না। ঘাড়ে ব্যথা, কাঁধে পিঠে কোমরে ব্যথা, ক্ষত-বিক্ষত পা দুটোর করুণ চেহারা দেখলে চোখে জল আসে; কত যন্ত্রণাই তাদের দিচ্চি; প্রভুভক্ত পা দু'খানা পীড়ন সয় অথচ প্রতিবাদ করে না।

উঠে বসলাম। আড়ষ্ট শরীর, দেহের উপরে যেন লাঠালাঠি হয়ে গেচে। আজ সকলের চেয়ে বড় আনন্দ, পথ হাঁটতে হবে না। এইখানে যদি নিয়মিত অন্নবস্ত্র জুটে যায় তবে আর স্বর্গেও যেতে চাইনে। পৃথিবীতে যে-মানুষ সকলের চেয়ে সুখী বলে আমাদের ধারণা, তার যখন মৃত্যু ঘটে তখন আমরা সবাই তার আত্মার শান্তিকামনা করি। মানুষ আসলে যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে' দুঃখ পায়, এখানে যে তার শান্তি নেই, একথা মানুষ আপন অন্তরেই অনুভব করে। করে বলেই দেব দেবতার সৃষ্টি, স্বর্গের সৃষ্টি, পরলোকের সান্ত্বনার সৃষ্টি। শিল্প, সাহিত্য, কৃষ্টি*,

---

* আমার ব্যবহৃত এই 'কৃষ্টি' শব্দটা নিয়ে তৎকালে সাহিত্য-সমাজে একটা বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথমে (নবেম্বর, ১৯৩৩) আমাকে লেখেন, 'কৃষ্টি' শব্দটা ভাষায় কুশ্রী অপজনন। অন্যত্র 'সংস্কৃতি' শব্দটাই প্রচলিত—এটা ভদ্র সমাজের যোগ্য।' বলাবাহুল্য তৎকালের বহু সাময়িক পত্রে নানা বাগ্‌বিতণ্ডার পর রবীন্দ্রনাথের 'সংস্কৃতি'ই ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেছিল। —গ্রন্থকার

সভ্যতা, সমস্ত ছাড়িয়েও মানুষের দৃষ্টি উর্ধ্বদিকে। গভীরের মধ্যে সে খুঁজেচে একটি পরম সান্ত্বনার বাণী, আশার আশ্রয়,—জীবনের চরম পরিণামের মধ্যে একটি সুদূর বেদনাকে সে নিরন্তর অনুভব করে।

নির্মল রৌদ্রে চারিদিক ভেসে গেচে, স্নিগ্ধ হাওয়া বইচে। আকাশ কোমল নীল, কোথাও কোথাও শাদা পালকের মতো টুক্‌রো মেঘ পদচারণা করে' বেড়াচ্চে। তাদেরই মাঝে মাঝে স্পর্শ করচে পর্বত-চূড়াগুলি, সেই চূড়ার গায়ে ঘন সবুজ অরণ্যের উত্তরীয়, বাতাসে থেকে-থেকে সে উত্তরীয় আকুল হয়ে উঠচে।

গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থলে যাত্রীর দল বসে' গেল শ্রাদ্ধ ও তর্পণে, গোপালদা ও ব্রহ্মচারী-প্রমুখ বুড়ো-বুড়ীর দল মস্তক মুণ্ডন করলো। পাণ্ডা পড়ালেন মন্ত্র, পিতৃপুরুষ এসে ভক্ত উত্তর-পুরুষগণের হাত থেকে আটার গোলা খেয়ে বোধকরি পরিতৃপ্ত অন্তরেই অদৃশ্য হ'লেন! সকল প্রয়াগেই শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করতে হয়,—শাস্ত্রের আদেশ। শাস্ত্রের দেশ!

দিনটি বেশ লাগ্‌চে। এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, তবু এই সুন্দর সকালটিকে রেখে রেখে উপভোগ করচি। নিকটে নদীর ওপারে কাঠমল্লিকার গাছগুলি হাওয়ায় দুল্‌চে, নদী অনেক নীচে, গায়ে বাতাস লাগিয়ে অলকানন্দার পুলের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। মনে মনে বলছিলাম, 'শুধু অকারণ পুলকে, ক্ষণিকের গান গা'রে আজি প্রাণ ক্ষণিক দিনের আলোকে।' কবিতাটুকুর মধ্যে যে ব্যঞ্জনা, তারই চেহারা যেন দেখছিলাম দিকে দিকে। সকালের এই ছবিখানি যেন এক শিল্পীর সমস্ত জীবনের সাধনায় আঁকা। সমস্ত মন এই চিত্রপটখানিতে নিবিড় তৃপ্তিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে রইল।

অনেক বেলায় রান্নাবান্নার আয়োজন সেরে অলকানন্দায় স্নান করে'

এলাম। ব্রহ্মচারী এ-বেলা রামচন্দ্রজির প্রসাদ পাবে, আমার কাছে তার আহার নেই, গেচে মন্দিরে। জোগাড় করে' নিয়ে বসেচি, এমন সময় গোপালদা বললেন, 'টাকার ভাঙানি পেলুম না, আনা চারেক পয়সা দাও ত দাদা, দোকানের হিসেবটা মিটিয়ে ফেলি। আবার দেবো'খন।'

কাঠের উনুনে ফুঁ দিতে দিতে চোখে জ্বালা ধরেছিল, জল পড়ছিল। বললাম, 'দিই, একটু দাঁড়ান।'

রুমালে বাঁধা টাকা-পয়সা ট্যাকেই থাকে, দিনরাত সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। পয়সা বা'র করতে গিয়ে দেখি, ট্যাক খালি, রুমালের চিহ্নও নেই! তার মানে! তার মানে কী! চারদিকে একবার তাকালাম, মনে হ'লো নিজের মুখের চেহারাটা এক নিমেষের মধ্যে বিকৃত হয়ে এলো। উঠে ঝোলাঝুলি হাঁটকে দেখলাম, কম্বলখানা ঝাড়লাম, জামার পকেটগুলো তন্ন তন্ন করে' খুঁজলাম। গলার ভিতরে কী যেন ঠেলে উঠে আসতে লাগ্‌লো, বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাট-পড়ার মতো এক রকম শব্দ শুরু হ'লো। চীৎকার করে' ওঠবার চেষ্টা করলাম, আওয়াজ বেরুল না। ছুটে পালাবার ইচ্ছা হ'লো, কিন্তু কোথা যাবো? সর্বনাশ, এ কী হ'লো ভগবান?

কুকুরের মাথায় হঠাৎ আচমকা লাঠি মারলে সে যেমন ওলোট-পালট খেয়ে পাগলের মতো অল্প একটুখানি জায়গার মধ্যে ঘুরতে থাকে, তেমনি কিয়ৎক্ষণ হতচেতন হয়ে ধর্মশালার মধ্যে ঘুরলাম। সবই আছে,—কম্বল আছে, ঝোলা আছে, লাঠি-ঘটি আছে, নেই শুধু সেই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তুটি, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধন। আমার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, পথশ্রম ও তীর্থযাত্রা, স্বপ্ন ও সৌন্দর্যবোধ, সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণা, সকলের মূলে

যে রয়েচে সেই ময়লা রুমালে বাঁধা টাকা-পয়সাগুলি, একথা প্রথমেই আমার মনে এলো। আমার প্রাণের রস একটি নিমেষে কে যেন নিংড়ে নিল, দেহে বিন্দুমাত্র রক্ত নেই, সর্বাঙ্গ বরফের মতো শীতল, চেতনাহীন—আমার ঘটেচে অপমৃত্যু। নিজের ভয়াবহ পরিণামের কথা মনে করে' নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো। এ-পথে কারো সহানুভূতি নেই, মমত্ববোধ নেই,—যেটুকু আছে তা নিতান্ত মৌখিক—স্নেহহীন পুণ্যলোভী যাত্রীর দল উদাসীন হয়ে ফেলে চলে যাবে,—আজ থেকে যে চিরদিনের জন্য এই দুর্গমে নির্বাসন! সমস্ত পাহাড়গুলো রাক্ষসের মতো তেড়ে এসে সুমুখে বিকটভাবে নৃত্য করতে লাগলো!

'কই দাদা, দিন্ ভাই একটু তাড়াতাড়ি।'

বললাম' 'আমারো ভাঙানো পয়সা নেই গোপালদা, টাকা ভাঙাতে হবে।'

'তবে বাজারেই যাই, ভাঙিয়ে আনিগে। এদেশে টাকা ভাঙানো দেখচি ভারি কঠিন।' বলে গোপালদা বেরিয়ে গেলেন।

বুড়ীগুলো ওদিকে খেতে বসেচে। আমার উনুনে আগুন নিবে ধোঁয়া হতে লাগলো, সহস্র সহস্র মাছিতে চারিদিক ছেয়ে গেচে, খাবারের জিনিসগুলো আর হয়ত নেওয়া যাবে না। তাদের দিকে তাকিয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। নদী মরে গেল, স্রোত গেল শুকিয়ে, চারিদিক ধূ ধূ করচে, ছায়া নেই, চোখে আর আলো নেই, আনন্দ নেই, আকাশ হয়েচে বিষাক্ত, সমস্ত প্রকৃতির চেহারা দেখতে দেখতে মলিন হয়ে উঠলো। আমি সন্ন্যাসী নই, পূর্ণ বিশ্বাস ভগবানে আমার হয়নি, বাবা বদরীনাথের দয়ার আশা করে' পথে আমি পা বাড়াইনি, দেবতার উপরে ভরসা আমি করিনে; আমার ক্ষুধা আছে,

তৃষ্ণা আছে, নিজের জীবন সকলের চেয়ে আমার প্রিয়। দারিদ্র্যে, দুঃখে, হতাশায় আমি বেদনা পাই, সর্বস্ব লুণ্ঠিত হ'লে বিপদ্‌গ্রস্ত হই, গ্রহবৈগুণ্যে বিধাতার অভিশাপ মাথায় নেমে এলে চোখে এখনো জল আসে! আমার ভিতরে বৈষয়িক মন আছে, স্বার্থ ও সুবিধার জন্য লোলুপতা আছে। আমি দেশে ফিরে যেতে চাই; সমাজের মধ্যে, মানুষের মধ্যে, স্নেহ মমতা দয়া-দাক্ষিণ্য লোভ-মোহ কলহ-কলঙ্ক গ্লানি ও মালিন্য—এদের সকলের মধ্যে থেকে গৃহীর মতো জীবন ধারণ করতে যে আমি ভালোবাসি সর্বশরীর আমার ভয়ে ও হতাশায় ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো সাহায্য প্রার্থনা করতে গেলে সবাই করবে বিদ্রূপ, সকলের মৌখিক প্রীতির মুখোস খুলে পড়ে' সত্যকার চেহারা প্রকাশ পাবে, সবাই অবজ্ঞা করবে, আমার দুর্ভাগ্যের দিকে ইঙ্গিত করে' মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। তা ছাড়া যাত্রীরা সঙ্গে আনে জীবনধারণের উপযোগী খরচ, তীর্থপূজার খরচ; দরিদ্র পুণ্যকামীর দল, দুঃস্থকে সাহায্য করবার মতো সম্বল ত তাদের নেই! শহরের যারা মানুষ,—পূজারী, পাণ্ডা, দোকানদার,—তারা আসে বছরের এই সময়টায় যাত্রীদের শোষণ করতে, সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের অনন্ত ক্ষুধা তাদের, দান করবার মানুষ তাদের মধ্যে বিরল।

হঠাৎ মনে হ'লো, ব্রহ্মচারী আমার টাকা-পয়সা নেয়নি ত? উত্তেজনায় চোখ দুটো আমায় দেখতে দেখতে জ্বলে উঠলো। এইবার ঠিক ছুঁয়েচি। গতকাল আমার রুমাল সম্বন্ধে সে কী যেন একটা ইঙ্গিত করে' থেমে গিয়েছিল। সে ছাড়া আর কেউ নয়! এই তার পেশা, এই তার রীতি। কাল রাত্রে তার ভিতরের লোভাতুর রূপ দেখেচি, ভণ্ড সাধুর বেশে মানুষকে চিরদিন সে বঞ্চনা করেচে। সাপের মতো তার চরিত্র, শৃগালের মতো তার চক্ষু, শ্যেনপক্ষীর মত সে সুবিধাবাদী! যে তাকে আশ্রয়

দেয় তার ঘরে লাগায় আগুন; বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ,—তার টুঁটি টিপে—

'দাদা, কী ভাবচেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?' বলতে বলতে ব্রহ্মচারী পাশে এসে দাঁড়ালো, কাঁধে হাত রেখে ঢেকুর তুলে বললে, 'অনেকদিন পরে একটা পান খেতে পেলাম, রুটি আর আলু চিবিয়ে মুখখানা খারাপ হয়ে গেচে।'

তার মুখের দিকে তাকালাম। সে পুনরায় বল্‌তে লাগল, 'এই যে আপনার জন্যে পান একখিলি এনেচি—একি, এখনো খাওয়া হয়নি আপনার? চান্ করেননি?'

'চান? ওঃ—এই যে যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, বেশ লাগবে অলকানন্দায় চান করতে, চক্‌চকে জল…ভারি আরাম।'

ততক্ষণে আমি নদীর দিকে ছুটে চলেচি। পড়ি ত মরি! কিছুদুর এসে বাঁ-হাতি বেঁকতে হয়, তারপর পাথরের খাদ্‌রিকরা সিঁড়ি, নদী অনেক নীচে,—উন্মত্তের মতো সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। সুমুখে দীর্ঘ বালির চড়া, দ্রুত চলা যায় না, চারিদিকে ছোট বড় অসংখ্য পাথরের খণ্ড ছড়ানো, পায়ে হোঁচট্ লেগে রক্তারক্তি হ'লো—এমনি করে' এলাম জলের ধারে।

বিশেষ একখানা পাথর চিহ্নিত করা ছিল, দ্রুত কাছে গিয়ে হেঁট হয়ে তার তলায় বালির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। আঃ, এই যে আমার সোনামণি, আমার সাত রাজার ধন মানিক, আমার স্বর্গ, আমার বদরীনাথ! আঃ বাঁচলাম, বাঁচলাম! স্নান করবার সময় রুমালসুদ্ধ এর তলায় যে লুকিয়ে রেখেছিলাম, তাই কি ছাই মনে ছিল? ধন্যবাদ তোমায় ব্রহ্মচারী, হে খরস্রোতা অলকানন্দা, তোমাকে ধন্যবাদ! আনন্দে আর

জ্ঞান রইল না, আহ্লাদে আর সংযম রইলো না, স্নেহ ভালোবাসায় আবেগে উত্তেজনায় সাশ্রুনেত্রে রুমালখানি মুখে চেপে আদরে-আদরে ভরিয়ে দিলাম।

বদ্রীবিশাল কি জয়! জয় বাবা কেদারনাথ! পায়ে রেখো বাবারা!

যাকে ছিল আমাদের পরম প্রয়োজন, ঠিক সময়টিতে নিতান্ত অবহেলায় তাকে ত্যাগ করে' যেতে হ'লো। সেদিন অপরাহ্ণ বেলায় দেবপ্রয়াগের দেনা-পাওনা চুকিয়ে মুসাফিরের দল আবার নেমে এলো সেই পরিচিত বন্ধুর পথে। এ-পথের দিকে তাকালে ভয় করে, এ যেন সবাইকে দুরান্তের দুর্গমের দিকে টেনে নিয়ে যাবার জন্য হানা দিয়ে পড়ে রয়েচে। সাপের মতো শীর্ণকঠিন তার দেহ, সম্মুখ ও পিছনের দুরারোহ পর্বতমালাকে বেষ্টন করে' অজগরের মতো সে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত; গ্রীষ্ম, বর্ষা ও বরফে তার চাঞ্চল্য নেই। পথে নেমে ধর্মশালার দিকে একবার ফিরে দেখলাম, সে যেন দেউলে হয়ে গেল। যে দিল আশ্রয়, স্নেহক্রোড়ে যে আমায় দু'দিন লালন করলো, দৌরাত্ম্য সইলো কিন্তু আপত্তি জানালো না, আজ তার দিকে মুখ ফিরেও চাইবার প্রয়োজন নেই, সে ফুরিয়ে গেচে। এমনিই হয়। আবার হয়ত কতদিন ওখানে আলো জ্বল্‌বে না, ভয়ের বাসা হয়ে থাকবে; হয়ত কোনো বন্যজন্তু এসে ওখানে আশ্রয় নেবে; রাত্রির অন্ধকারে এক রকম এলোমেলো বাতাস এসে ওর কোণে কোণে বিচ্ছেদের নিশ্বাস ফেলে যাবে, অথচ তখনো আমাদের এই প্রিয় ধর্মশালাটি থাকবে এমনি নির্বিকার,—অকৃপণ, দাক্ষিণ্যময়, স্থাণু সন্ন্যাসীর মতো।

সমস্ত অগ্রগতির পিছনে থাকে একটি উৎসাহ, প্রাণের বেগ, একটি অফুরন্ত উদ্যম; কিন্তু এ যাদের নেই তাদেরো অপেক্ষা করা চল্‌বে না,

টেনে টেনে এসেচে, ঠেলে ঠেলে যেতে হবেই, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন; ভিতর থেকে প্রতি মুহূর্তেই একটা প্রতিজ্ঞা ঠেলে উঠ্‌চে—কেনই বা যাবো না? চল্ চল্—থাক্ পিছনে জীবন, থাক্ মৃত্যু, থাক্ আমার সকল চাওয়া-পাওয়া,—চল! গৌরীশঙ্কর সীতারাম! জয় বদরী-বিশাল-লাল কি জয়!

'মহারাজ-জি?'

মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। কৌপীনধারী চিম্‌টে-হাতে এক সাধু হেসে বল্‌লে, 'সীতারাম মৎ বলো, রাধেশ্যামকো নাম লেও। সীতারাম কহোগে, চিম্‌টি বাজায়কে চলোগে; আওর রাধেশ্যাম কহোগে, ত' ঘর্‌মে বৈঠ্‌কে রহোগে—হাঃ হাঃ হাঃ, চলো ভাই চকাচক্।'

রিক্ত ও নিঃস্ব সাধুজি পরম স্ফূর্তি এবং আনন্দে গদগদ্ হেসে ওলোট-পালট খেয়ে আগে আগে চল্‌তে লাগলো; নিজেকে সে জয় করেচে।

তপোলোকে এ-ক'দিন ভ্রমণ করেচি, এবার পদার্পণ করলাম দেবলোকে। বাঁ দিকে নীচে এবার নতুন নদী, দক্ষিণবাহিনী অলকানন্দা, গঙ্গার মতোই তার স্রোতের শব্দ, নীল নির্মল প্রবাহ; জলের অবিশ্রান্ত আওয়াজে নীরবতা আরো গভীর হয়ে উঠেচে,—চড়াই পথে আমরা চলেচি উত্তরদিকে। ক্রমাগত উত্তরদিকেই আমাদের গতি, মহাযোগীর জটাকে স্পর্শ করবার জন্য নিরন্তর তার দেহ বেয়ে উঠচি যত পিপীলিকার দল। তীর্থের এই দীর্ঘ পথটিই আমাদের তপস্যা, পথ শেষ হলেই সকলের ছুটি। জীবনেও এমনি, অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতিই আমাদের বাঁচা, আমাদের সাধনা; পরম পরিণামকে স্পর্শ করতে আমরা এগিয়ে চলেচি, কোথায় গিয়ে পৌছবো জানিনে। শীতের শেষে প্রথম বসন্তকালের মতো আবহাওয়া; বন্য ওষধিলতা ও অরণ্যপুষ্পের একরূপ বিচিত্র মিশ্র গন্ধে কোথাও কোথাও পথ আচ্ছন্ন,

বাতাস মাঝে মাঝে সে-গন্ধকে দূরে প্রসারিত করে' যাত্রীদের অভিবাদন জানাচ্চে। পর্বতচূড়ার শ্যামশ্রীর উপরে ক্রমবিলীয়মান রক্তিম সূর্যলেখা, নীচে নদীর নির্জনে সন্ধ্যার ছায়া চুপি চুপি নাম্‌চে। এ-বেলায় আমরা সামান্য পথই হাঁটবো; একটি দিন বিশ্রাম নিয়ে আরামের লোভ আমাদের জেগে উঠেচে, প্রথম সুবিধা পেলেই আমরা আশ্রয় নেবো। সামান্য মাইল তিনেক পথ, বেশ ধীরে সুস্থে হাঁট্‌চি, তাড়াতাড়ি নেই, সময়ের আন্দাজ আছে, বিদ্যাকুঠি চটিতে পৌছতে দেরী লাগবে না।

কিন্তু গ্রহবৈগুণ্য। আজ সকাল থেকে হাঁটুর মধ্যে কেমন একটা ব্যথা খচ্ খচ করছিল, এ-বেলা সেটা বেড়ে উঠলো। উঁচু নীচুতে যাদের হাঁটা অভ্যাস নেই, শুনলাম, এ-ব্যথাটা তাদের সহজে আশ্রয় করে। পায়ে হেঁটে বদরীনাথ যাবার পক্ষে এই ব্যথাটাই সকলের চেয়ে বড় বাধা, এর কথা নাকি অনেকেই জানে। চড়াই পথে ওঠবার সময় এ ব্যথাটা জন্মায়, উৎরাই পথে নামবার সময় হয় এর প্রতিক্রিয়া। ভয় পেয়ে গেলাম, এবং সে যে কী ভয় তা আজ আর লিখতে বসে বোঝাতে পারবো না। আস্তে আস্তে সন্তর্পণে পা মচ্‌কে চলেচি, আর সবাই গেল এগিয়ে, গোপালদা ও ব্রহ্মচারী চোখের আড়াল হয়ে গেল। কেনই বা যাবে না? যে রুগ্ন ও অশক্ত, সুস্থ মানুষ তার সঙ্গে সহযোগিতা করে' আপনাকে পঙ্গু করবে কোন্ যুক্তিতে? আমার সঙ্গে কিসের বন্ধন তাদের? কিসেরই বা ঋণ? খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেচি, শুনেচি আত্মবিস্মৃতিতে ব্যাধির খানিকটা উপশম হয়। নানা অবস্থায় আত্মহারা হওয়া অভ্যাস আছে, কিন্তু আত্মবিস্মৃত হবো কেমন ক'রে? যাকে ভুলে যাওয়ার দরকার তাকেই যে মনে পড়ে সকলের আগে! অথচ আয়না থাকলে দেখতাম কী দুরবস্থাই শরীরের হয়েচে! ধুলোয় ও রোদে মাথার চুলগুলো খড়ের

মতো রংচটা, চামড়া বিবর্ণ ও রক্তহীন, কোটরগত ক্ষীণ দৃষ্টি, হাতপা'গুলো কুৎসিত ও কাঙ্গাল, কাঠের আগুনের আঁচ লেগে দুই হাতের লোমগুলো পরিষ্কার হয়ে গেচে, জামা-কাপড়ে ও মাথার চুলের মধ্যে উইপোকার মতো একরকম যন্ত্রণাদায়ক পোকা ভিড় করেচে। তাদের অশ্রান্ত উৎপীড়নে রাতে ও দুপুরে নিদ্রা নেই, একবার তাড়ালে আবার কেমন করে' এসে মাথাটাকে আশ্রয় করে। এদের সঙ্গে রয়েছে মাছির প্রচণ্ড উপদ্রব, লক্ষ লক্ষ মাছি, কোটি কোটি মাছি, সব মাছিময়, মাছির সমুদ্র! মাছির কামড়ে হাত পায়ে ঘা ফোটেনি এমন যাত্রীই ছিল না। জলের উপরেও যে মাছি পড়তে পারে, এ দৃশ্য এই প্রথম দেখলাম।

লাঠির উপরে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে বিদ্যাকুঠিতে এসে পৌছলাম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েচে। পাশেই একটা কদলী-বন, শুক্ল পঞ্চমীর জ্যোৎস্না কলাগাছের চওড়া পাতাগুলির উপরে নেমে এসেচে, রূপোর পাতের মতো ঝলমল করচে, অন্ধকারে অলক্ষ্য অলকানন্দার ঝর ঝর শব্দ কানে আসচে,—চারিদিকে প্রকৃতির একটি রোমাঞ্চকর বসন্ত-শোভা। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর ব্রহ্মচারী রুটি সেঁকার আয়োজন করতে লাগলো। আগে কোনক্রমে জল গরম হ'লো, তাতে নুন মিশিয়ে পায়ে মালিশ করতে বসে গেলাম। যে-দেশে যে আচার, নুন আর গরম জলের মতো পায়ের ব্যথার ওষুধ নাকি আর ভূ-ভারতে নেই! ব্রহ্মচারী বললে, 'আপনার ব্যথা আমি ভালো করে দেবোই, এ ওষুধে যদি না সারে ত আর একটা আমার জানা আছে!'

রন্ধন, ভোজন ও শয়নে সে-রাত কাটলো। ভোর রাত্রেই আবার যাত্রা! বুড়ীরা নাস্তিক ও ধর্মত্যাগী বলে' সম্পর্ক ছিন্ন করেচে, আমার প্রতি আর তাদের সহানুভূতি নেই। কোমর-ভাঙ্গা চারুর-মা শুধু সবাইকে

লুকিয়ে চুপি চুপি বলে গেচে, 'তা বলে আমি তোমাকে ছাড়চিনে বা' ঠাউর, আমি আছি তোমার পায়ে পায়ে। কালীঘাটের চক্কোত্তির ঘরে আমি তিন পো করে' দুধ দিই, টাকাকড়ি অবিশ্যি চারুই রাখে ঢাকে··· হ্যাঁ, তাদের ঘরে তোমার মতন একটি ছেলে আছে···আহা, যেদিন আমার নিবারণ মরে গেল, ওই একটি ভাইপোই ছিল—সেই বছরেই দুধ দুইতে বসে হাব্‌লি পা ছুড়ে আমার হাঁটু ভেঙে ছ্যায়, হাব্‌লির পায়ে দড়ি বাঁধা ছিল না। ওমা, যাই, আবার ওরা ধমক দেবে···পায়ের ব্যথাটা কমেনি একটু বা' ঠাউর?'—এই বলে চারুর মা লাঠি ধরে কুঁজো হয়ে লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে গেল। বুড়ীর বয়স সত্তর পার হয়ে গেচে।

আস্তে আস্তে চলেচি, আজ অনেকদূর পথ যেতে হবে, আজ আর ক্ষমা নেই। আমি সাধারণত যেতাম সকলের আগে এগিয়ে, এবার থেকে তা আর হবে না, এবারে থাকতে হবে পিছিয়ে। গোপালদা গেচেন বুড়ীদের নিয়ে, ব্রহ্মচারীও কিছুদূর সঙ্গে সঙ্গে এসে তারপর এগিয়ে গেচে, পিছনে যে পাঞ্জাবী ও বিহারী হিন্দুস্থানীর দলটা আসছিলো, তারাও সস্নেহে আমার পায়ের দিকে একবার তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, পিছনে আর কেউ যে আছে তা মনে হচ্চে না। সকলেরই মনের কথা, আগে চল্ আগে চল্ ভাই। আজকে পথ বড় দুস্তর ও দুর্গম, কোথাও কোথাও নদীর কিনারায় পথ ধ্বসে গেচে, কোথাও কোথাও পাথরের চাঁই বিপজ্জনক অবস্থায় পাহাড়ের গায়ে সামান্য ভিত্তির উপরে আট্‌কে রয়েচে, একবার পিছলে পড়লে অসাবধানে অন্তত জন দশেক যাত্রীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ঝোলাঝুলি আর এই কম্বলের বোঝা বইতে পারচিনে, কাঁধ কন্‌কন্ করচে। নিজেকে টেনে নিয়ে চলতেই কষ্ট হচ্চে, বোঝা বইবো কেমন করে? সামান্য এক সের ওজনের জিনিস এই দুর্গম পথে

বহন করা কঠিন, বিরক্তিকর ও শ্রমসাধ্য, আমার আছে অন্তত সাত সের ওজনের ঝুলি ও কম্বল। যাত্রার আনন্দ নেই, শরীর অচল, পা পঙ্গু, আহারের কৃচ্ছসাধন, জুতোর কামড়ে পায়ে বড় ফোস্কা, সর্বাঙ্গে অহরহ পোকা কামড়াচ্চে, নিরুৎসাহ মন, পুণ্যসঞ্চয়ের স্পৃহা নেই—এদের ভিতর দিয়ে কেনই বা যাওয়া? অথচ প্রায় আশী মাইল পাহাড় এমনি করেই ত পার হয়ে এলাম!

অস্ফুট একটা আর্তনাদে ফিরে চাইলাম। পথের প্রান্তে একখানা পাথরে হেলান দিয়ে দুইজন স্ত্রীপুরুষ যাত্রী বসে বসে হাঁপাচ্চে। বুঝলুম পীড়িত, চল্‌তে পারচে না। ব্যস্‌ ওই পর্যন্তই। লাঠি ঠুক্‌ ঠুক্‌ করে' এগিয়েই যাচ্ছিলাম, একজন হাত নেড়ে ডাক্‌লো। ডাকলেই কিছু আর কাছে যাওয়া যায় না, বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কহো, কেয়া বোল্‌তা?' কী যেন সে বিড় বিড় করে বল্‌লে, ঠিক বোঝা গেল না কোন্‌ জাতি। অবশেষে একজন উঠে এসে আমার লোটাটা ছুঁয়ে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলো, জল আছে কিনা। জল অল্পই ছিল, রোগীর মুখে একটু ঢেলে দিয়ে আবার চললাম। বোধ হয় পিছন থেকে একটু আশীর্বাদ করলো কিন্তু ভাষাটা বোধগম্য হ'লো না। তার আশীর্বাদের মূল্য আমার কাছে এক কানাকড়িও নয়, পায়ের ব্যথা না সারলে বিশ্বসংসারকে আর আমি সুদৃষ্টিতে দেখতে পারবো না।

হাঁ, সংসারের নিয়মই এই। নিজের মনের রঙ দিয়েই আমরা সব কিছুকে বিচার করে' যাই। সৃষ্টিকে কেউ দেখে সুন্দর, কেউ বা দেখে কুৎসিত। পায়ে ব্যথা ছিল বলেই সেদিনের তীর্থপথ, পথের প্রকৃতির সৌন্দর্য, হিমালয়ের বিপুল ঐশ্বর্য-সম্ভার আমার চোখে বিষাক্ত হয়ে গেল, আমি হারালাম সুস্থ মন, সহজ উপলব্ধি, সরল দৃষ্টি। অবজ্ঞা ও বিরক্তিতে

আকাশ আর পৃথিবী ছেয়ে গেল। হয়ত এমনিই হয়। আর্ট ও সাহিত্যের সমালোচনায় দেখি একই বস্তুর সম্বন্ধে সমালোচকগণের বিভিন্ন মত। বিভিন্ন মতের মূল্য আছে মানি, কিন্তু সাহিত্য যেখানে আর্টের পর্যায়ে উঠেচে, যেখানে প্রকাশ পেয়েচে গভীর অনুভূতির নির্মল আনন্দ, সেখানে মতের বিভিন্নতা মন মেনে নেয় না। বিচারের অন্যায়ে সুসাহিত্যকে মলিন করবার চেষ্টায় যারা ব্যগ্র, বুঝতে হবে সেই সমালোচকরা আজ আমারই মতো খুঁড়িয়ে হাঁটে। খোঁড়া পায়ের গ্লানি তারা ছড়ায় আর্ট ও সাহিত্যের তথাকথিত সমালোচনায়।

'কি দাদা, বড় কষ্ট হচ্চে? অনেক পিছিয়ে পড়েছিলেন, এখানে একটু বসেছিলাম আপনার অপেক্ষায়। এই—আর একজন সঙ্গী পাওয়া গেচে।'

মুখ তুললাম। দেখি, একটি লম্বা-চওড়া কৃষ্ণকায় বাঙালী ভদ্রলোক একখানা পাথরের উপরে বসে বিড়ি ফুঁকচেন। নমস্কার বিনিময় করে' তখনই সামান্য আলাপ হ'লো। কথায় কথায় জানা গেল তিনি একা নন্, স্ত্রী এবং শাশুড়ী আছেন সঙ্গে, তারা কয়েক পা এগিয়ে গেচেন, দশ মাইলের বেশি রোজ তাঁদের পক্ষে হাঁটা কঠিন। লোকটির নাম অঘোরবাবু। তিনি বললেন, 'এত করে' মশাই বললুম কাণ্ডি কিংবা ডাণ্ডিতে ওঠো, কতই আর খরচ, কিন্তু কিছুতেই না, মেয়েমানুষের গোঁ বড় ভয়ানক, রাস্তার মাঝখানে অবাধ্য হওয়া আমি ভালোবাসিনে। হবেই ত', পায়ে ব্যথা ত ধরবেই।'

বললাম, 'ডাণ্ডিতে উঠবেন না কেন?'

'পুণ্যি হবে না, তাই জন্যে। হেঁটে গেলে বাবার দয়া বেশি করে পাওয়া যায়!'

ব্রহ্মচারী বললে, 'আহা তা সত্যি, ওঁ নমো নারায়ণায়! ভগবানে

পূর্ণ বিশ্বাস না নিয়ে চল্‌লে…আসুন আপনারা, আমি ততক্ষণ এগোই।'—বলে সে ঝোলাঝুলি নিয়ে লাঠি ঠুকে চল্‌তে লাগ্‌লো।

অঘোরবাবুর বাড়ী কলকাতায়। কাজ-কারবার আছে, এখন ব্যবসার বাজার মন্দা। স্ত্রীকে নিয়ে প্রায়ই তিনি তীর্থভ্রমণে বেরোন। কি ভাগ্যি ছেলেপুলে নেই। বললেন, 'আপনারা ত সন্নিসী মানুষ, সংসারের জ্বালা নেই! আচ্ছা, বলতে পারেন, ব্রহ্মচারীটি কেমন লোক? শুনলুম আপনি ত ওকে খাওয়াতে খাওয়াতে আন্‌চেন। ও লোকটা কী? ভণ্ড-টণ্ড নয় ত?'

বললাম, 'ভণ্ড হলেই বা ক্ষতি কি আমাদের বলুন? সবাই সাধু হ'লে অসুবিধাও আছে!'

'তাই বলচি, তাই আপনাকে জিজ্ঞেসা করচি। আমার কাছে অনেক দুঃখ জানাচ্ছিল, কিছু সাহায্যও চাইলো, পয়সাকড়ি ত আর দিতে পারবো না, না-হয় এ-ক'টা দিন খেতে দিতে পারি।'

'ও, বেশ ত! বললাম, 'পথে খেতে দেওয়াটা ত কম নয়!'

'হাঁ তাই বল্‌চি, মানুষকে চেনা দুষ্কর কিনা! একবার একটা খোট্টা চাকর রেখেছিলুম। ব্যাটা বিনা-মাইনের চাকরি করতে এল,—বেশ থাকে মশাই, হঠাৎ একদিন পালালো, বাক্স খুলে দেখি গয়নাপত্তরগুলোও তার সঙ্গে পালিয়েচে। পরের গয়না বন্ধক রেখে টাকা ধার দিতুম, কী ভয়ানক বিপদ বলুন ত?'

হেসে বললাম, 'মাইনে না দেওয়ার বিপদ!'

কথাটা শুনে ভদ্রলোক বোধ হয় খুশী হলেন না, কিন্তু আত্মসংবরণ করে' বললেন, 'তাই বটে, লাভের গুড় পিঁপড়ে খেয়ে গেল।'

আলাপ করতে করতে রামপুর চটিতে এসে পৌছলাম, এর আগে

ছেড়ে এসেচি রাণীবাগ। সুমুখে একটা বড় ঝরণা নেমে এসেচে, আশপাশে খানকয়েক চটি। পথের ধারে বড় চটির কাছাকাছি অঘোরবাবুর স্ত্রী ও শাশুড়ীকে দেখা গেল। পথশ্রমে দুজনেই ক্লান্ত ও মলিন, কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতো মেয়েটির দেহলাবণ্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুখে কেমন যেন কমনীয় শান্ত-শ্রী। ব্রহ্মচারী পাশেই ছিল দাঁড়িয়ে, সোৎসাহে বলে উঠ্‌লো, 'দাদা এই দেখুন, এই আমাদের মা, অন্নপূর্ণা মা, আর ইনি আমার দিদিমা।' বলে সে পাশের বৃদ্ধাটিকে দেখিয়ে দিল!

স্মিতমুখে তাঁদের দিকে তাকালাম বটে কিন্তু আলাপ করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। পথে যত নারী-যাত্রী দেখা গেচে এ পর্যন্ত, এই বউটি তাদের মধ্যে একমাত্র অল্পবয়স্কা ও রূপবতী। বললাম, 'আমাদের জন্যে কোন্ চটি ব্যবস্থা হয়েচে ব্রহ্মচারী?'

'এই চটি, এইটেই ভালো দাদা,—ওই যে গোপালদাও এসে উঠেচেন।'

'বেশ বেশ, আগে একটু বসে পড়ি, পায়ে বড় লাগ্‌চে।'—সমস্ত শরীরে তখন যন্ত্রণা হচ্চে।

আমার ঔদাসীন্য দেখে অঘোরবাবু বোধ করি একটু ক্ষুণ্ণ হলেন, অথচ বলবারই বা কী ছিল? হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'এখানে দুধ পাওয়া যায় না? আমার কাছে চা চিনি আছে, একটু চা খেতুম।'

চায়ের সন্ধানে তিনি চলে গেলে বউটি স্নিগ্ধ হেসে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারো কি পায়ে ব্যথা ধরেচে?'

বললাম, 'হ্যাঁ, ভারি জব্দ হয়েচি!'

বৃদ্ধা বললেন, 'যাক, রাধারাণীর ব্যথার সঙ্গী জুটলো! আমার মেয়েরো পা-টা খারাপ হয়েচে বাবা।'

শ্রান্ত হাস্যে চুপ ক'রে গেলাম। পরে বললাম, 'ব্রহ্মচারী, তুমি আমার দিকে এবেলা খাবে না ত'?'

ব্রহ্মচারী সরে এসে মাথা চুল্‌কে বললে, 'এই কথাই বল্‌ছিলাম আপনাকে, মা অন্নপূর্ণার প্রসাদ পেলেই আমার চল্‌বে দাদা, আপনি ত যথেষ্টই খরচপত্র করেচেন আমার জন্যে। এবার থেকে এঁরাই—'

'বেশ বেশ—'

'আমি আপনার বেঁধে দিই, দাদা!'

'না, রাঁধতে আমার কষ্ট নেই।'

এতক্ষণে গোপালদার দেখা পেলাম। তিনি একপাশে বসে' অতি আনন্দে তামাক সাজছিলেন। চুপি চুপি বললেন, 'বড় ঘরের মেয়ে, কি বলেন? আহা, কেনই যে কষ্ট করে' এলেন! সুখ বুঝি সইলো না। নিন্ ধরুন কলকেটা, দেশলাইটে জ্বালি।'

পাশাপাশি সবাই রান্না করতে বসলাম। অঘোরবাবু ছুরি দিয়ে আলু কুটচেন, ব্রহ্মচারী কোথা থেকে মশলা সংগ্রহ করে' পাথরে পিষতে বসেচে। তবু, উৎসাহ যে আর কিছুতেই নেই তা বেশ বোঝা গেল। মা ও মেয়ে আধমরা হয়ে বসে পড়েচেন, মনে হচ্চে আর তাঁদের উত্থানশক্তি নেই, সর্বাঙ্গ তাঁদের ধুলি-ধূসর, লজ্জাকর মলিন বসন, মাথার চুলে এরই মধ্যে প্রায় জটা ধরেচে, যেন মৃতের সৎকার করে শ্মশান থেকে ফিরলেন। অথচ কেই বা কার দিকে তাকায়? যে দিকেই চোখ ফেরানো যায়, কেবল ক্লান্তি, পথের পীড়ন, অপারগ দেহ, অবসন্ন মন। এরই মধ্যে জনকয়েক স্ত্রী-পুরুষ হাঁটতে না পেরে চড়া দাম আর নাক-খৎ দিয়ে কুলীর পিঠে কাণ্ডিতে উঠেচে! খিদিরপুরের মাসির পা উঠেচে পেকে, কাণ্ডিতে উঠতে-নামতে তার কাতরোক্তি শুন্‌লে ভয় করে।

মনসাতলার নির্মলা ত অনাহারে প্রায় মরতে বসেচে। পথ হেঁটে রান্নার উৎসাহ তার আর থাকে না, জল আর চিনি দিয়ে আটা গুলে খায়, কিন্তু পেটে সইবে কেন, অতএব ফল ফলতে শুরু করেচে। এ ছাড়া মাছির কামড়ের চুলকানি, চুল্‌কে চুল্‌কে কেউ-কেউ পাগল হয়ে ছুটোছুটি করচে। মনে হয় ঝরণার জলে দোষ আছে। পাহাড়ের নানাজাতীয় লতাপাতা ধুয়ে যে ঝরণা নেমে আসে, তার জল ব্যবহার করাও নিরাপদ নয়।

কি আশ্চর্য জল-বাতাসের গুণ। আধ ঘণ্টা বিশ্রামের পর মৃতদেহগুলি আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে। রান্না-বান্না, জটলা, গাল-গল্প, পরচর্চা,—আবার আসে উৎসাহের জোয়ার। আহারাদির পর সবাই বাসন ধুয়ে চটিওয়ালার সঙ্গে হিসাব করতে বসে যায়। এক বেলায় মোটামুটি একজনের আনা চারেক খাই-খরচ পড়ে। কিন্তু যেখানে জিনিসপত্র দুর্মূল্য সেখানে ছ'আনার কমে উদরপূর্তি হয় না। ঘৃত ও দুগ্ধ সম্বন্ধে যারা ব্যয়সঙ্কোচ করে, তাদের শেষ পর্যন্ত শয্যাগত হবার সম্ভাবনা। স্বহস্তে প্রস্তুত ছাড়া আর কিছু আহার করা এ পথে নিতান্তই বিপজ্জনক। প্রতি বৎসর আহারাদির অত্যাচারে কত যাত্রী যে অকর্মণ্য ও অচল হয়ে মৃত্যু-কবলিত হয় তার আর ইয়ত্তা নেই।

'কী যে কষ্ট এদের, দেখ্‌লে আমার কান্না পায়। বেঘোরে জীবন দিতে এরা কেন যে আসে।'

বউটির গলার আওয়াজ শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। কণ্ঠের কারুণ্য ও আন্তরিকতায় প্রথমে কেউ উত্তর দিল না, কিন্তু তারপরেই অঘোরবাবু উত্যক্ত হয়ে বললেন, 'তুমিই বা এলে কেন? ঘরে বসে পূজো করলে পুণ্যি হতো না?'

হাসিমুখে রাধারাণী বললেন, 'মরবার একটা জায়গা চাই ত' ।

'তবে চুপ করে থাকো, বাজে বক্ বক্ করো না।'

শাশুড়ী বললেন, 'বিষ্টিনারাণ আমাদের পথ ভুলিয়ে আন্‌লো বাবা, ব্যাটা শঠ, আমাদের দোষ নেই।

অত ক্লান্তিতেও বউটির মুখে হাসি এল। কিয়ৎক্ষণ পরে বললেন, 'আচ্ছা, পায়ের ওষুধের কোনো খোঁজ পেয়েচেন? ভারি যে বিপদ হ'লো!'

বললাম, 'শ্রীনগরে শুনলাম হাসপাতাল আছে, দেখা যাক্।'

'আপনার ত দেখচি ডান্ পাটা খারাপ হয়েচে, আমার কিন্তু বাঁ-পা। ওঠ্‌বার সময় তবু সহ্য হয়, কিন্তু উৎরাইয়ে···ওরে বাবা, হাঁটু ভেঙে পড়ে, চোখে জল আসে! লাঠির ওপর জোর দিয়ে ডান্ হাতটা আজ আর নাড়তে পারচিনে—আচ্ছা, একটা কথা বলবেন?'

মুখ তুললাম। তিনি অনেক দ্বিধা ও সঙ্কোচ কাটিয়ে হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তখন থেকেই ভাবচি,—আপনি কি স্বামী বিবেকানন্দের কোনো আত্মীয়?'

'আজ্ঞে না।'

আবার কিছুক্ষণ নানা গোলমালে কাট্‌লো। আহারের উদ্যোগ করচি, এমন সময় বউটি চুপি চুপি কী যেন অঘোরবাবুকে অনুরোধ করলেন। স্বামী বললেন, 'কি আশ্চর্য, তুমি বলতে পারো না, এ ত' তোমারই বলবার কথা!'

তিনি পুনরায় সরে এসে দাঁড়ালেন।

মুখ তুলবার আগেই এই স্নিগ্ধ, দীপ্ত ও সম্ভ্রান্ত মহিলাটি তাঁর স্বাভাবিক কোমল লজ্জাজড়িত কণ্ঠে সবিনয়ে বললেন, 'পথে আমগাছ

দেখে কাঁচা আম পেড়ে এনেছিলুম, চাটনি তৈরী করেচি, একটু খাবেন ?'

ভুলেই গেচি পৃথিবীতে কোথাও আছে স্নেহের বন্ধন, কোথাও আছে অযাচিত আত্মীয়তা, ভুলেই গেচি কোথাও আছে মানুষের জন্য মানুষের উদ্বেগ ও হিতকামনা। মনে হ'লো ইনি এসেচেন দূর বাংলার শ্যামশ্রীর কমনীয়তা নিয়ে, মৃত্তিকার মমতা নিয়ে। তবু বিনীত কণ্ঠে বললাম, 'শাস্ত্রে বলে, তীর্থের পথে প্রতিগ্রহ করা উচিত নয়।'

'ও, তবে থাক্, সে কথা আমার মনে ছিল না।' বলতে বলতে তিনি নতমস্তকে চলে গেলেন।

আজ শ্রীনগরে পৌছানো চাই। তাড়াতাড়ি বেলা আড়াইটে আন্দাজ সবাই পথে নেমে এলাম। পায়ের জন্য সোজা হয়ে চলতে পারচিনে, বউটিও নিতান্ত লাঠি ধরে ধরে খুঁড়িয়ে হাঁটচেন, ভালো মালিশের ব্যবস্থা না করলেই আর চলচে না। মাত্র দিন ছয়েক আমরা হাঁটচি, এখনো অন্তত একমাস পথ হাঁটতে হবে, পাগুলিকে সুস্থ রাখা চাই-ই। এক জায়গায় দু'চারদিন বিশ্রাম নিয়ে আমরা পায়ের ব্যথা সারিয়ে নিতে পারতাম, কিন্তু তাতে আমাদের চলার ছন্দ ভেঙ্গে যায়, পিছিয়ে পড়তে হয়, সময়ের সঙ্গে তাল রাখা যায় না। পথের যারা সুখ-দুঃখের অস্থায়ী সঙ্গী—সকালে বিকালে দুঃখে দুর্গমে যাদের ব্যথিত ও করুণ মুখগুলি আমরা নিয়মিত দেখে-দেখে যাই, তাদের একেবারে হারাতে হবে। আমরা সবাই সবাইয়ের পরমাত্মীয় হয়ে উঠেচি—পণ্ডিতজি, পাগড়িপরা রামায়ার, একটি পুণা-আগতা মারহাট্টি বৃদ্ধা, গোপালদা, অম্‌রা সিং, কুলী কালীচরণ ও তুলসীরাম, ব্রহ্মচারী, রুইদাস সুকুল—এদের কাউকে ছাড়তে গেলে বুকে বড় বাজবে। জাতিবিচার নেই, স্পৃশ্যতা ও অস্পৃশ্যতার প্রশ্ন নেই,

সকলে একত্রে বৈঠকে বসে তামাক খাওয়া চলে। হোক্ কালীচরণ কুলী, সে কল্‌কে টেনে গোপালদার হাতে দেয়, গোপালদা দেন অম্‌রা সিংকে, অম্‌রা সিং দেয় ব্রহ্মচারীর হাতে, ব্রহ্মচারীর প্রসাদ পায় রুইদাস স্কুল। সন্ধ্যাবেলা মৌজে না থাকলে কারো চলে না, সর্বত্যাগী পরিব্রাজকের দল ভুরা ও সুল্‌পার নেশায় অর্ধচেতন হয়ে চটির ধারে গা এলিয়ে দেয়। বাইরের পৃথিবীর কোন সংবাদ নেই তাদের কাছে, মানুষের কল্পকামনায় ঘেরা যেন কোন্ এক অলোকসামান্য রূপকথার স্বপ্ন রাজ্য, তাদের মাথার উপর আসে প্রথম সূর্যরশ্মিলেখা, তারা জানে উদাসিনী সন্ধ্যার রহস্যময় পথ। তারা সবাই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী, তাদের মুখে শুধু তীর্থ ও দেবমন্দিরের গল্প; নদী, সাগর ও তুষার-দেশের গল্প; বন্যজন্তুর গল্প; বিপদের কথা ও কাহিনী।

এবেলা প্রায় আট মাইল পথ। ভারি পায়ে লাগচে হাঁটতে। ভীলকেদার পর্যন্ত চার মাইল পথটা অতিরিক্ত কষ্টদায়ক। এখানকার আর-এক নাম চুণ্ডপ্রয়াগ। ভীলগঙ্গা ও অলকানন্দা এখানে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধা হয়েচেন। খান পাঁচ ছয় জীর্ণ চটি রয়েচে পাশাপাশি। প্রথমে প্রস্তাব হ'লো, আজকের মতো ভীলকেদারেই আস্তানা নেওয়া যাক্, কিন্তু কারো মনঃপুত হ'লো না। বেলাও অনেকটা এখনো বাকি, অনায়াসেই এখনো তিন চার মাইল হাঁটা চলবে। পায়ের ব্যথার নাম করে আমরা দু'একজন আপত্তি তুললাম, কিন্তু জনমতেরই জয় হ'লো। শোনা গেল পথে চড়াই আর উৎরাই তেমন কিছু নেই, বেশ পা ছড়িয়ে হাঁটা চল্‌বে, শ্রীনগরে আজই পৌছানো উচিত।

মল্লিকা আর মালতী-লতায় এবেলার পথ ছাওয়া। বুনো গোলাপের জঙ্গল থেকে মুখচোরা গন্ধ ভেসে আসচে। এতদিন পরে আজ একটু

সমতল পথ পেলাম। অলকানন্দার তীর থেকে ঢালু পাহাড়ের গা পর্যন্ত চাষ-আবাদ চল্‌চে। নদীর কোলে কোলে ক্ষুদ্র এক একখানি গ্রাম চিত্রপটের মতো আঁকা। পথে কাঁচা সিদ্ধি ও ফণীমনসার ঘন জঙ্গল, তার ভিতর দিয়ে যাত্রীরা চলেচে। এ অঞ্চলে সকলের চেয়ে বিস্ময়কর হচ্চে আম ও সজিনা গাছ। আশপাশে কোথাও চুন ও বালির পাহাড়, শুক্‌নো ঝরণার গভীর দাগ। নদীর ওপারে মনোরম প্রাকৃতিক শোভা, পর্বত-প্রাচীরে আমাদের ক্লান্ত দৃষ্টি আর প্রতিহত হচ্চে না, চোখগুলি প্রকৃতির অবারিত অবকাশের মধ্যে ছাড়া পেয়েচে। স্নায়ুর গ্রন্থিগুলি আলগা হয়ে এই কমনীয়তার মধ্যে এলিয়ে পড়তে চাইচে। প্রায় আমরা নদীর সমতলে এসেচি।

পিছনেই পড়েছিলাম। চল্‌তে চল্‌তে দেখি মা ও মেয়ে পথের ধারে কাৎ হয়ে বসে পড়েচেন। এগিয়েই যাই আর পিছনেই পড়ি সকলেরই সাক্ষাৎ একবার করে পাওয়া যায়, চল্‌তে চল্‌তে দু'একবার সকলকে বিশ্রাম নিতেই হয়—জল খায়, গায়ে হাওয়া লাগায়, আবার আড়ষ্ট শরীর সোজা করে চল্‌তে থাকে। নদীর কাছে নামলে গ্রীষ্মকাল, চড়াই পথে উঠলে শীতল আবহাওয়া। গরমের চেয়ে ঠাণ্ডাতেই যাত্রীদের সুবিধা। মা ডেকে বললেন, 'তোমাদের শ্রীনগর আর কতদূর বাবা? মেয়ে যে আর চল্‌তে পারে না।'

দাঁড়িয়ে কথা কইতে গেলে সর্বশরীর কন্‌কন্‌ করে, ঝুলি-কম্বল নামিয়ে পথের এপারে মুখ বিকৃত করে বসে পড়লাম। বললাম, 'আর বেশি দূর নেই।

মা ও মেয়ে শ্বাস টান্‌ছিলেন। মেয়ের পায়ের উপর হাত বুলিয়ে মা বললেন, 'তোমার ঘটিতে জল আছে বাবা? একটু দাও ত।'

এমনই আমরা পরিশ্রান্ত যে, তিনিই উঠে এসে জল নেবেন কিংবা

আমিই উঠে গিয়ে দেবো, এই সমস্যায় কয়েক মুহূর্ত কাটলো। তিনিই উঠে এসে জল নিয়ে গেলেন। নিজে খেলেন ও নিমীলিতচক্ষু মেয়ের মুখে ঢেলে দিলেন। পায়ের ব্যথায় মেয়ের আর চেতনা ছিল না, প্রায় চলৎশক্তিহীন, এবার একটু সুস্থ হয়ে মুখ তুলে চাইলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আর প্রয়োজন নেই, ওটা পুরোনো হয়ে গেচে। কেবল বললেন, 'আপনারা পুরুষ মানুষ, ব্যথা নিয়েও গড়িয়ে গড়িয়ে চল্‌তে পারেন, আমরা কিন্তু ভেঙে পড়ি।'

ধূলোয়, বালিতে, তেল-জলের দাগে, অযত্নে ও অসাধ্য পরিশ্রমে অমন লক্ষ্মীর মতো রূপ তাঁর শুকিয়ে কালো হয়ে উঠেচে—এই কথাটিই তাঁর মা বল্‌তে লাগলেন। তাই মনেও হ'লো। সুখের শরীর, ঐশ্বর্য ও ভোগের মধ্যে লালিত, কিন্তু মেয়ের কী নেশা ঘাড়ে চাপলো, এলেন এই দুরতিক্রম্য তীর্থপথে, মাকেও সঙ্গে আসতে হ'লো। এখনকার ছেলেমেয়েরা মনে মনে সবাই ভবঘুরে! শুধুই কি তীর্থ-দর্শন ও পুণ্যকামনা? কই মেয়ে ত তাঁর ঠাকুর-দেবতা নিয়ে কোনোদিন উচ্ছাস প্রকাশ করেনি? অথচ কয়েক বছর ধরে তীর্থে তীর্থে না ঘুরতে পারলে মেয়ের যেন আর শান্তি নেই। বয়স আর কত, তিরিশ বছর হতেও এখনো দেরি!—ধৈর্য ধরে মায়ের কথা শুনে গেলাম।

বিশ্রামান্তে আবার সবাইকে উঠে দাঁড়াতে হ'লো। ঝোলাঝুলির মৃত্যুযন্ত্রণাদায়ক বোঝা আবার পিঠে তুলে নিলাম। মা ও মেয়ে লাঠি ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে এগিয়ে চললেন। একবার বললেন, 'অঘোরকে বলি, বাবা এতখানি করে পথ ত আমরা হাঁট্‌তে পারবো না, না-হয় দশদিন দেরিই হবে, প্রাণ যে যায়! দশ মাইলের বেশি মেয়েমানুষের পক্ষে রোজ হাঁটা …সে হবে না বাবা।'

পথের উপর জুতো ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে তাঁরা চলেছিলেন। বাস্তবিক তাঁদের অবস্থা দেখে যে-কোনো লোকেরই মনে হবে, এখনি হয়ত কোথাও তাঁরা অকর্মণ্য হয়ে পথের ধারে শুয়ে পড়বেন—কিছুই বিচিত্র নয়!

অবশেষে এক সময় শ্রীনগরের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হ'লো। পথের ধারেই কালীকম্বলীওয়ালার একটি জলসত্র, বাঁ দিকে ফণীমনসার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটি সঙ্কীর্ণ পথ কমলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের দিকে চলে গেচে। পথের মোড়ে অঘোরবাবু ও ব্রহ্মচারী প্রতীক্ষা করছিলেন। মা ও মেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'এমন করে আমরা কিন্তু হাঁট্‌তে পারিনে, সকলের শরীর ত আর সমান নয়! পায়ের এই শোচনীয় অবস্থা—'

ব্রহ্মচারী বললে, 'ধর্মশালায় গিয়ে আপনার পায়ের জন্য আমি ভালো ওষুধ করে দেব মা।'

'আচ্ছা বাবা।' বলে বউটি মায়ের সঙ্গে অগ্রসর হতেই অঘোরবাবু বললেন, 'কমলেশ্বর দর্শন করা হবে না?'

'মাথায় থাকুন।'—একটু বিরক্ত হয়েই তাঁরা কথার জবাব দিয়ে গেলেন।

সকলে একে একে এগিয়ে যাবার পর আমি ও ব্রহ্মচারী গেলাম মন্দির দর্শনে। কিন্তু এমন কিছুই নয়। পুরাতন শুষ্ক মন্দির, ভিতরে প্রকাণ্ড এক শিবলিঙ্গ। পূজা-অর্চনার কোথাও আয়োজন নেই। নিকটে বোধ হয় কোথাও গ্রাম ছিল, ছেলেমেয়েরা ও মন্দিরের রক্ষকের দল ছুটে এসে পাই-পয়সার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। ভারতের প্রায় সকল তীর্থেই ঠাকুরকে কেন্দ্র করে যাত্রীদের 'পরে এমনি জুলুমই চলে। চাতুরী ও ফন্দির দ্বারা যাত্রীদের শোষণ করা এদেশের বহুতীর্থগুরুদের একটি

প্রধান কাজ। উত্ত্যক্ত হয়ে ফিরে এলাম। পথ আর বেশিদূর ছিল না, খানিকটা রাস্তা এসেই ডানহাতি একটা পাকা গাঁথুনির বড় হাসপাতাল পাওয়া গেল। খুশী হয়ে ভিতরে ঢুকলাম। যে ক'জন রোগী রয়েচে তারা সবাই প্রায় অকর্মণ্য যাত্রী। আমাদের আরজি পেশ করলাম। পায়ের জন্য একটি মলম, নাকের ঘায়ের জন্য খানিকটা ভেসলিন্ পমেড, এবং ব্রহ্মচারীর দাঁতের জন্য একটু আইডিন—এই নিয়ে আমরা চারিদিক দেখে শুনে আবার বেরিয়ে এলাম। শ্রীনগর রীতিমত একটি সুসজ্জিত ক্ষুদ্র শহর। অবশ্য এখানকার হেড-কোয়ার্টার্স পৌড়ীতে—এখান থেকে নয় মাইল দূরে; সেখানে আদালত, পুলিশ, জেল ও হাকিম সায়েবের বাসা। পৌড়ীর খুব নাম। পথে জন ছুই বাঙালী ভদ্রলোককে দেখে বিস্ময়বোধ করলাম। তাঁরা এই সুদূর হিমালয়ের গহন-রাজ্যে এখানে কোন্ কলেজে শিক্ষকতার কাজে এসেচেন। বাঙালী যে দিগ্বিজয়ী তাতে আর সন্দেহ নেই। আলাপান্তে আবার অগ্রসর হলাম। শহরের একটি মাত্র পাকা রাজপথ, কি ভাগ্যি পথটা সমতল। দোকানপাট অনেকগুলি, বিলাতী ও জার্মানী মাল মন্দ চল্‌চে না। সেটা আইন অমান্যের যুগ। শুনলাম কয়েকদিন আগে এখানে পিকেটিং ও সভা-সমিতি হয়ে গেচে। পথে এক জায়গায় এখনো ১৪৪ ধারার নোটিশ টাঙানো, সভাসমিতি বন্ধ। খুঁজে খুঁজে এসে ধর্মশালার ভিতরে ঢুকলাম। ভিতরে দু'মহলা প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। সুমুখে একটি মন্দিরে সন্ধ্যারতির আয়োজন চল্‌চে। বিরাট দোতলা ব্যারাক। ভারি স্ফূর্তি হ'লো। লাঠিটা অবলম্বন করে বেশ খানিকটা বেড়িয়ে নিলাম। রাস্তার উপরেই দু'টো বড় বড় খাবারের দোকান, অতএব আমার রান্নাবান্না করতে হবে না, নৈশভোজন পর্বটা সমারোহের সঙ্গেই আজ

সাঙ্গ হবে! খোঁজ নিয়ে জানা গেল, দোকানে চায়ের বন্দোবস্তও হতে পারে! তবে আর কি, কেল্লা মার দিয়া, আর পায়ে ব্যথা নেই,—বদরীবিশাললাল কি জয়! ওঁ নমো নারায়ণায়!—আনন্দে ব্রহ্মচারী লাট্টুর মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

কী অনির্বচনীয় আরামদায়ক রাত্রিই না নেমে এল। দুগ্ধ, দধি, জিলিপি, চা, উৎকৃষ্ট ঘৃতপক্ক পুরি, আলুর তরকারি, অম্ল—সবগুলিই প্রায় একত্রে ভোজন করা গেল। আহারের পর্বটি যতক্ষণ চললো, ব্রহ্মচারী চোখ খুল্‌লো না। বললে, 'দাদা, মুখব্যাদান করে থাকি, যত খুশি লগেজ ভেতরে ঢুকিয়ে দিন্।'

'কলেরা হবে যে ব্রহ্মচারী?'

উচ্চকণ্ঠে এই ক্ষুদ্র মানুষটি চক্ষু বুজেই হেসে উঠ্‌লো। বললে, 'দাদা, ভয় পাচ্ছেন রথে উঠে? বিশ্বরূপ দেখিয়ে দেবো? এই পেটে আজ সব গ্রাস করে ফেল্‌তে পারি! আমি দাদা উপোসী ছারপোকা!'

আহারান্তে ব্রহ্মচারী গান গাইতে গাইতে উপরে উঠে এল। পাশাপাশি দু'জনে কম্বল ছড়িয়ে জমি নিলাম। আজ ব্রহ্মচারী ঘন ঘন 'ওঁ নমো নারায়ণায়' ছাড়তে শুরু করেচে। মনে হ'লো আজকের আহারে তার দন্ত, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা ও তালু—সবগুলি পরিতৃপ্ত হয়েচে। কত গল্পই সে করলো। ওধারে গোপালদা সদলবলে এসে বুড়ীদের গোলকধাঁধাঁয় ঘুরপাক খাচ্চেন। সন্ধ্যায় একমাত্রা আফিম ও এক ছিলিম্ গঞ্জিকার পর গোপালদা এক অভিনব মূর্তি ধারণ করেন,—দেবলোকের পারিজাতকাননে দার্শনিকের মতো তিনি ভ্রমণ করে বেড়ান, সে সময়ে কেউ উত্ত্যক্ত করলে তাকে হত্যা করা উচিত। বিড়ালস্বভাব বুড়ীগুলোর জ্বালায় বেচারার আর শান্তি নেই! মাথার দিকের ছোট্ট ঘরটিতে

অঘোরবাবু সপরিবারে এসে উঠেচেন, এইমাত্র তাঁদের আহারাদি শেষ হয়েচে। তাঁরা অর্থাৎ মা ও মেয়ে এসে একবার আমাদের ভোজন ও শয়ন সম্বন্ধে তদ্বির করে গেলেন।

পায়ের বেদনা কিন্তু কারোরই কমলো না, নানা টোটকা, মুষ্টিযোগ, হাসপাতালের মালিশ,—কিছুতেই না। অতএব সাব্যস্ত হ'লো অল্প অল্প পাঁচ সাত মাইল রোজ হাঁটতে হবে। কষ্টের সময় আমরা সাধারণত যে কল্পনা করি, কার্যক্ষেত্রে তার ঘটে পরিবর্তন। পথে নেমে মনে হয়, পথ ফুরোলেই বাঁচি। শ্রীনগর থেকে প্রাতে বেরিয়ে বেলা আন্দাজ এগারোটার সময় আমরা ভট্টিসেরায় এসে পৌছলাম। পথে স্বক্কতা নামক ক্ষুদ্র নদী ও একটি চটি পার হয়ে এলাম। ভট্টিসেরার পথ একটু সমতল, তাই আট মাইল এক বেলায় পার হয়ে আসতে পারলাম। পাশেই নদী, নাম হর্ষবতী, অলকানন্দারই একটি শাখা। চটির পাশে একটা ঝরণা, তারই প্রবাহকে বুদ্ধির দ্বারা মানুষ কেমন আপন প্রয়োজনে লাগিয়েচে সেই দৃশ্যই এখানে দেখা গেল। এর নাম পানচাক্কী অর্থাৎ পানি ও জাঁতা। কাঠের একখানা চাকার উপরে জলস্রোত এসে ধাক্কা দিয়ে তাকে ঘুরিয়ে দিচ্চে, উপরে লাগানো আছে পাথরের জাঁতা এবং তার মধ্যে গম। বিনা পরিশ্রমে আটা তৈরী হচ্চে। তারিফ না করে উপায় নেই। যতদূর স্মরণ আছে, এই ভট্টিসেরায় গোপালদার দলের বামুন-মার সঙ্গে অঘোরবাবুর কলহ হয়। উপলক্ষ—জাতিবিচার ও শুচিবাতিক। অত্যন্ত সামান্য কারণে বামুন-মার প্রচণ্ডতা দেখে অঘোরবাবুর স্ত্রী স্তম্ভিত হাসি হেসে মুখের দিকে তাকালেন। বামুন-মা আমাদের সনাতন ধর্মের মূর্তিমতী প্রতিমা, জাতিবিচার ও অস্পৃশ্যতা ছাড়া তিনি বাঁচবেন কেমন করে? তিনি সান্‌কি-ভাঙার মতো খান্ খান্ করে' উঠলেন, 'কি পাপেই

তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়েচে মা, শুকনো কাপড়খানি আমার কোন্ আক্কেলে ছুঁয়ে দিলে? শূদ্দুরের বাড়াবাড়ি আজকাল বড্ড বেড়ে গেচে, বাছা!'

অঘোরবাবুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল, স্ত্রী এসে তাঁকে সাম্‌লে বললেন, 'ছি, যতই হোক্ ব্রাহ্মণের মেয়ে, ওঁর সম্মান রেখে চল্‌তে হয়।'

ব্রহ্মচারী রাগে গোঁ গোঁ করে বললে, 'ও কি বামুনের মেয়ে মা, ও ত চণ্ডাল।'

'ছি বাবা, ও কথা বল্‌তে নেই। যে অন্ধ তার দৃষ্টি নেই বলে গাল্ দেওয়া বড় পাপ।'

গোপালদা নীরবে বসে রইলেন, বোবার শত্রু নেই! কিন্তু সেইদিন বিকাল বেলায় আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলাম। ছান্তিখালের উত্তুঙ্গ এবং মর্মান্তিক দু'মাইল চড়াই অতিক্রম করে খাঙ্করা চটির দিকে নেমে এলাম —তখনো সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব আছে। অপেক্ষাকৃত সমতল স্থান, নিকটে অলকানন্দারই আর একটি শাখানদী, নাম পট্টবতী, অদূরে মনোরম একটি পার্বত্য উপত্যকা, তিনদিকে গগনস্পর্শী পর্বতচূড়া, স্নিগ্ধমধুর বাতাস, ঝরণার ঝঙ্কার, বনফুলের লজ্জাজড়িত গন্ধ,—অঘোরবাবুর স্ত্রী বললেন, 'আজকে আর এগিয়ে কাজ নেই, এখানেই থাকুন না?'

পথের দিকে একবার ফিরে তাকালাম। প্রায় এক মাইল দূরে নদীর বাঁকে সদলবলে গোপালদার সুস্পষ্ট ক্ষুদ্র শরীরটি দেখা গেল, মন্থর পদে পিপীলিকাশ্রেণীর মতো তাঁরা চলেচেন, অন্যান্য সঙ্গীরাও যাচ্চেন। বললাম, 'ওদের কি ছেড়ে দিতে বলেন?'

তাঁর হয়ে অঘোরবাবু বললেন, 'মাইল দুই হয়ত পিছনে থাকবো, তারপরে ধরে নিলেই চল্‌বে।' মা বললেন, 'তাই থাকো বাবা,

তোমার শরীর আমাদের চেয়েও খারাপ হয়েচে, আমাদের কুলীর কাছে বিছানা আছে, তারা আসুক, তোমার জন্যে বিছানা পেতে দিই। এবেলা তোমার আর আলাদা রেঁধে কাজ নেই, আমাদের সঙ্গেই ব্যবস্থা হোক।' ব্রহ্মচারী বল্‌লে, 'আজকের মতো ওদের মায়া-মমতা কাটান দাদা!'

স্বামী-স্ত্রী তখন এদিকে তাকিয়ে জয়ের হাসি হাসচেন। আমাকে তাঁরা যেন জয় করেচেন। বললাম, 'আজ না-হয় রইলাম এখানে, কিন্তু এত অল্প পথ হাঁট্‌লে অন্য দিন আমার ত চল্‌বে না! যাত্রাটা আমার তাড়াতাড়ি শেষ করা চাই।'

'বেশ ত, আজকের মতনই না-হয় থাকুন, মায়ের অনুরোধও ত রাখতে হয়!'

সন্ধ্যা হ'লো, পাহাড়ের চূড়ার পাশে শীর্ণ চন্দ্র দেখা দিল, তারায় তারায় ছেয়ে গেল আকাশ—সমস্তটার চেহারাই যেন কেমন করে বদ্‌লে গেল। হয়ত এমনি করেই বদ্‌লায়। দিনে প্রখর আলো, স্থূল বাস্তবিকতা, মানুষের দৈন্য ও স্বার্থের অতি স্থূল ঘাত-প্রতিঘাত; কিন্তু কি আশ্চর্য, রাত্রে সব বদ্‌লায়, এই বিশ্বপ্রকৃতিকে প্রসাধন-পরিপাট্যে অলঙ্কৃত ক'রে কে যেন মনোহর করে তোলে, রাত্রির স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় দিনের প্রখরতা যেন আর মনে পড়ে না।

মা ও মেয়ের আন্তরিক যত্ন ও পরিচর্যায় সে-রাত্রে আমরা সবাই যথেষ্ট আনন্দ পেলাম। উচ্চ শিক্ষার এমন একটি দীপ্তি ও গাম্ভীর্য বৌটির মুখে চোখে দেখলাম যে, আমরা দু'জন সন্ন্যাসী পর্যন্ত তাঁর প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না। ব্রহ্মচারী ত 'মা, মা' বলে একরূপ

উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌লো। আমি বাইরে বসে আকাশের তারা গুন্‌তে শুরু করে দিলাম। সে-রাত্রি কাটলো। সকাল বেলা ব্রহ্মচারীকে নিয়ে আগেই বেরিয়ে পড়লাম। প্রথম তিন চার মাইল পথ আমরা নিঃশব্দে হন্‌হন্‌ করে চলে যাই। পথে কোথাও সকালের দিকে প্রায়ই দুধ মেলে, চার আনা ছ' আনা সের। গরম দুধ খেয়ে আবার চলি। আজকে সঙ্গে আর যাত্রী নেই, যে দু'একজন পাওয়া গেল তারা অপরিচিত, সহযাত্রী দেখে 'জয় বদরীবিশাল' বলে চল্‌তে লাগলো। চল্‌তে চল্‌তে আমরা চিড়বনের বায়ুপ্রবাহের মতো পরস্পরের নিশ্বাসের শব্দ শুন্‌তে পাই—বিশেষ করে চড়াই পথে ওঠবার সময়। আজকের পথ কোথাও অতি সঙ্কীর্ণ, যথেষ্ট সতর্ক হয়ে সাবধানে হাঁট্‌তে হচ্চে, নীচের দিকে অতি সাহসী ব্যক্তিরও তাকাবার দুঃসাহস নেই, মাথা ঘুরে পড়ে যাবার সম্ভাবনা, অতল পাথার যেন যাত্রীদের নিরন্তর আকর্ষণ করে নেবার চেষ্টা করচে। পায়ের ব্যথাটা সহ্য করে চলা অভ্যাস হয়ে গেচে, যন্ত্রণা ও দুঃখ শরীরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েচে, সোজা হয়ে সুস্থ দেহে হাঁট্‌তে ভুলে গেচি। সমস্ত দুঃখই মানুষকে এমনি করে সহনশীলতা দেয়, আপন প্রয়োজন সিদ্ধ করতে মানুষকে সে উপযুক্ত করে, খাঁটি করে নেয়, দুর্গমকে সহজ করে দেবার জন্য তাকে সে কঠিন করে তোলে। নির্মল ও পরিচ্ছন্ন হয়ে আমাদের চলার উপায় নেই, সমস্ত পথটির দাগ আমাদের সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেচে। লোকের চক্ষে আমরা আগেকার সেই সামাজিক মানুষ আর নেই। আমাদের সর্বশরীরে হিমালয়ের ছাপ, একদিকে জ্বালা যন্ত্রণা অন্যদিকে দুঃসহ ক্লান্তি, ছিন্ন-মলিন বসন, ধূলি-ধূসর কালিবর্ণ দেহ, কোটর-প্রবিষ্ট ক্ষীণ ও শূন্য দৃষ্টি, রক্তহীন শীর্ণ রূপ—আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলি। আমরা যেন খরচ হয়ে গেচি, দেউলে হয়ে গেচি।

সেদিন মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে হাঁপাতে হাঁপাতে আমরা কয়েকজন প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় অলকানন্দার পুল পার হয়ে রুদ্রপ্রয়াগে এসে পৌঁছলাম। বিশ্রাম, কোথাও একটু বিশ্রাম নিতে চাই। লাঠির উপরে ভর দিয়ে দিয়ে একটা ধর্মশালার দোতলায় উঠে থুব্ড়ে বসে পড়লাম। আর সঙ্গতি নেই, রুচি নেই—আর পেরে উঠিনে। একবার চীৎকার করে পথের এই দুঃখের প্রতিবাদ করতে গেলাম—কিন্তু থাক্, আগে একটু শুয়ে পড়ি। সব চুলোয় যাক্, সমস্ত ধ্বংস হোক্—এর কী প্রয়োজন ছিল কেউ আজ বল্‌তে পারে? কী আমরা চাই? এই দুঃখের অবসান যেদিন হবে, কী আমাদের মিল্‌বে সেদিন? কাঙালের মতো দৈন্য ও মালিন্য নিয়ে কী ভিক্ষে করতে এসেচি?

চোখের পাতা বন্ধ করে শুয়ে আছি। আঃ, এই ভালো! আর চোখ মেলে তাকাবো না। আর যেন কেউ দেখতে না পায়! সবাই ফেলে যাক্, দূর হয়ে যাক্, এই পুণ্যলোভী তীর্থকীটগুলোর প্রতি আর কোনো শ্রদ্ধা নেই, কোনো মায়া নেই! আর কোথাও যাব না, অনেক শিক্ষা হয়েচে, এবার মাটি কাম্‌ড়ে এইখানে পড়ে থাক্‌বো!

কিন্তু হায় রে, নির্লজ্জ দেহ আবার স্নিগ্ধ মধুর বাতাসের স্পর্শে একটু একটু করে সজীব ও সচল হয়ে ওঠে। ধর্মশালার নীচেই যে ঘন নীল অলকানন্দার কলকল্লোল, কেমন করে চোখ বুজে পড়ে থাকি! ঘনবনরাজিশ্যাম পর্বত-চূড়ার ছায়া নেমে এসেচে যে রৌদ্রোজ্জ্বল জলপ্রবাহের উপরে—ওরে মন, চেয়ে দেখ্! চেয়ে দেখি,—দেহ আর কাতর নয়, দৃষ্টি আর ক্ষীণ নয়, ব্যথা নেই, বিক্ষোভ নেই,—এমনটি আর কোথায় কবে দেখেচি! এ ত' কেবল রূপ নয়, এ যে রূপাতীত; কেবল সৌন্দর্য নয়, লোকোত্তর ব্যঞ্জনা; কেবল কাব্য নয়, সুদূর অনির্বচনীয়তা। জল, মাটি,

গাছ, আলো আর আকাশ—এদের ছন্দের মধ্যে এনে ভাবরূপ দেওয়া, ব্যঞ্জনার দিকে ইঙ্গিত করা—এ যে সকলের চেয়ে বড় শিল্পী, সর্বোত্তম স্রষ্টার কারুকার্য। ওর মন, চেয়ে দেখ্!

ধীরে ধীরে উঠে বসলাম, যেন হাড়গোড় ভেঙে পঙ্গু হয়ে গেচি, পায়ে আর হাত দিতে পারচিনে, যেন বড় বড় ফোড়া উঠেচে। এই রুদ্রপ্রয়াগ! সামান্য একটুখানি শহর, ওপারে পাহাড়ের কোলে ছোট ছোট দুটি সরকারি বাংলা, দক্ষিণে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম-তীর্থ। একটি নদী দেবলোকের, অপরটি ব্রহ্মলোকের। এই নদীর সঙ্গমে একদিন গয়রাজার যজ্ঞে অসন্তুষ্ট পরশুরামের শাপে ব্রহ্মরাক্ষসযোনিপ্রাপ্ত দু'লক্ষ ব্রাহ্মণ মুক্তি লাভ করেছিলেন। এখানে আছে রুদ্রেশ্বর শিবমন্দির, ধর্মশালা, সদাব্রত, ডাকঘর ও একটি ক্ষুদ্র বাজার। রুদ্রপ্রয়াগে রাস্তা দু'ভাগ হয়ে গেচে। একটি পথ কর্ণপ্রয়াগ হয়ে অলকানন্দার তীরে-তীরে সোজা চলে গেচে বদরিকাশ্রমের দিকে, আর একটি পথ মন্দাকিনীর তীরে-তীরে কেদারনাথের দিকে উঠে গেচে। আমরা প্রায় একশো মাইল অতিক্রম করে এসেচি। ভিতরে চারিদিকে চেয়ে দেখি, যেন মৃত্যুপুরী। জ্বরাক্রান্ত, আমাশয়গ্রস্ত, অকর্মণ্য কোনো কোনো যাত্রী, মুখে চোখে মাছি বসেচে, কিন্তু সাড়া নেই; মৃত্যু ঘট্‌লে শববহনের লোক নেই! অথচ এমনি করেই এরা চলেচে, খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে, টিক্‌টিকির মতো পাহাড় বেয়ে ওঠে, মাঝে-মাঝে রোগে ও যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে অনেককেই থাম্‌তে হয়। সহযাত্রীরা একবার মুখ ফিরিয়ে উদাসীন হয়ে 'আহা' বলে চলে যায়! বাবার বুঝি দয়া হ'লো না!

দিন গড়ালো অপরাহ্ণের দিকে। যারা কেদারনাথের দিকে উজিয়ে যেতে ভয় পেল, তারা যাত্রা করলো সোজা বদরীনাথের দিকে।

কেদারনাথের পথ ভয়াবহ। কেদার দর্শন করতে গেলে আরো প্রায় আশী মাইল পথ হাঁট্‌তে হয়। রুদ্রপ্রয়াগের সঙ্গমে তাই যাত্রীদের হয় পুণ্যকামনার অগ্নি পরীক্ষা। যারা দেহের ভয়ে ভীত, অশক্ত ও দুর্বল, যাত্রার উৎসাহ যারা হারিয়েচে, রোগ-মসীঢালা কালী তনু যাদের, তারা আর কেদারের পথের দিকে ফিরেও তাকায় না, সোজা চলে যায় কর্ণপ্রয়াগের দিকে। তাদের পক্ষে শুধু বদরী, কেদার-বদরী নয়! আমিও কেদার পরিত্যাগ করবার সাব্যস্ত করলাম। কিন্তু ঘটনার প্রতিঘাত হ'লো অন্য রকম। অপরাহ্ণের দিকে একজন নিম্ন শ্রেণীর বাঙালা স্ত্রীলোক হঠাৎ খুঁজে খুঁজে পায়ের কাছে এসে কেঁদে পড়লো,—'ও বাবা, রক্ষে করো বাবা, আমার মা-গোসাঁয়ের আর কোন উপায় নেই, তোমার কথা সারা পথ শুন্‌তে শুন্‌তে এসেচি বাবা,…আমাদের আর কেউ নেই ধন!'

প্রথমটা সে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো, কান্না থামলে যে ঘটনাটা সে ভেঙে-ভেঙে জানালো তা হচ্চে, গুরুমা ও জনকয়েক শিষ্যা এসেছিল কল্‌কাতার উল্টোডিঙি বোষ্টমের আখ্‌ড়া থেকে, শেঠের বাগানে তাদের আখ্‌ড়া। বেশ আসছিল সবাই, পরশু রাতে কোন্ এক চটিতে অন্ধকারে গুরুমা চটির দরজা থেকে কি একটা প্রয়োজনে নেমে এসেছিল, হঠাৎ পা ফস্‌কে পাহাড় থেকে পড়ে যায়, ওলোট-পালট খেয়ে গড়িয়ে গিয়ে কোথায় যেন আট্‌কায়, চটির লোক নেমে গিয়ে তুলে আনে। তা'রা দেখে গুরুমার সর্বশরীরের অস্থি চূর্ণ-বিচূর্ণ, রক্তাক্ত ও অচেতন। পয়সাকড়ি যা ছিল তাই দিয়ে অতিকষ্টে এক কাণ্ডি যোগাড় করে বুড়ীকে শ্রীনগরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা হয় বটে কিন্তু স্থানাভাবে রোগীকে কর্তারা রাখতে চায়নি, ঔষধপত্র কিছু সঙ্গে দিয়ে রুদ্রপ্রয়াগে দিয়েচে

পাঠিয়ে। '—এসো বাবা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, একটা ব্যবস্থা করে দাও।' হাউ হাউ করে সে আবার কান্না জুড়লো।

ঘটনাটা অবশ্য সবই সত্য। নীচে এসে দেখি, বুড়ী যন্ত্রণায় মর্মান্তিক চীৎকার করচে। সমস্ত জীবন ধরে ধর্মাচরণ করে ও শিষ্যার কানে মন্ত্র দিয়ে এই সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থের পথে এসে একটি নারীর এমনি শোচনীয় পরিণাম! কিন্তু জীবনে এমনিই ত হয়। অপরাধ নেই অথচ শাস্তি আছে, পাপ নেই অথচ আছে একটা যুক্তিহীন প্রতিফল, কারণ নেই অথচ রয়েচে দুঃখ ব্যথার একটানা দুর্ভোগ। কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই, সময় বয়ে যায়, অতএব লাঠির উপরে অবলম্বন করে লোকজন ডেকে এনে বুড়ীর অবস্থার কথা নিবেদন করলাম। একটি স্থানীয় যুবক ও অঘোরবাবু সেদিন যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। বাজারে, পথে ঘাটে ও যাত্রীদের কাছে ঘুরে ঘুরে মানুষের জীবনের আকস্মিক বিপদ সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে পরিশেষে তাদের দুর্বল মুহূর্তে চাতুর্যের সঙ্গে ভিক্ষাপাত্র বাড়ালাম। আমরা ভিখারীর জাতি, অতএব অসম্ভ্রম বোধ করলাম না, বরং পরোপকারের আবরণে ঢেকে ওটাকে বেশ একটা মহত্ত্বের মুখোশ পরানো গেল। আধলা, পয়সা, আনি, দু'আনি, আধুলি,—কিন্তু পুরো একটা টাকা কেউ দিল না। দোষ বোধ করি আমারই, এক টাকা দামের মতো বক্তৃতা হয়ত দিতে পারিনি, ষোল আনা মূল্য একসঙ্গে পাওয়া গেল না! জীবনে বোধ করি এই প্রথম নিঃস্বার্থ পরোপকার করবার সুযোগ পেয়েচি, অতএব এ'কে সহজে ছাড়ছিনে, কচ্‌লে কচ্‌লে যাত্রীর কাছে অর্থ শোষণ করছিলাম। যে রকম অন্ধ আবেগে ও ক্লাসিক্ হিন্দি ভাষায় সেদিন মানুষের নীতিবোধ, ধর্মানুভূতি ও পরোপকারের প্রেরণা সম্বন্ধে উত্তেজনামূলক বক্তৃতা দিলাম, তাতে বিষয়টা

রাজনীতির দিকে ঘোরালে হয়ত এই চল্লিশ কোটি দেশবাসী বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠতো।

কিন্তু এত করেও পনেরো টাকার প্রয়োজনে সাড়ে বারোটি টাকার বেশি চাঁদা ওঠানো গেল না। বাকিটা নিজেদেরই ভাগাভাগি করে দিতে হ'লো। অঘোরবাবুর স্ত্রী হেসে বললেন, 'আপনি কী! লোকে মাতৃদায়েও যে এত কষ্ট করে না! হ্যাঁ, আজ আমার দিকে আপনার খাবার করেচি, খাবেন ত? আজ কিন্তু কিছুতেই আর শুন্‌বো না।'

'যথাযোগ্য মূল্য ধরে নেবেন, বলুন?'

'যদি পারেন ত দেবেন! যা দেবেন তাতে শুধু খাবারের দামটাই উঠবে, মনে রাখবেন।'

অঘোরবাবু তাঁর স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে আমাকে বললেন, 'আপনি বড় নির্দয়, মশাই।'

টাকাগুলি একটি শিষ্যার হাতে গুণে দিয়ে বুড়ীকে আগামী কাল প্রাতে উখীমঠ হাসপাতালে ডাণ্ডিযোগে পাঠাবার ব্যবস্থা করে যখন হাঁপাতে হাঁপাতে উপরে উঠে এলাম, তখন নিশ্চয় রাত দশটা বাজে। প্রায় সব যাত্রীই তখন গভীর ঘুমে অচেতন। এতক্ষণে ব্রহ্মচারীর দেখা পাওয়া গেল। ঝড়-ঝাপটার সময় কোথায় যে সে অদৃশ্য হয় বোঝা যায় না। তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সে বললে, 'দাদা, গান শুন্‌বেন?'

গান! এই মৃত্যু দিয়ে ঘেরা মহা দুর্গমে কেউ আবার গান গায়? পীড়িতের নিশ্বাস শুনেচি, জর্জরিতের বিলাপ শুনেচি, গান ত শুনিনি! বিস্মিত হয়ে বললাম, 'গান কোথায় ব্রহ্মচারী?'

'আসুন আমার সঙ্গে।' বলে সে হাত ধরে নিয়ে চললো।

পথ নিস্তব্ধ। কোথাও আলোর চিহ্নমাত্র নেই। চোখে তখন ঘুম জড়িয়ে এসেচে, শরীর বড় ক্লান্ত, তবু যেতে হ'লো। পথ ঘুরে সোজা সে নদীর সঙ্গমের ধারে এসে বললে, 'নেমে আসুন, এই যে বাঁধানো সিঁড়ি!'

'কোথায় যাবো, এ যে নদী! নদীর গান নাকি?'

'নামুন না সিঁড়ি দিয়ে, বলি।'

লাঠির উপরে শরীরের ভর দিয়ে পায়ের ব্যথা নিয়ে কয়েকটা সিঁড়ি নামলাম। এতক্ষণ পরে দেখলাম, সুন্দর জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। পরিচ্ছন্ন সুস্মিত নীল আকাশে নক্ষত্রগুলি জল্ জল্ করচে। দুইটি নদীর ঘাত-প্রতিঘাতে জলের প্রবল গর্জন, কান পাতা যায় না। তবু সেই শব্দ অতিক্রম করেও মনে হ'লো, আজ বড় সুন্দর প্রশান্ত রাত্রি। আজ আর ঘুমোবার কথা নয়, নদী-পর্বত ও জ্যোৎস্নার দিকে একান্তমনে তাকিয়ে আজকের রাত এমনি করেই কাটানো উচিত। সেই স্বপ্নময় রাত্রে নদীর গর্ভের দিকে ইঙ্গিত করে ব্রহ্মচারী বললে, 'আসুন আমার সঙ্গে, এই যে বাঁ-হাতি—'

সিঁড়ির পাশেই পাহাড়ের ঢালু গায়ে একখানি কাঁচাপাকা কুটীর। ব্রহ্মচারীর পিছনে পিছনে তার ভিতরে এসে ঢুকলাম। টিপ্ টিপ্ করে এক কোণে একটি আলো জল্‌চে। ব্যাঘ্র ও ভল্লুক-চর্মের খান-তিনেক আসন পাতা, তারই একটির উপরে এক স্থূলকায়া প্রৌঢ়া সন্ন্যাসিনী বসে রয়েচেন, নবাগতকে দেখে হেসে সস্নেহে ডাকলেন, 'আও বেটা!'

তাঁর পদপ্রান্তে গিয়ে বসে প্রণাম করলাম। বুঝলাম আসবার আগেই ব্রহ্মচারী আমার সম্বন্ধে এঁর কাছে আলোচনা করে রেখেচে।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, একপাশে একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ হাতে একটি একতারা নিয়ে বসে রয়েচেন, সম্ভবত তিনিই গায়ক। আদর-অভ্যর্থনার ত্রুটি হ'লো না, অনেক তীর্থ সম্বন্ধে আলোচনা চলতে লাগলো। সন্ন্যাসিনী নারায়ণ গিরি মায়ি কৈলাস যাবার জন্য পরামর্শ দিলেন, আষাঢ় মাসেই কৈলাস যাওয়ার উপযুক্ত সময়, এবারের সুযোগ যেন ত্যাগ না করি। বিনয় ও ভক্তি সহকারে তাঁর বাণী শুনে যাচ্ছিলাম। ঘরের ভিতর আসবাবপত্র বল্‌তে কয়েক ছড়া রুদ্রাক্ষের মালা, গোটা দুই শাঁখ, কাঠের কয়েকটা কৌটা, খান চারেক কম্বল, পাথরের কয়েকটা বাসন, কতকগুলি তাম্রপাত্র ও ফুল, মোটা মোটা খান তিনেক বই, আগুন রাখার একটা খাপরা। অনেক গল্পই মায়িজির সঙ্গে চল্‌তে লাগলো, সবাই যোগ দিলাম, মায়ের কাছে সবাই বেটা ও বেটি,—বড় ভালো লাগলো। আলোটা টিপ টিপ্ করচে, দরজার কাছে আকাশ থেকে এক ঝলক জ্যোৎস্না এসে পড়েচে, মায়িজি তাঁর মনোরম হিন্দি ও উর্দু ভাষার লালিত্য দিয়ে তাঁর বহু তীর্থপথের অভিজ্ঞতার কথা বলে যেতে লাগলেন। কোথায় কোন্ নদীর তীরে হিংস্র শ্বাপদের আনাগোনা, কোন্ মরুভূমি পার হয়ে কোথায় গেছে অপরিচিত দুর্লভের পথ, অজানা কোন্ পর্বত-চূড়ার তুষারাচ্ছন্ন পথে কবে ঝব্বু ও ঘোড়ার পিঠে উঠে তাঁকে কৈলাস যেতে হয়েছিল, তারই রহস্যময় ও চমকপ্রদ কাহিনী। কথা বলতে বলতে এক সময় তিনি ভিতরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ছিলম্ বনায় দেও রপ্‌পি, এ সোনি ?'

ভিতর থেকে আওয়াজ এল, 'দেথৈ মায়ি!' এবং তারই মিনিট দুই পরে দু'টি তরুণী সন্ন্যাসিনী লঘু পদক্ষেপে বেরিয়ে এলেন। প্রথমটি মায়ের কাছে এসে বসলেন এবং দ্বিতীয়টি একটি পিতল-বাঁধানো বড় সরু

কল্‌কে মায়িজির হাতে দিয়ে অন্য পাশে গিয়ে বসলেন। ভিতরের আবহাওয়াটা মুহূর্তের জন্য যেন কেমন বদ্‌লে গেল। প্রথমেই মনে হ'লো এ দুটি ফুল একই বৃন্তের। মাথায় জটাময় রুক্ষ আলম্বিত বেণী, মুখে সংযমের একটি মিশ্র দীপ্তি ও কাঠিন্য, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকার দেহ, গৈরিক বসন, চারিটি চক্ষে নির্বিকার ও নিস্পৃহ শূন্য দৃষ্টি। তাঁদের দিকে একবারটি তাকিয়ে ব্রহ্মচারী দেশালাইটা জ্বালালো, মায়িজি কল্‌কেয় টান দিলেন। হাঁ, টান্ বটে। যখন ধোঁয়া ছাড়লেন, কুটীরের ভিতরটা তখন অন্ধকার হয়ে গেল। সকলের হাতে কল্‌কেটা একবার করে ঘুরে সোনি ও রূপ্‌পির হাতে গিয়ে পৌছলো। তাঁদের অকুণ্ঠ ধূমপান দেখে চমৎকৃত হয়ে গেলাম। এবারে বৃদ্ধের গান গাইবার পালা। একতারাটি বাগিয়ে তিনি ধীরে ধীরে কণ্ঠের আওয়াজ তুললেন। গান তিনি চমৎকার গাইলেন। মুগ্ধ শ্রোতার দল নিঃশব্দে কান পেতে বসে রইল, কেবল ছিলিম্‌টা মাঝে মাঝে এক হাত থেকে অন্য হাতে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু সমস্তটার মধ্যে একটি বিস্ময় নিহিত ছিল। এ যেন একটি অবাস্তব রূপকথা। আমরা নবাগত বিদেশী, বৃদ্ধ গায়কটিও সম্ভবত নতুন পরিচিত, সম্মুখে এই মমতাময়ী আশ্রয়দাত্রী, তাঁর দুইদিকে লক্ষ্মী ও সরস্বতী,—এই তিনটি নারীর ঘর-দুয়ার, জীবন-যাত্রা, আচার-ব্যবহার, কোথা থেকে এঁদের আগমন, এঁরা কে, এবং কী এদের জীবনের চরম লক্ষ্য, এমনিতর নানা চিন্তা-সমস্যায় আমি স্তব্ধ হয়ে রইলাম। অথচ আজ তাঁদের কথা লিখতে বসে একান্ত আন্তরিকতায় স্বীকার করে যাবো যে, সেই জ্যোৎস্নাময়ী সুন্দর রজনীতে, সেই রহস্যময় ক্ষুদ্র কুটীরের স্বল্পালোকিত পরিবেষ্টনীর মধ্যে সন্ন্যাস-জীবনের একটি অপূর্ব সংযম ও শ্রী সকলের মুখগুলিকে নির্মল ও উদাসীন করে রেখেছিল; অত্যন্ত সহজ-সরল সৌজন্য ও উদাসীনতা

নিয়ে আমরা সবাই দু'খানি ব্যাঘ্রচর্মের উপরে নিতান্ত কাছাকাছি বসেছিলাম। সেদিনও পরিচয় নিইনি, আজো আমার অজ্ঞাত—কে সেই দুটি তরুণী, মায়িজিই বা তাদের কে, কোথায় তাদের পথ! এই কুটীর, এর আশ্রয়ও ত তারা পরিত্যাগ করে শীঘ্রই চলে যাবে—কিন্তু কোথায়? জীবন কি তাদের শুধুই শূন্য? শুধুই একান্ত লক্ষ্যহীন? তাদের সমস্ত পরমায়ুব্যাপী পথযাত্রার পরম সার্থকতা কি?

গান থামলে মায়িজিকে প্রণাম করে ভারাক্রান্ত মনে বিদায় নিলাম। হাঁ, স্বীকার করতে লজ্জা নেই, মন আমার কৌতূহলে ভরে উঠেচে! শুধু কি কৌতূহলই? এই চন্দ্রকরোজ্জ্বল নিভৃত রজনীর পদপ্রান্তে দাঁড়িয়ে পরিশ্রান্ত ও পঙ্গু পথিক আমি—আমি কি শপথ করে বল্‌তে পারি, শুধু কি কৌতূহল, বেদনা কি বিন্দুমাত্রও নেই? মূঢ় বিপথগামী সন্ন্যাসী আমি, আমিও যে জানি জীবনের ব্যর্থতার চেহারাটা কেমন! সুখ, ঐশ্বর্য, আনন্দ, সম্ভোগ, রসপিপাসা—জীবনের অনিত্যতা আছে বলেই ত এদের এত প্রয়োজন, এত প্রলোভন! সমস্ত পরমায়ু দিয়ে কঠিন বৈরাগ্য ও ভয়াবহ শূন্যতাকে প্রকাশ করেচ, তোমরা নারী, তোমরা করেচ এই বিশ্বসৃষ্টির অনন্ত স্রোতকে প্রতিহত, অস্বীকার করেচ প্রকৃতির নিয়মকে, আত্মনিগ্রহের মনোবৃত্তি এনেচ সংসারে, রূপ ও সৌন্দর্যকে টুঁটি টিপে হত্যা করেচ!

এক হাতে লাঠি অন্য হাতে ব্রহ্মচারীর কাঁধে ভর দিয়ে পা টেনে টেনে উপরে উঠলাম। ব্রহ্মচারী মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লো, 'আপনার যে কী হ'লো দাদা, আপনাকে না আন্‌লেই হ'তো, অতটা ভাবিনি।'

পরদিন আবার পথ হাঁট্‌চি। ব্রহ্মচারী চল্‌চে, অঘোরবাবু এগিয়ে

যাচ্চেন, তাঁর শাশুড়ী ও স্ত্রী হাঁট্‌চেন। বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়তা একটু ঘনিষ্ঠ হয়েচে, অঘোরবাবু আনন্দ পেয়েচেন, বউটি বড় বোনের মতো ব্যবহার করতে শুরু করেচেন। তাঁর চোখে ও মুখে সস্নেহ হাসি, আলাপে আন্তরিকতা, দুই করতলে সহোদরার সেবা ও যত্ন, তাঁকে কাছে পেয়ে যে-কোনো পথচারী সৌভাগ্য জ্ঞান করবে। ছতোলী ও মঠচটি পার হয়ে মধ্যাহ্নের রৌদ্রে ক্লান্তপদে আমরা সেদিন রামপুর চটিতে এসে পৌছলাম।

কিন্তু হঠাৎ বিপত্তি ঘট্‌লো। অঘোরবাবুর শাশুড়ীর পায়ে উঠেচে মস্ত বড় একটা ফোস্কা, হাঁটতে তাঁর ভারি কষ্ট হচ্চে। সবাই অত্যন্ত বিপন্ন হলেন। এদিকে ঘট্‌লো আর এক কাণ্ড। ব্রহ্মচারী ও অঘোরবাবু নীচে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ যেন গরম হয়ে উঠলেন। তর্ক করতে করতে অঘোরবাবু ব্রহ্মচারীর প্রতি ব্যক্তিগত কটাক্ষ করে বসলেন। ব্রহ্মচারী নাকি অলস ও আরামপ্রিয়, আহারাদির সময় ছাড়া আর তার দেখা পাওয়া যায় না। ব্রহ্মচারীর আত্মসম্মানে বোধ হয় আঘাত লাগলো, ক্ষুব্ধ হয়ে বললে, 'আমি কারো পরোয়া করিনে মশাই, খেতেই না হয় দিচ্চেন, তা বলে অপমান করতে পারেন না।'

অঘোরবাবু বলে বসলেন, 'আপনার মতন লোককে আমার জানা আছে।'

অতএব ব্রহ্মচারী চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'লো। পূর্ণ বিশ্বাস ভগবানে থাকলে দিন তার চলেই যাবে—এই কথা বলে সে বাঁধা-ছাঁদা শুরু করে দিল। আমাকেও চলে যেতে হবে,—প্রথমত এতটুকু করে রোজ পথ হাঁট্‌লে আমার চল্‌বে না, দ্বিতীয়ত ব্রহ্মচারীকে ছেড়ে থাকাও কঠিন। রান্নাবাড়া প্রায় শেষ করেছিলাম, ব্রহ্মচারী আজ খেতে রাজি হ'লো না, নীচের দোকানওলার কাছে আটা নিয়ে জলে গুলে খেয়ে

বললে, 'আমি এখানে অপেক্ষা করি, আপনি সেরে নিন্! না-হয়ত এগোই দাদা, কি বলেন?'

বুঝলাম এখানে একদণ্ড সে আর থাকতে চাইচে না, রাগে সে কাঁপছিল। বললাম, 'যা সুবিধে হয় করো।'

সেই রৌদ্রদগ্ধ রুক্ষ দিনটি আজো আমার চোখে জ্বল্‌জ্বল্ করচে। আহারাদির পর নিরুপায় হয়ে বিদায় নিতে গেলাম। অঘোরবাবু দুঃখিত হয়ে বললেন, 'আপনি কিন্তু সঙ্গে থাকলে আমরা খুশী হতাম, ও যাচ্চে যাক্, অবশ্য আপনার তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার, কি করবো বলুন, এদের জন্যই আমাকে আস্তে আস্তে—'

মা ও মেয়ের কাছে বিদায় নিতে গেলাম। একটু ভিতরে গিয়ে দেখি তাঁরা কোলের কাছে ভাত নিয়ে বসেচেন মাত্র, কিন্তু ছোঁন্‌নি। মেয়ে বললেন, 'আপনি চলে যাচ্চেন, মায়ের চোখ দিয়ে যে জল পড়চে!'

'কেন?'

'কেন!' বলে তিনিও মুখ তুলে তাকালেন, এবং তাঁর চক্ষুর দিকে তাকাবারও আর উপায় ছিল না! বললাম, 'কি করবো বলুন, যেতে আমাকে তাড়াতাড়ি হবেই, আবার কখনো দেখা হয়ত হবে আপনাদের সঙ্গে—'

বউটির চক্ষু আর বোধ করি বাধা মান্‌লো না, জলভারাক্রান্ত হয়ে উঠ্‌লো। রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'একটিমাত্র ছোট ভাই আমার ছিল, সে আপনারই মতন···সে আর নেই! মা, ছেলের সঙ্গে তুমি কথা বলো।'

মা তাকালেন মুখ তুলে। বললাম, 'ঠিকানাটা না-হয় দিন্, দেশে যদি ফিরি কোনোদিন তা হলে—'

'ঠিকানা ত দেবার উপায় নেই, ভাই!'

পুনরায় বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কেন ?'

অস্ফুটস্বরে মা বললেন, 'তা হোক, ঠিকানাটা তুই দে রাধারাণী, যত অযোগ্যই হই, আমরা মা-বোন !'

নাটক সৃষ্টির সময় আমার ছিলো না। 'আচ্ছা, তবে থাক্।' বলে হেঁট হয়ে নমস্কার করবার চেষ্টা করতেই অঘোরবাবুর স্ত্রী হাত ধরে ফেললেন। বললেন, 'বলতে পারচিনে ভাই, মুখ ফুটচে না মেয়েমানুষের অপমানের কথা বল্‌তে! তবুও তোমার কাছে লুকোবো না, বদরীনাথ যাওয়া তা হলে আমার মিথ্যে হবে।'

সবাই আমরা পরস্পরের মুখের দিকে একবার করে তাকালাম। মেয়ে ও মা মাথা হেঁট করলেন, এবং তেমনি নতমস্তকেই অঘোরবাবুর স্ত্রী সজলকণ্ঠে বললেন, 'আমি তোমার বড় বোন, কিন্তু আমার মানসম্ভ্রম নেই, জাতধর্মও নেই। আমি···আমি বেশ্যা !'

কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো। বললাম, 'কি বললেন !'

উত্তর নেই; এবং উত্তর শোনবার আগেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পাথরের ধাপ বেয়ে নেমে কেমন করে চল্‌তে শুরু করেছিলাম তা আজও বেশ মনে করতে পারি। নীতিবিদ্ আমি নই; বেশ্যাকে বেশ্যা জানবামাত্র আমি পালাচ্চিনে, সাহিত্যিকের উপযোগী উদারতায় আমিও কারো চেয়ে কম নই। কিন্তু এত বড় আকস্মিক আঘাত,—আমার সমস্ত জীবনের ধ্যান-ধারণা আর বুদ্ধি-বিচারের উপর কে যেন সহসা সপাং ক'রে এক ঘা চাবুক মারলো! খোঁড়া পা, ভগ্ন দেহ, পিঠে বোঝা, মাথার উপরে সূর্যের অগ্নিবৃষ্টি, প্রস্তর-কঙ্করময় উঁচু-নীচু পথ, গলার ভিতরে মরুভূমি, তবু মাইলের পর মাইল ছুটে চলেচি। কোথায় ব্রহ্মচারী, কোথাও তার চিহ্ন নেই! কেন সেদিন ছুটেছিলাম, কেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল তা আজো আমার

কাছে বিস্ময়। প্রাণপণে পালাবার চেষ্টা করেছিলাম। মনে হয়েছিল, পৃথিবীর আলোবায়ুহীন কারাগারে আমি বন্দী!

ঝোলাঝুলি নামিয়ে এক জায়গায় বসে পড়লাম। কিন্তু বসবার শক্তিও আর ছিল না, দেহ বিস্তার করে শুয়ে পড়লাম। আঃ আর যেন উঠতে না হয়, সকল জ্বালার অবসানে আসুক প্রশান্ত মৃত্যু। ছায়া নেই, মুখের উপর সূর্য জল্‌তে লাগলো; জল নেই, ভিতরটা হা হা করচে! কিন্তু এ কী অশান্তি, এ কী চঞ্চলতা! দুর্বল চিত্ত আজকের ঘটনাকে মেনে নিতে চায় না কেন? এ কি সত্যি—শ্রদ্ধায় ও সম্মানে যার পূজা করেচি, সে-প্রতিমা আমার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্চে? হে সত্যনারায়ণ সূর্য, তুমি ত জানো, তার কোনো মালিন্য নেই! যত্নে স্নেহে দাক্ষিণ্যে ও ব্যবহারে সে ত কোনো সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলার চেয়ে কম নয়, তবু সে পতিতা ব'লে নিজের পরিচয় দিল কেন? তার ত ছলনা নেই, মোহজাল নেই, লালসার কোনো অভদ্র ইঙ্গিত নেই—সে ত সংসারে কারো চেয়ে হীন নয়, অনুপযুক্ত নয়! হে সূর্যদেব, তুমি বলে দাও! তুমি আজ বলে দাও, রাধারাণী কি বেশ্যা?

অপরাহ্ণের রৌদ্র ম্লান হয়ে এল। শুয়ে শুয়ে অসহ্য অস্থিরতায় গড়াগড়ি দিয়ে একবার বমি করলাম। তবু এক সময় ধূলায় বালিতে বমিতে চোখের জলে কিম্ভূতকিমাকার চেহারা নিয়ে উঠে আবার চল্‌তে শুরু করলাম। অগস্ত্যমুনির মন্দির ও সৌরী চটি পার হয়ে গেলাম। একটু একটু করে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, পথে আর কোন সঙ্গীর দেখা মিল্‌চে না। আকাশে চন্দ্র দেখা দেবার কথা, কিন্তু দেখতে দেখতে মেঘ করে এল, জলো হাওয়া বইতে লাগলো। মনে মনে আশা আছে, চন্দ্রাপুরী চটিতে গিয়ে আজ ঠিক পৌঁছতে পারবো। শরীর দুর্বল, বাতাসের সঙ্গে দুল্‌চে।

অন্ধকার ঘনিয়ে এল চারিধারে, ঘুমের ঘোরে যেন পথ চলেচি। পথের রেখা কিছুদুর পর্যন্ত দেখা যাচ্চে, তার পরে সমস্তটা অদৃশ্য হয়ে গেচে। কোথায় ব্রহ্মচারী? আর সাহসে কুলোচ্চে না, উপরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চন্দ্রালোক নিবে গেচে, এত অন্ধকারে কোনদিন পথ হাঁটিনি, বাঁ দিকে নীচে বনবেষ্টিত নদী কুলু কুলু বইচে, দক্ষিণে ও মাথার উপরে পাহাড়ের পর পাহাড় অরণ্যের আঁধারে আবৃত,—গা এবার ছম্ ছম্ করে উঠ্‌লো। নিজের পায়ের শব্দেই এক একবার নির্জনে চকিত হয়ে উঠ্‌চি! লাঠির উপরে জোর দিতে সাহস পাচ্চিনে। ভয়ে কানের ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো। পা কাঁপচে।

এ কি, এ কোথায়? নদীর ভাঙনে পথ যে হারিয়ে গেল! মন্দাকিনী ও চন্দ্রা নদীর সঙ্গম—কিন্তু যাবো কোন্ দিকে? ভয়ার্ত গর্জনে হু হু করে অতল পাথার নদী বয়ে যাচ্চে, দেখতে দেখতে পথের চিহ্ন অদৃশ্য হ'লো। মনে আছে মুখ থেকে একটা শব্দ বেরিয়ে গেল। মুখখানা যেন অন্যের। গা কাঁপচে, দেহের রক্ত ভয়ে ক্ষণে ক্ষণে কোলাহল করে উঠচে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেচে, হাঁটু দুটো নিজের বলে আর মনে হচ্চে না,—নিতান্ত দশ বছরের বালকের মতো নিরুপায় হয়ে এই পথের তীরে দাঁড়িয়ে চোখের জলে আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। এমনি করে শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য ও নদীর গর্ভে অসহায় মরণ মরতে আমার কোনদিন ইচ্ছা ছিল না। বিপদে পড়ে ভগবানকে ডাকার কথাও যেন ভুলে গেলাম, তেমনি ভুললাম জীবনের তুচ্ছতার কথা। সত্যিকারের ভয় যেদিন আসে সেদিন চেয়ে দেখি জীবনকে আমরা কতদিক থেকে গভীর আলিঙ্গনে বেঁধে রেখেচি। হায় রে সন্ন্যাস, হায় রে নিষ্ফল বৈরাগ্য!

'কৌন্ হায়?'

হঠাৎ ভয়ে আঁৎকে থর থর করে কেঁপে উঠলাম। আকস্মিক কণ্ঠস্বরে বুকের ভিতরটা ধক্ ধক্ করতে লাগ্‌লো। একটা ছায়ামূর্তি কখন নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েচে। লাঠিটা জোরে বাগাতে গেলাম, হাতের লাঠি শিথিল হয়ে এল। ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ শুনে মনুষ্যমূর্তি বলে ধারণা হ'লো। কম্পিতকণ্ঠে বললাম, 'তুম্ কোন্ হায় ?'

'ম্যায় জেনানা !'

স্ত্রীলোক! অন্ধকারে তার মুখের কাছাকাছি গিয়ে তাকে লক্ষ্য করলাম। ধীরে ধীরে লাঠির উপরে জোর এল, সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। কে বলে আমি নার্ভাস! যতদূর বোঝা গেল, মেয়েটি পাহাড়ী, বয়স বেশি নয়, গলায় তার কয়েক ছড়া রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুলের চূড়ায় বড় একটা পালক, সম্ভবত পরনে গেরুয়া, দুই হাতে ফুল ও রুদ্রাক্ষের গহনা, ডান হাতে কমণ্ডলু এবং বাঁ-হাতে একটা শিঙার, নগ্ন পদ। চকিত ও চঞ্চল মেয়ে।

'কেয়া দেখতা হায়, সাধুজি ?'

'তুম্ জেনানা হায় ?'

'জি। হিঁয়া কেও খাড়া হুয়া হায় ? কাঁহা যাওগে ?'

'চন্দ্রাপুরী যানা, রাস্তা ছুট্ গিয়া।'

'চ্ছা, পরদেশী! আও মেরি সাথ, বাংলাতে হেঁ।' বলেই ভৈরবীটি এগিয়ে চল্‌লো। কিন্তু তারও পথ ছিল না, দেখলাম এক লীলায়িত ভঙ্গীতে নদীর ভাঙন বেয়ে জলের দিকে সে নাম্‌তে লাগলো। আশ্চর্য, তার যেন বাধা-বিপত্তি নেই ; যেন তার গৃহাঙ্গনের মতোই পরিচিত পথ, এঁকে-বেঁকে হেলে-দুলে হেসে-নেচে সানন্দে সে নাম্‌তে লাগলো। অতি কষ্টে বসে গড়িয়ে অতি সন্তর্পণে তার অনুসরণ করে নাম্‌তে লাগলাম।

অনেকখানি নেমে গিয়ে বাকিটুকু থাকতেই সে হঠাৎ সবসুদ্ধ নদীর চড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়লো,···তার ভিতরে যেন দুরন্ত রক্তধারা, প্রাণবন্যা, নদীর অবলীলা! তার লাগলো তিন মিনিট, আমি নামলাম দশ মিনিটে। নদীতে নেমে সন্তর্পণে দু'জনে হেঁটে জল পার হ'য়ে এপারে এলাম, সে আগে আগে, আমি পিছনে পিছনে। কাছেই আর একটা ঝরণা নেমে এসেচে, তার উপরে আমাকে তুলে দিয়ে সে অদূরে চন্দ্রাপুরীর পথটা দেখিয়ে বিদায় চাইলো। বিদায় ত তাকে দেবোই, কিন্তু এতক্ষণে হঠাৎ যেন চমক ভেঙে গেল। ঝরণার ধারে দাঁড়িয়ে এই অকস্মাৎ আবির্ভূতা কপালকুণ্ডলার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তুমারা ঘর কাঁহা?'

'বহুৎ দুর হিঁয়াসে! চল্‌তেঁ হেঁ,—যাও তুম্‌, আরাম করো।' বলতে বলতেই সে নদীর প্রস্তর-পথে দ্রুতপদে চল্‌তে লাগলো। চারিদিকে ঘনান্ধকার কালিবর্ণ পর্বতরাজি, তারই গভীর গহ্বর থেকে উন্মাদিনী চন্দ্রার প্রবাহ অন্ধবেগে ছুটে আসচে, সেই নদীর উপর দিয়ে রহস্যময়ী মেয়েটি কিছুদূর গিয়ে নিশীথিনীর অঞ্চলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল। কোথায় তার বাসা, কত দূরে কোন্ গহন-গভীরে, কে জানে। নির্বাক স্তম্ভিত দৃষ্টিতে শুধু সেই দিকে তাকিয়ে রইলাম। সেই বিচিত্র ঘটনাটি আজ নিজের কাছেও স্বপ্ন বলে মনে হয়।

চন্দ্রাপুরীতে পৌঁছে গোপালদা ও ব্রহ্মচারীকে আবার পেলাম। দীর্ঘ বিরহের পর মিলন। বাঁচলাম। আমার সব যাক্‌, গোপালদা ও ব্রহ্মচারীকে আর ছাড়তে পারবো না! আহারাদির পর গঞ্জিকার আসরে বসে শেষের এই ঘটনাটা বললাম। কিন্তু তাতে আবার একটি ক্ষুদ্র নাটক সৃষ্টি হ'লো। এ ক'দিন আমি নাস্তিক ও অধার্মিক বলে উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হয়েছিলাম। গল্পটা শুনে হঠাৎ বুড়ীর দল এগিয়ে এসে

আছড়ে পড়ে বলতে লাগলো, 'কে বাবা, মানুষের ছদ্মবেশে কে বাবা তুমি? আমরা পাপী, অধম, তুমিই বাবা দর্শন পেয়েচ সেই মা ভগবতীর! কোন্ দিকে বাবা সে গেল, কোন্ পথে? তুমি জড়িয়ে ধরলে না কেন বাবা, পায়ের ধূলো কেন নিলে না? আহা, তুমি ব্রাহ্মণ, ধার্মিক, তোমার মতন মহাপুরুষ…আমাদের অপরাধ নিয়ো না বাবা, তুমি যে কে আমরা এতদিনে—'

হাসি চেপে চোখ বুজে বসে ছিলাম, এবারে দুই হাত বাড়িয়ে বরাভয় দিয়ে দেবজনোচিত কণ্ঠে বললাম, 'সম্ভবামি যুগে যুগে!'

চারুর-মা চুপি চুপি এসে পায়ের ধূলো মাথায় তুলে নিল।

সমতল পথ ও জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ভীরীচটি পার হয়েচি। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে অলকানন্দাকে বিদায় দিয়ে মন্দাকিনীকে ধরেচি। মন্দাকিনীর ওপারে ভীমসেন ও বলরামের মন্দির পড়ে রইলো। তারপর এল কুণ্ডচটি। এখান থেকে কেদারনাথের বরফ দৃষ্টিগোচর হ'লো। তুষার-কিরীট হিমালয়, সূর্য্যকিরণস্নাত দুগ্ধশুভ্র পর্বতমালা, বর্ণের উজ্জ্বলতায় রোমাঞ্চকর, নয়নাভিরাম রূপ। তারপরেই আবার পথ চড়াই, সেই প্রাণান্তিক পথ-অতিক্রমণ, পিপীলিকার মতো মন্থরগতি। কয়েক পা এগোই, একটু দাঁড়াই, কোনো অর্ধচেতন যাত্রীর মুখে একটু জল দিই, নিজে হয়ত একটু খাই, আবার কিছুদূর এগোই। এমনি করে এসে পৌছলাম গুপ্তকাশীর ধর্মশালায়। ছোট্ট একটি শহর। খান পনেরো কুড়ি ধর্মশালা, কয়েকটি দোকান, বিশ্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দির, দূরে একটি ডাকঘর, সম্মুখে তুষারাচ্ছন্ন পর্বত। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, কোথাও কোথাও অল্প অল্প কুয়াশা, নীচে পর্বতের সানুদেশে চিত্রপটের মতো ক্ষুদ্র এক একখানি পাহাড়ী গাঁও।

কোথাও কোথাও সামান্য আবাদ। ধর্মশালাগুলি বেশ সুসজ্জিত ও কারু-কার্যময়। এতদিনে আমাদের শীতের কাঁপুনি লাগলো। এবার শীতের দরজায় এসেচি, বসন্তকাল ফুরিয়ে গেচে, বরফ সন্নিকট। এখানে গোমুখী ধারা, মণিকর্ণিকা কুণ্ডে স্নান এবং গুপ্তদানের মাহাত্ম্য! পথের উপর থেকে গুপ্তকাশীর রূপটি সুন্দর! দূর ওপারে উখীমঠ শহরটি ছবির মতো দেখা যায়। শীতের সময় এ সকল পথ ও শহর বরফে আচ্ছন্ন থাকে, মানুষ ও জানোয়ার সব নীচের দিকে পালিয়ে যায়।

কেদারনাথে পৌঁছবার জন্য আমরা সবাই ব্যগ্র। পরম্পরায় শোনা যাচ্চে, যাত্রীদের ধৈর্য ও শক্তির অগ্নি-পরীক্ষা সন্নিকট; এখান থেকে সকলের প্রস্তুত হওয়া দরকার। যারা কেদারনাথ দর্শন করতে চায় না, তারা এখনো মন্দাকিনী পার হয়ে উখীমঠ দিয়ে বদরীনারায়ণের দিকে চলে যেতে পারে, এর পরে মাথা খুঁড়লেও আর উপায় নেই। সম্মুখে ভীষণ চড়াই, প্রাণঘাতী বিপদসঙ্কুল পথ, দুর্মূল্য খাদ্যবস্তু, তুষারের ঝটিকা, প্রকৃতির ভয়াবহ রূপ,—অতএব যারা দুর্বল, যারা ভীত, যাদের ধৈর্য কম, প্রাণের মমতায় এখনো যারা সঙ্কোচজড়িত—তারা এইবেলা উখীমঠের দিকে চলে যাক্। কয়েকজনকে চলে যেতেও দেখলাম। আর একটা অসুবিধে, গুপ্তকাশী থেকে প্রায় তিরিশ মাইল পথ কেদারনাথ পর্যন্ত গিয়ে আবার প্রায় সাতাশ মাইল একই পথে ফিরে আসতে হয়, অর্থাৎ উখীমঠ দিয়ে না গেলে বদরীনাথ পাওয়া যায় না। মিছামিছি এই সাতাশ মাইল পথ হাঁটাটা বড় গায়ে লাগে। আজ পর্যন্ত আমরা প্রায় একশো কুড়ি মাইল হেঁটেচি, হাঁটতে আমাদের কষ্ট নেই, কিন্তু চড়াই-উৎরাই পাহাড়ের পথে হাঁটায় সামান্য এক মাইল পথ শতগুণ হয়ে ওঠে। যাই হোক, বেলা থাকতেই আমরা গুপ্তকাশী

থেকে যাত্রা করলাম, কিছুদূর গিয়ে ডাকঘর দেখে মনটা একবার দুলে উঠ্‌লো! কিন্তু কা'কে চিঠি লিখবো? মনের ভিতরে সবাই অতল তলে তলিয়ে গেচে। যাক্—জয় কেদারনাথ-কি জয়! মাইলখানেক এসে নলাশ্রম চটিতে পৌঁছলাম। এখানে চটিওলার কাছে গুরুভার মালপত্র রসিদ নিয়ে জমা রেখে কেদারনাথের দিকে যাবার ব্যবস্থা আছে, ফেরবার মুখে আবার জিনিসপত্র ফেরৎ নিয়ে যাত্রীরা উখীমঠের দিকে যায়। ঝোলাটা রেখে যাবার সুযোগ পেয়ে বাঁচলাম, সমস্ত পথ ঐ ঝোলা আর কম্বল আমাকে শাস্তি দিয়েচে।

রসিদ নিলাম বটে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে চটিওলা যদি ফেরৎ না দেয় ত বাঁচি, আর আমি ওর মুখদর্শন করতে চাইনে। নলাশ্রম থেকে এক মাইল দূরে ভেতাদেবী চটি, এখানে একটি কুণ্ড ও প্রাচীন মন্দির দণ্ডায়মান। তার পরেই আবার পথ চড়াই। চড়াই দেখলেই কান্না পায়, বুকের রক্ত শুকোয়! পুরো দু'মাইল চড়াই পার হয়ে পেলাম বুঙ্গমালা চটি। শোনা গেল এখানে ভগবতীর মন্দিরে অনেক মহাত্মার দেখা পাওয়া যায়। যাক্, মহাত্মায় আর রুচি নেই। এখানে কাঠের বাসন সস্তায় বিক্রি হয়। বুঙ্গমলার পর আবার উৎরাই, চড়াই আর উৎরাই মানে একটি করে পাহাড় পার হওয়া। জনশ্রুতি, সবসুদ্ধ এক লক্ষ পাহাড় অতিক্রম না করলে বদরীনারায়ণ পৌঁছানো যায় না। মাইল দুই পথ এসে পেলাম মৈখণ্ডা। এখানে আছে মহিষমর্দিনী দেবীর মন্দির, এবং নদীর উপরে ঝোলা দড়ির পুল। উত্তর দিকে পথ ঘুরলেই দূরে তুষাররাজ্য চোখে পড়চে। রৌদ্রের সময় অপূর্ব রূপ। উপরে উজ্জ্বল নীল আকাশ, তার নীচে ধবল তুষার-রেখা, আবার তার নীচেই সবুজ অরণ্যময় পর্বতরাজি—পিছনের পটভূমিকায় তিনটি বর্ণের বিস্ময়কর

সমাবেশ। ভিতর থেকে কেমন যেন অননুভূত আনন্দ গুঞ্জন করে ওঠে। আরো এক মাইল এসে ফাটা চটি পাওয়া গেল। এখানে একটি সরকারি ধর্মশালা ও পানচাক্কী আছে। দেখতে দেখতে সন্ধ্যার অন্ধকার আসন্ন হয়ে এল। আজকের মতো এইখানেই বিশ্রাম। কিন্তু আশ্চর্য, ব্রহ্মচারী গেচে এগিয়ে, কাল থেকেই সে আমাদের এড়িয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করচে, কোনো তাৎপর্য বুঝলাম না। এখান থেকে বদলপুর চটি সাড়ে তিন মাইলের কাছাকাছি, রাত্রি সন্নিকট, বদলপুরে সে পৌছতে পারবে কিনা কে জানে। চিন্তিত মনে গোপালদা ও বুড়ীর দলকে নিয়ে চটিতে উঠে এলাম। ব্রহ্মচারীর মনে কোথায় যে ভাঙন ধরেচে কিছুই বুঝলাম না। গোপালদার সঙ্গেও তার অবশ্য বিশেষ বনিবনা হয় না। ভগবানের প্রতি তার পূর্ণ বিশ্বাস গোপালদাকে মুগ্ধ করেনি, কিন্তু আমি যে তাকে অন্তরঙ্গ বলে মেনে নিয়েচি!

পরদিন ভোরে অন্ধকার থাকতেই যাত্রা। শীত পেয়ে পথ হাঁটার সুবিধা হ'লো, সহজে ক্লান্তি আসে না। প্রথমটা ঠাণ্ডায় একটু কষ্ট হয়, তারপরে শরীর ঈষৎ গরম হয়ে উঠলে ভালোই লাগে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে চলেচি। শূন্য মন, ব্রহ্মচারীর অভাব-বোধটা মনে মনে এক একবার পদচারণা করে যাচ্চে, পথে সমবয়সের সঙ্গীকে ছেড়ে দেওয়া বড়ই কষ্টকর। দুঃখ ও আনন্দবোধটা সমবয়সের ক্ষেত্রে একই জায়গায় এসে মেলে, সহজেই আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারি। মনের মধ্যে এ ক'দিন অনেক জায়গায় ভেঙেচে, অনেক জায়গায় জোড়া লেগেচে। খানিকটা গ'লে প্রবাহ ব'য়ে গেচে, খানিকটা জমাট বেঁধে পাথর হয়েচে। আবেগ শুকিয়ে গেচে, ভাবালুতা চাপা পড়েচে, দুঃখ ও আনন্দের চেহারা এখন প্রায় একই রকম। একটু একটু করে সকালের আলো ফুটলো,

আকাশে আকাশে প্রসারিত হ'লো প্রভাতের নিঃশব্দ সমারোহ, পর্বত চূড়াগুলি লোহিত রৌদ্রে ঝলমল করে উঠলো,—আমরা চলেচি মন্থর গতিতে। বদলপুর চটিতে এসে মিনিট কয়েক বিশ্রাম নিলাম। বিশ্রাম নিয়ে আবার অগ্রসর হলাম। পথটা একটু সমতল মনে হচ্চে, পায়ে আর তত লাগচে না। মাথা নীচু করে চলেচি; কিছুই ভাবচিনে, কেবল হাঁটচি, হাঁটা ছাড়া আর আমাদের কোনো কাজ নেই। পথের পাশে কুন্দ ও কুরুবকের ঝাড়,...তা হোক, চল হাঁটি। গৌরীফল, ডালিম ও আখ্‌রোটের বন,—বেশ ত, চল হাঁটি। কোথাও জলপ্রপাত হচ্চে হু হু শব্দে, কোথাও পাহাড়ের গা বেয়ে নাম্‌চে ঝরণা—নামুক, আমাদের হাঁটতে হবে ত! চটি থেকে একটা পাহাড়ী কুকুর সঙ্গে সঙ্গে আস্‌চে, প্রায়ই যেমন আসে, যুধিষ্ঠিরের পাশে ছদ্মবেশী ধর্মের মতো, কত দূর যাবে কে জানে। সেদিন হিসাব করে দেখেছিলাম একটা কুকুর প্রায় বিশ মাইল পথ আহারের লোভে অনুসরণ করে এসেছিল। পথে বহু যাত্রীর সঙ্গেই একটা করে কুকুর দেখা যায়। এ পথ যে মহাপ্রস্থানেরই তা'তে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। চল্‌তে চল্‌তে পাহাড়ের একটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। গোপালদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার মতো হাঁপাচ্ছিলেন, পথশ্রমে চোখের দৃষ্টি তাঁর ঝাপসা হয়ে এসেছিল। সেই বিপুল অবকাশের মধ্যে আত্মস্থ হয়ে দাঁড়ালে উত্তর দিকে দূরদূরান্তর পর্যন্ত দৃষ্টি ছুটে যায়। পথটা অর্ধাচন্দ্রাকৃতি হয়ে ঘুরে গেচে। অনেক দূর গিয়ে পথ দ্বিখণ্ডিত হয়ে একটি পাকদণ্ডী আকারে উপরে উঠেচে, আর একটি গেচে নীচে মন্দাকিনীর দিকে। মনে হ'লো পথের সেই সংযোগ-স্থলে ক্ষুদ্র একটি বিন্দুর মতো ব্রহ্মচারীকে নড়তে দেখা যাচ্চে। পিঠে ঝুলানো সবুজ কম্বল ও আরক্তিম গৈরিক বসন,—ব্রহ্মচারী ছাড়া আর কেউ নয়!

বার দুই চীৎকার করে উঠলাম, হাত তুলে নাড়লাম, কিন্তু নিষ্ফল, তার কানে পৌঁছলো না, তেমনি করেই সে নীচের পথে হাঁটতে লাগলো। ছুটে গিয়ে ধরবার উপায় থাকলে তাকে ধরে ফেলতাম, এমন করে তাকে নিষ্ঠুর হতে দিতাম না। আমি ছাড়া তার চরিত্রের ভিতর থেকে কেউ আনন্দ পায় না, আমি তাকে ভালবেসেচি।

বেলা আন্দাজ ন'টার সময় আমরা ত্রিযুগীনাথের পাকদণ্ডী-পথ স্পর্শ করলাম। পথের আর একটি শাখা নীচে মন্দাকিনীর তটে নেমে গেচে। প্রথমটা বিশেষ বুঝতে পারিনি, কিন্তু শ'দুই গজ আন্দাজ চড়াই উঠে আমি ও গোপালদা পরস্পর মুখের দিকে তাকালাম। পথ যেমন বন্ধুর তেমনি দুরারোহ। দুই পাশে ঘন জঙ্গল, কোথাও কোথাও পত্রপল্লবের ভিতর ঝরণার ঝরঝরানি, গিরগিটির অবিশ্রান্ত ডাক, ছায়াময় নিঃশব্দতা। দেয়াল বেয়ে যেমন টিক্‌টিকি ওঠে, তেমনি করে উঠ্‌চি, খাড়াই পথ প্রায় বুকের কাছে ঠেকচে। থাম্‌চি আর হামাগুড়ি দিচ্চি। এ ত তীর্থযাত্রা নয়, পূর্বজন্মার্জিত পাপের শাস্তি। মানুষের উপরে এ হচ্চে নিয়তির অন্যায় অত্যাচার। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ চটে উঠে বললাম, 'ত্রিযুগীনাথ না এলে কী হতো, কে আসতে বলেছিল?' গোপালদা ছাড়া আর কেউ কাছে ছিল না, জন চারেক স্ত্রীলোক পিছনে পড়ে আছে। তিনি বললেন, হেসেই বললেন, 'মাথা খারাপ হয়েছিল, আর পারিনে।' আবার চল্‌চি। পা টাম্‌তে পারচিনে, কোমরে ব্যথা ধরেচে, বুক কন্‌কন্ করচে, ইচ্ছা হচ্চে এদের সবাইকে খুন করে ফেলি—এই পুণ্যলোভী, এই অন্ধ, এই নির্বোধ যাত্রীদের। আঃ, আগুনের মতো গরম নিশ্বাস, নাক টাকরা গলা সব কাঠ, দাঁতের উপর দাঁত চেপে মুখটা কন্‌কন্ করচে, মাথার চুলের ভিতর ও গায়ে এঁটুলি পোকা কামড়াচ্চে, নোংরা শরীর,

মলিন বসন, লাঠি ধরে ধরে হাতে উঠেচে ফোস্কা,—আর পারিনে, কণ্ঠনালী সাঁ সাঁ করচে, মৃত্যু আর কতদূরে?

পীড়ন যখন মানুষের অনুভূতির সীমানা ছাড়িয়ে যায় তখন তার অবস্থাটা কী? কী তা বলতে পারিনে। সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌চি আকাশে। আকাশ ছোঁবার আর দেরী নেই। ভাবচি এর চেয়েও ত যন্ত্রণার কথা জানি! নখের ভিতরে আল্‌পিন্‌ ঢুকিয়ে দিলে মানুষ কী যন্ত্রণা পায়? আধখানা শরীর মাটির গর্তে, বাকী আধখানায় ডালকুত্তা খোবলাচ্চে, তখন অপরাধী কেমন করে কাঁদে? গায়ের চামড়া টেনে ছিঁড়ে নিলে মানুষ কেমন আওয়াজ করে? রণক্ষেত্রে শেল্‌এর ঘায়ে আহত সৈন্য যখন কাঁটাতারের বেড়ায় ঝুল্‌তে ঝুলতে চেঁচায়, তখন তার কী হয়?—ব্যস্‌, আর যন্ত্রণা হচ্ছে না! চীৎকার করে একবার হেসে উঠলাম। গোপালদা তখন মুখ থুবড়ে বসে পড়েচেন।

চারমাইল বিশাল চড়াই এমনি করে পার হয়ে ত্রিযুগীনারায়ণে এসে পৌছলাম। গাঁয়ের নাম রায়ণা। গঙ্গোত্তরী হয়ে আর একটি পথ এখানে এসে মিলেচে। মন্দিরটিকে কেন্দ্র করেই গ্রাম। শীতের হাওয়ায় জবু-থবু হয়ে গেলাম। ভীষণ মাছির উৎপাত। রান্না করবার আর শারীরিক সঙ্গতি ছিল না। মন্দির দর্শন করতে গিয়ে দেখি ভিতরটা ঝুপ্‌সি অন্ধকার, নাটমন্দিরে একটা বড় পাথরের খাপ্‌রার মধ্যে ধুনি জলচে। জল্‌চে ত্রেতা যুগ থেকে—কোনো মুহূর্ত্তেই নির্বাপিত হয় না। শীতের দিনে আগুনে কাঠ জুগিয়ে পাণ্ডারা নীচে নেমে যায়, গ্রীষ্মকালে এসে মন্দিরের দরজা খুলে দেখে ছাইচাপা আগুন—অন্তত এই কথাই প্রকাশ। কোনো তথ্যেরই সত্যাসত্য নির্ণয় করার রুচিও নেই, উৎসাহও নেই। বোঝা গেল, সমগ্র মহাভারত ও রামায়ণ গ্রন্থ দু'খানি

চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও শিল্পকলা, ধর্ম ও আচার, শাস্ত্র ও দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান এই দু'খানি মহাকাব্যকে কেন্দ্র করে যে গড়ে উঠেচে তাতে আর সন্দেহ নেই। মন্দির দর্শন করে দোকানদারের কাছে পুরি ও তরকারি কিনে চটিতে এসে উঠলাম। বেলা আন্দাজ তিনটে। তা হোক, আজকে আর পাদমেকম ন গচ্ছামি।

পরদিন প্রভাতে শীতে কুণ্ডলী পাকিয়ে ত্রিযুগীনাথ থেকে দ্রুতগতি অবতরণ। উৎরাইয়ে পায়ের ব্যথাটা বাড়তে লাগলো, তা হোক, ক্ষিপ্রগতিতে নেমে চলেচি। সবাই জলস্রোতের মতো পাহাড়ের গা বেয়ে হু হু করে নামচে। উৎরাইয়ে সকলেরই একটু আরাম, কেবল আমারই দুঃখ। আজ দুঃখের কথা বললে গোপালদা আর শুনবেন না। বোঝা গেল লোকটির পথ চলার অভ্যাস আমার চেয়ে অনেক বেশি। আজ ব্যবস্থা হয়েচে, গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে মধ্যাহ্নভোজন করা হবে। পথ হাঁটাই যেন মুখ্য, ভোজন ও শয়নটা গৌণ। মাইল দুই পথ নেমে এসে ছোট্ট একটি মন্দির, তারই ধার দিয়ে পথ নেমেচে মন্দাকিনীর দিকে। সর্পাকৃতি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ পথরেখা, দু'ধারে পাহাড়ী বন। গ্রামের কোনো কোনো ছেলে-মেয়ে পাই-পয়সা ভিক্ষা চাইতে ছুটে এল, বড় বড় মেয়েরা তাদের শিখিয়ে দিচ্চে পিছন থেকে ; ভিক্ষাবৃত্তি এদের পেশা নয়, প্রয়োজন। প্রায় মাইলখানেক পাকদণ্ডী পথে গড়গড়িয়ে নেমে মন্দাকিনীর পুল পেলাম। রুদ্রপ্রয়াগের পর এই প্রথম নদী, পার হয়ে আবার পাহাড়ে উঠতে শুরু করলাম। মাইল-পোস্টে দেখা গেল, এখান থেকে কেদারনাথ আর মাত্র মাইল নয়েক। পাহাড়ে পাহাড়ে উঠতে উঠতে দেখি, পিছন দিক থেকে আর একটি ছোট খরস্রোতা নদী, নাম দুধগঙ্গা, মন্দাকিনীরই শাখা,

—মন্দাকিনীতে এসে মিলেচে। আমরা দুধগঙ্গার ধারে সুউচ্চ পর্বতের গা বেয়ে চললাম। বেলা আন্দাজ দশটা, শীতের হাওয়া; রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ, আমরা পর্বতের গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে পথ হাঁটচি। এবার আমার এগোবার পালা, চড়াইতে পায়ে ব্যথা কম লাগে, এক একজন অগ্রগতিশীল যাত্রীকে দম্ভভরে অতিক্রম করে এগিয়ে এগিয়ে চলেচি। বন-জঙ্গলের বাঁকে-বাঁকে ছায়ায় সবাই তটস্থ হয়ে দল পাকিয়ে হাঁটচে। শোনা গেল এদিকে জানোয়ারের ভয় আছে।

প্রায় দ্বিপ্রহর বেলায় এসে পৌঁছলাম গৌরীকুণ্ডের গ্রামে। গ্রামের কোলের উপর দিয়ে বইছে মন্দাকিনী। ক্ষুদ্র নদী, কিন্তু প্রচণ্ড বেগবতী। জল বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা, সদ্যতুষারবিগলিত, স্নান করবার উপায় নেই। রুদ্রপ্রয়াগ থেকেই স্নান আমাদের বন্ধ হয়েচে। গৌরীকুণ্ডে গৌরীর মন্দিরের পাশেই একটি চটিতে এসে উঠলাম। সমস্তই প্রাচীনের সাক্ষ্য দিচ্চে। কেদারখণ্ডে লিখিত আছে, দেবী পার্বতী মন্দাকিনীতটে ঋতুস্নান করায় স্থানের নাম গৌরীতীর্থ হয়েচে। যে বস্তুটির নাম গৌরীকুণ্ড তার দর্শন মিল্‌লো এতক্ষণে। প্রকাণ্ড একটা উষ্ণ জলাধার। কোন্ অলক্ষ্য পর্বতচূড়া থেকে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ উদ্ভূত হয়ে এখানে নেমে এসেচে। যাত্রীরা সেই গরম জলের ধারে বসে তর্পণ জুড়ে দিল। বাস্তবিক, এই শীতপ্রধান দেশে ফুটন্ত জল থেকে ধূম-নিঃসরণ দেখে মনটা উল্লসিত হয়ে উঠলো। জল এত গরম যে, তার ভিতরে হাত-পা রাখা যায় না। অথচ কোনো কোনো যাত্রী পুণ্যের লোভে বাহাদুরী দেখিয়ে উত্তপ্ত জলের ভিতরে নেমে মিনিটের পর মিনিট দাঁড়িয়ে রইলো। পুণ্যসঞ্চয় তারা করবেই।

এবেলায় আর বিশ্রাম নয়, সকলের শরীরেই উৎসাহ রয়েচে, বেলাবেলি

রামওয়াড়ায় পৌঁছে রাত্রির মতো বিশ্রাম নেওয়া যাবে। আগামী কাল প্রাতে চিরতুষারাচ্ছন্ন, বহু আশা ও আকাঙ্ক্ষার, বহু স্বপ্ন ও তপস্যার কেদারনাথ-মন্দিরে পৌঁছতে হবে। আজ সমস্ত রাত শক্তির সাধনা করবো। বরফ স্পর্শ করতে আর আমাদের দেরি নেই। দোকানে অর্ডার দিয়ে পুরি আনিয়ে খেয়ে রামওয়াড়ার দিকে যাত্রা করবো, এমন সময় একদল বেয়াড়া বেখাপ্পা ভ্রমণকারী কোথা থেকে উড়ে এসে সকলকে ভয়চকিত করে খটাখট্ দুম্‌দাম্ শব্দে হাজির হ'লো। কী দুঃশীল এবং শৃঙ্খলাহীন, কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, যেন যুদ্ধের ঘোড়া কিম্বা শিকারীর দল! অনুকম্পাভরে দরিদ্র ও পীড়িত যাত্রীদের পানে একবার তাকালো, মানুষ বলে আমাদের যেন কেয়ার-ই করে না। সমস্ত মন তাদের দিকে তাকিয়ে বিতৃষ্ণায় ভরে উঠ্‌লো। নদী, পর্বত, তুষার ও অরণ্যের পরিবেষ্টনে তাদের আধুনিক সভ্যতাসুলভ আচার-ব্যবহার ও পোষাক-পরিচ্ছদ খাপ খাচ্ছে না, হ্যাট্‌ কোট্‌ প্যান্ট্‌ ও বুটএর ঔদ্ধত্য, ভ্রমণের বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জাম, সুসজ্জিত ঘোড়া ও সহিস,—সমস্তটা মিলে এই ধবলজটাধারী নিমীলিতচক্ষু মহাতপস্বী হিমাদ্রি দেবতার প্রতি যেন বিদ্রূপ করচে।

এমনি ধারণা নিয়েই চলে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হ'লো। ক্যামেরা দাঁড় করিয়ে তিনি আমার ছবি তুলে বসলেন। আমি নাকি টিপিক্যাল্ তীর্থযাত্রী। লোকটি একটি বাঙালী উৎসাহী যুবক, চোখে চশমা, ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। নাম শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সাহা। লক্ষ্ণৌ 'রেড ক্রশ সোসায়েটি'র ইনি প্রধান সিনেমাটোগ্রাফার। সরকারি স্বাস্থ্যবিভাগের খরচে সদলবলে হিমালয়-ভ্রমণে বেরিয়েচেন। ইনি দলপতি। আলাপ করে যে পরিমাণে আনন্দ

পেলাম ঠিক সেই পরিমাণে ভুলও ভাঙ্‌লো। জনহিতকর কাজে এঁরা শরীর বিপন্ন করে এতদূরে এসেচেন। আপাতত ইনি কেদার ও বদরীনাথ যাত্রাপথের ফিল্‌ম্ তুলচেন। ভারতবর্ষে এই জাতীয় চলচ্চিত্র এই সর্বপ্রথম। এতে হিমালয়ের মনোরম দৃশ্যাদি এবং পৌরাণিক তীর্থমাহাত্ম্য ছাড়াও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বহু আলোচনা ও উপদেশ গ্রথিত থাকবে। যাত্রীদের সুখ-সুবিধা, রোগ-ভোগ, দুঃখ ও পীড়ন, অকাল ও অপঘাত মৃত্যু—কীই বা তার প্রতিকার, ইত্যাদি। এই চলচ্চিত্র কেদার-বদরী যাত্রার প্রারম্ভে হরিদ্বারে প্রতি বছর দেখানো হবে। জনহিত সম্বন্ধে লক্ষ্ণৌ রেড ক্রশের এই বিপুল উৎসাহ ও উদ্যম বাস্তবিক প্রশংসার যোগ্য। ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করে সুখী হলাম। মিষ্টভাষী, সদালাপী ও চরিত্রবান যুবক। তাঁরই উদ্যোগে লক্ষ্ণৌ রেড ক্রশের সৌজন্যে উত্তরকালে আমি কেদার-বদরীর আলোকচিত্রগুলি সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। পরে জান্‌বার সুযোগ হয়েছিল ধীরেন্দ্রনাথই একমাত্র দেশীয় চিত্রসংগ্রাহক যিনি ১৪০০০ ফুট উঁচুতে উঠে চিরতুষারময় নদী অলকানন্দার জন্মস্থলের চিত্র আপন জীবনকে বিপন্ন করেও অবলীলাক্রমে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

গৌরীকুণ্ড ছেড়ে অগ্রসর হলাম। শীত ধরেচে। সমস্ত পথটাই চড়াই। খুঁড়িয়ে হাঁটতেও আর কষ্ট নেই, সব সয়ে গেচে। আকাশ কোথাও কোথাও মেঘময়। একটু আগে অল্প অল্প বৃষ্টি হয়েচে। শীতের বাতাস কন্‌কনিয়ে বইতে শুরু করেচে। মাঝে মাঝে দলে দলে কেদার-প্রত্যাগত শীতার্ত যাত্রীর দেখা মিল্‌চে। পরস্পর দেখা হলেই 'জয় কেদারনাথ' বিনিময় হচ্চে। সকলেই যথাসাধ্য শীতবস্ত্রে আচ্ছাদিত। সবাই একবার করে বলে যাচ্চে, 'সামাল্‌কে চলো ভাই, বহুৎ বরফ, জান্‌

বাঁচায়কে।' যতই এগোই ততই ভয়, একটা আসন্ন বিপদ যেন দূরে আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েচে। নানা শঙ্কা ও দুশ্চিন্তা, কিন্তু গতি আমাদের মন্থর নয়, যথেষ্টই দ্রুত এবং সতর্ক। কোথাও কোথাও পথ অতি সঙ্কীর্ণ, দলে দলে ছাগলের পিঠে খাদ্যবস্তু ও জ্বালানি কাঠের আটি বোঝাই নিয়ে এক একজন পাহাড়ি যাতায়াত করচে, সঙ্গে চলেচে গৃহপালিত এক একটা বড় কুকুর। পথে জানোয়ারের কবল থেকে ছাগগুলিকে রক্ষার জন্য একটি প্রকাণ্ড শিকারী কুকুরই যথেষ্ট।

আমরা চলেচি বনময় পার্বত্য পথ দিয়ে। স্থানটির নাম চীরবাসা ভৈরব। চেষ্টা করলে আজই আমরা কেদারনাথে পৌছতে পারি, কিন্তু সন্ধ্যার প্রাক্কালে কেদারের পথ একেবারেই নিরাপদ নয়, আকাশও ঘন মেঘে এরই মধ্যে প্রায় অন্ধকার হয়ে আসচে, সম্ভবত বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাত কিংবা শিলাবৃষ্টি হতে পারে, অতএব রামওয়াড়াতেই আজ আমাদের রাত্রিবাস। আমাদের পরম প্রিয় ছোড়িদার অম্‌রা সিং এ-সম্বন্ধে যথেষ্ট সদ্বিবেচনার পরিচয় দিতে লাগলো। বেলা আন্দাজ সাড়ে চারটের সময় আমরা রামওয়াড়ার চটিতে এসে উঠলাম, তখন সপ্‌ সপ্‌ করে বৃষ্টি নেমেচে। এত হাওয়া ও শীত যে খোলা জায়গায় এক মিনিটও দাঁড়াবার উপায় নেই। বুকের ভিতরটা শীতে এক একবার গুর গুর করে উঠ্‌চে, গায়ে কাঁটা দিচ্চে, তাড়াতাড়ি পুরু কম্বলখানি আশ্রয় করে বসে পড়লাম। দাঁতে দাঁতে জড়িয়ে যাচ্চে।

বৃষ্টি থামলো বটে কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হ'লো না। চটির দেয়াল ও ছাউনি কাঁপিয়ে বরফের প্রচণ্ড বাতাস থেকে থেকে হু হু শব্দে বয়ে চলেচে। গোপালদা কল্‌কে ধরিয়ে ভয়ে ভয়ে বাইরের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছিলেন। এমন সময় কোথা থেকে ঝড়ের মতো ব্রহ্মচারী এসে

হাজির। হঠাৎ উল্লাসে আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। হাসতে হাসতে সে বললে, 'ঘুরে এলাম কেদারনাথ থেকে। ওরে বাপ রে, কী ভয়ানক ব্যাপার। বরফ, বরফ আর বরফ। খুব সাবধান, যেন ঝড়ের মুখে পড়বেন না দাদা! এদিক থেকে এখন পালাতে পার্‌লে বাঁচি।'

'তুমি আমাদের ছেড়ে গেলে কেন, ব্রহ্মচারী?'

'এই ত সঙ্গেই আছি দাদা, এগিয়েই রইলাম, এরপর বদরীনাথে আবার দেখা হবে। আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে কিনা, ফিরে গিয়ে বৃন্দাবনে যাবো।' বলে সে ধূমপান করতে লাললো। চোখে তার নূতন চাঞ্চল্য, বুকে আশা, কোথায় সে যেন সাহস পেয়ে এসেচে। এ কথা আজ তাকে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হ'লো, কে তার আহার জোগাচ্চে, নূতন বন্ধু তার কে, আমার চেয়েও আজ কে তার আপন,—কিন্তু নিঃশব্দে তার দিকে চেয়ে চুপ করে রইলাম। মাত্র হয়ত দিন পনেরো হ'লো তার সঙ্গে পরিচয়, কিন্তু সময়ের পরিমাণটাই ত বড় নয়, সে জড়িয়ে গেচে আমার নাড়িতে নাড়িতে। পথে-পথে, দুঃখে-সুখে, আপদে-বিপদে আমাদের পরিচয় হয়েছিল নিবিড়, বন্ধুত্বের গোড়ায় পড়েছিল গ্রন্থির পর গ্রন্থি। ধূমপান শেষ করে ঝোলা, কম্বল, লাঠি ও ঘটি নিয়ে দাঁড়িয়ে সে হেসে গোপালদার কাছে বিদায় নিয়ে বললে, 'চলি দাদা, বেলা থাকতে থাকতে গৌরীকুণ্ডে গিয়ে পৌঁছতে হবে। ওঁ নমো নারায়ণায়!'

চোখ আর তার দিকে তুলতে পারলাম না, তাহলে সে হয়ত দেখতে পেতো, প্রিয়জনকে ছেড়ে দেবার সময় কী আমার হয়, আমার চেয়ে দুর্বল ও ক্ষণভঙ্গুর সংসারে আর কেউ নেই। শুধু একটিবার মাত্র বলতে গেলাম, 'কী আমার অপরাধ ব্রহ্মচারী, বলে গেলে না?' কিন্তু মুখের আওয়াজ আমার ফুটলো না।

অথচ সে এমনিই, এমনি করেই সে চিরদিন পরম অবজ্ঞায় ও অবহেলায় সবাইকে ত্যাগ করে এসেচে। কোথাও কারণ আছে, কোথাও নিতান্ত অকারণ। সে ভিক্ষা করে, কাঙালপনা করে, অত্যন্ত বিসদৃশ তোষামোদ করতেও তাকে দেখেচি, তবু তার মধ্যে কোথায় যেন কঠিন ইস্পাতের দৃঢ়তা ছিল। মানব-সমাজের প্রতি তার ছিল একটা ভয়ানক ভ্রূকুটি, নিগূঢ় অভিমান। এই তার চরিত্র, এই তার সন্ন্যাস! সে চলে যাবার পরেও তেমনি করে বসে রইলাম,—বসেই রইলাম। ভিতরে এক-একজন শীতকাতর যাত্রী থেকে থেকে মুখের শব্দ করে উঠ্‌চে, কেউ কেউ আগুন জ্বেলে ঘিরে বসেচে, কেউ বা কম্পিত কণ্ঠে শুরু করেচে মহাভারতের কথা,—আমি নির্বাক হয়ে গৌরীকুণ্ডের পথের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। সম্মুখে শীতজর্জর আঁধার-রাত্রি নাম্‌চে, এখুনি হয়ত মেঘ ও বৃষ্টির ভিতর দিয়ে তুষারপাত হবে, কোথায় সেই নিষ্ঠুর অদৃশ্য হয়ে গেল কে জানে। জীবনে কোনদিন তার দেখা আর পাব না তাও জানি, তবু কাঙালের মতো ছুটচে আমার মন তার পিছনে পিছনে। সে দরিদ্র ও ভিক্ষান্নজীবী বলে আমি বরাবর তাকে আহার ও আশ্রয় দিয়ে এসেচি, এ অহঙ্কার আর আমার নেই। মনে হলো এতদিন আমিই তার আয়ত্তের মধ্যে ছিলাম। আমি তার কাছে পরাজিত, আমি তার অধীন!

রাত্রে চটিওয়ালার কাছে চার আনা দিয়ে একখানি লেপ ভাড়া করতে পেরেছিলাম, সুতরাং প্রভাতকালে আর ঘুম ভাঙলো না। না ভাঙবারই কথা, লেপের গরম। চেয়ে দেখি বুড়ো ইঁদুরের মতো গোপালদা আমার লেপের মধ্যে ঢুকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে নাম ডাকাচ্চেন।

অম্‌রা সিং ও কালীচরণের ধমকের চোটে তাড়াতাড়ি সবাই উঠে পড়লাম। লেপ ছাড়তেই বাইরের ঠাণ্ডাটা যেন চাবুক মারতে লাগলো। তড়িৎগতিতে বাঁধা-ছাঁদা করে যখন হি হি করতে করতে পথে নেমে এলাম তখন বেলা বেশ বেড়ে উঠেচে।

আকাশ ঘন মেঘ ও কুয়াশায় প্রায় অন্ধকার! শোনা গেল বৎসরে কোনো কোনোদিন মাত্র এ-রাজ্যে সূর্যকিরণ দেখা যায়। সম্মুখে শাদা তুষারময় পর্বতের কোলে-কোলে মেঘ ভেসে চলেচে। ঠাণ্ডায় পা ঠিক পড়চে না, মাতালের মতো ছন্দহীন হয়ে চলেচি। দাঁতের উপর দাঁত চেপে জমাট বেঁধে যাচ্চে। ইচ্ছা করচে ছুটোছুটি করি। মুখে চোখে ছুঁচের মতো তুষারের হাওয়া বিঁধচে, লাঠিটা বাগিয়ে ধরতে পারচিনে। পাকদণ্ডী পাহাড়ের পথ, দীর্ঘ লম্বা চড়াই নয়, গোলক-ধাঁধাঁর মতো ঘুরে-ঘুরে উপরে উঠচি। বুকের মধ্যে দম্‌ আছে প্রচুর, কিন্তু পা ক্লান্ত হচ্চে। একটু দাঁড়িয়ে আবার উঠ্‌তে থাকি। আজ আমি আগে আগে। ব্যথা নেই, ক্লান্তি নেই, উৎসাহহীন নই, পিছনের পথ কুয়াশায় অবলুপ্ত, সম্মুখে হিমালয়ের অনন্ত কুহেলিকা, পথের ধারে-ধারে বরফের স্তূপ জমাট বেঁধে রয়েছে, ঝরণাগুলি সাবানের ফেনার মতো গলে পড়চে,—আজ আমি আগে-আগে। আজ আমার শরীরে ফিরে এসেচে পুরাতন শক্তি, বলিষ্ঠতা, দুরন্ত উদ্দীপনা, অপরিমেয় প্রাণলীলা। কোথায় হারিয়ে গেচে পিছনের পৃথিবী, কোথায় বিলীন হয়েচে পশ্চাৎ-জীবনের সমাজ সংসার ও আত্মীয়-বন্ধুর দল,—আজ আমি আর বিশ্রাম নেবো না, তুচ্ছ দেহের অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দেবো না,—আজ বন্যার মতো অপ্রতিহত গতিতে ছুটে যাবো! সমস্ত জীবন থেকে এবার পেয়েচি মুক্তি, সকল বাঁধন গেছে খুলে, লোভ মোহ স্বার্থ লোকালয়ের পথে ফেলে এসেচি,

পাপ পুণ্য দুঃখ ও আনন্দের কোনো প্রশ্ন নেই। এবার নদী ছুটেচে মহাসাগরের দিকে, অন্ধকার ছুটেচে আলোয়, জীবন ও মৃত্যু ছুটেচে মহানির্বাণের পথে, মানুষ ছুটেচে স্বর্গে। বাধা আর মান্‌বো না, চলেচি স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনায়, দেহ থেকে এসেচি দেহান্তরে, আত্মাকে করেচি আবিষ্কার। আজ আমি আগে-আগে, আগে-আগে, ছুটে-ছুটে···

একবার দাঁড়ালাম। ছুটতে-ছুটতে সকলকে পিছনে ফেলে এসেচি। চারিদিকে অকূল কুয়াশার মধ্যে সঙ্গীরা কে কোথায় হারিয়ে গেচে, কেবল দেখা যাচ্চে দুইদিকের সামান্য পথরেখা। কোথাও বৃক্ষলতা নেই, বন-অরণ্য নেই, জীব-জানোয়ারের চিহ্নমাত্র নেই, শুধু তুষারময় পর্বতমালা, অসংখ্য ঝরণা চীৎকার করতে করতে পথের ধারে নেমে আসচে। বামে দক্ষিণে সম্মুখে পিছনে মেঘের ঘনঘটা, বিলুপ্ত আকাশ, নিশ্চিহ্ন পৃথিবী। এবার চল্‌চি হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে, গর্জনমত্ত বায়ুবেগে, আর নিজেকে ধরে রাখতে পারচিনে। ক্রমে ক্রমে আলো প্রখর হয়ে উঠ্‌লো। সে-আলো আকাশের নয়, রৌদ্রের দীপ্তির নয়, বিদ্যুৎ-বহ্নির নয়,—সে এক নতুন অলৌকিক আলো—তুষার-শুভ্রতার তীব্র তীক্ষ্ণ আলো। আলোর স্রোত, আলোর সমুদ্র, আলোক-ধাঁধাঁ। চোখের দৃষ্টি উগ্র যন্ত্রণায় বুজে এল, চোখ জুড়ে বন্ধ হয়ে গেল। চোখে হাত চাপা দিয়ে অন্ধের মতো সঙ্কীর্ণ পথরেখার উপরে পা বুলিয়ে-বুলিয়ে হাঁটচি। সে কী ভয়ানক সর্বনাশা আলোকের উগ্রতা, তীরের মতো চোখে এসে লাগে, যাত্রীরা পথভ্রষ্ট হয়ে হোঁচট খেয়ে ছিট্‌কে পড়ে যায়। দেখতে-দেখতে আবার নূতন উপসর্গ দেখা দিল। উঠ্‌লো ঝড়, ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে শিউলি ফুলের মতো তুষার বৃষ্টি, তার সঙ্গে দানা-দানা জল। কী কঠিন ঠাণ্ডা! আঃ, আর বুঝি আত্মরক্ষা হ'লো না, আর কতদূর আছে কে

জানে,—মন্দির আর কতদূরে? মাথার উপরে পড়েচে বরফ, কাঁধে পড়েচে বরফ, কম্বলটা বরফে শাদা হয়ে গেল, চোখে চাপা দিয়েও চোখ খুলতে পারচিনে, পাগলের মতো ছোটবার চেষ্টা করলাম।

'আঁক্'!

পড়লাম পা পিছলে বরফের উপরে, পথ তুষারে ডুবে গেছে। একি, সত্যিই কি আমার শরীরে আর শক্তি নেই? শরীর পাথরের মতো অসাড় হয়ে আসচে কেন? এ কোথায় ছিট্‌কে পড়েচি? হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কম্বলটা খুঁজে পেলাম। আহা বেচারি, কী দুঃখই সইলো আমার জন্য! কত নীচে পড়েচি বোঝা গেল না, অনেক চেষ্টা করে চোখের পল্লব একটু খুলে দেখি, পাশেই একটা ছোট্ট জলাশয় ঠাণ্ডায় জমে আয়নার কাঁচের মতো কঠিন হয়ে গেচে। গা-ঝাড়া দিয়ে আবার উঠলাম, মিছরির ঢিবির মতো বরফের স্তূপে পা পুঁতে গেচে। লাঠিটা আছে খাড়া দাঁড়িয়ে বরফের মধ্যে। যাক্, এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। কোমর পর্যন্ত ঠাণ্ডা উঠে পক্ষাঘাত হয়েচে, ঊর্ধ্ব দেহটা কেবল বাকি। নিজেকে টান্‌তে টান্‌তে এগোচ্চি, চোখ খুল্‌তে পারলে দেখতাম আর কতদূরে! চোখে মুখে পড়েচে তুষার ও জলের বিন্দু, মাথার চুল ভারী হয়ে উঠেচে, পরণের গৈরিক-সজ্জা মোলায়েম তুষারে আচ্ছন্ন হ'লো। মিট্‌মিট্‌ করে একবার তাকাবার চেষ্টা করলাম। সম্মুখে তুষারের পুষ্পবৃষ্টি রূপার ঝালরের মতো ঝলমল করচে, মাথার উপরে তুষারের চন্দ্রাতপ। কী অনির্বচনীয় রূপগৌরব! এ যেন কোন্ বিরাটের পদতল ছোঁবার জন্য উঠ্‌চি, যেন এক বিপুল বিশ্বের তোরণ-দ্বারে করাঘাত করবার জন্য পাগলের মতো, অন্ধের মতো হাত্‌ড়ে চল্‌চি—যেন স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের আজ আলিঙ্গন হবে।

শঙ্খধ্বনি শুন্‌চি। কাঁসর-ঘণ্টার বুঝি আওয়াজ আসচে! কোন্‌ দিকে? উত্তরে, না দক্ষিণে? আবার কান পেতে শুনলাম। কিন্তু আর যে চল্‌তে পারচিনে, একটিবার শুয়ে পড়ে বিশ্রাম নেবো? কিন্তু শুলেই যে থাম্‌তে হবে, অন্তিম মুহূর্তের থামা। প্রাণের মধ্যে ধীরে-ধীরে তলিয়ে যাচ্চি, সব ডুব দিচ্চে,—রূপ, আলো, শব্দ, চেতনা, নিশ্বাস,—সব। হাত-পাগুলো আর কথা শুন্‌তে চাইচে না! একবার চীৎকার করে কাঁদতে পারিনে? একবার পারিনে ঝড়ের মতো হেসে উঠ্‌তে?

'মহারাজ-জি, কেঁও খাড়া হুয়া হায়?'—হাতের উপরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে সজাগ হয়ে উঠলাম। হাতটা ধরে হিড়-হিড় করে কয়েক পা টেনে নিয়ে গিয়ে লোকটি বললে, 'এ্যায়সা হোতা হায় ঠণ্ডেমে, জল্‌দি-জল্‌দি আনা—

'কোন্‌ হায় তুম, ছাড়ো ছাড়ো—'

'আও জী, আঁখ্‌ খুলো, ম্যায় অম্‌রা সিং হায়। আও, পুল্‌ আ গৈ।'—অম্‌রা সিং আমাকে টেনে নিয়ে চললো।

শরীরের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে চোখের পাতা মেলে একবার তাকালাম। তখন মন্দাকিনী-দুধগঙ্গার পুলের কাছাকাছি এসে গেচি। কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ অদূরে আবার শোনা গেল। দু'চারজন যাত্রী দূরে ছায়ার মতো নড়ে চড়ে বেড়াচ্চে। পুল পার হয়েই সামান্য লোকালয় ও কয়েকটা পাথরের ঘর, দু'একটি দোকান, পথগুলি পাথর-বাঁধানো। ঘর-দুয়ার, দোকান-পাট, পথ-ঘাট সমস্ত কঠিন বরফের স্তূপে ঢাকা। তার উপর দিয়েই আনাগোনা চল্‌চে। খবর নিয়ে জান্‌লাম গোপালদার দল এখনো অনেক পিছনে।

পথ ঘুরেই সম্মুখে তুষারময় হিমালয়ের পটভূমিকায় কেদারনাথের মন্দির দেখা গেল। সম্মুখে প্রস্তরময় বেদিকার উপরে পথের দিকে পিছন ফিরে

বিরাট পাথরের ষাঁড় উপবিষ্ট। চোখে বরফের আলো এতক্ষণে একটু সয়ে গেচে, এবারে আর তেমন কষ্ট হচ্চে না। এবারে হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি আঙুলের ডগাগুলো ঠাণ্ডায় ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরচে, পায়ের চামড়া ফেটে গেচে। তা যাক্, বাইরে পাদুকা ত্যাগ করে এই পরম রূপবান মন্দিরের ঘনান্ধকার অন্দরে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করলাম। ভিতরে তখন জনকয়েক অর্ধ উন্মত্ত স্ত্রীপুরুষ যাত্রী কেদারনাথের বিপুল দেহের উপর ওলোটপালট খাচ্চে। কেদারনাথ মূর্তিমান নন্, কর্কশ অসমতল বড় একখানা পাথরের খণ্ড,—তা হোক, তাকেই আলিঙ্গন করে কেউ হাসচে, কেউ কাঁদচে, কেউ চীৎকার করচে, কেউ ধরেচে গান, কেউ করচে আর্তনাদ ও করুণ মিনতি, কেউ বা শীতবিদীর্ণ রক্তাক্ত মুখে তাকে পাগলের মতো চুম্বন করচে! আবেগ উত্তেজনা, উল্লাস, আর্তস্বর, পূজাপাঠ, স্তব-মন্ত্র, স্নেহ-ভালোবাসা, ভক্তি ও আনন্দ,—কিন্তু স্থাণু ও বধির প্রস্তর-স্তূপ অচঞ্চল নীরবতায় তেমনি করেই পড়ে রইলো। ভিতরটায় কালিবর্ণ অন্ধকার ও কঠিন অসহ্য প্রাণান্তিক ঠাণ্ডা, পা পেতে দাঁড়াবার উপায় নেই; সম্মুখে এই পথশ্রান্ত পাগলের দল আত্মহারা হয়ে কোলাহল করচে! কী যেন ভেবে অন্ধকারে একবার নিঃশব্দে দাঁড়ালাম।

কিন্তু ভিতরের হিমগর্ভ অন্ধকারের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই, ঠাণ্ডায় মুহূর্তে-মুহূর্তে সর্বশরীর অসাড় হয়ে আসে, গায়ের রক্ত জমাট বেঁধে যায়, গলার ভিতর থেকে এক রকম ভগ্ন, আর্ত আওয়াজ বিদীর্ণ হয়ে ছোটে। এদিকে ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত যাত্রীদের প্রলাপ,—কারো মুখের কস্ বেয়ে গড়াচ্চে রক্ত, কারো ফেনা, হাতে-পায়ে হিমক্ষত, রক্তের দাগ, সর্বাঙ্গে তুষারের চূর্ণ, কারো-কারো কণ্ঠস্বর বসে গেচে,—কিন্তু কেন? দুর্গমের এই বীভৎস পীড়নের ভিতর দিয়ে কোন্ দুর্লভকে তারা বরণ

করতে এসেছিল? মন্দিরের অন্দরে প্রেতের মতো একাকী কিয়ৎক্ষণ টহল্ দিয়ে বেড়ালাম। ভিতরটা চির-অন্ধকার, ভয়ের বাসা, রহস্যের পাথার, সূচ্যগ্র পরিমাণ আলোক প্রবেশের পথ কোথাও নেই। কী বল্‌বো, কী প্রার্থনা জানাবো? এই নির্বোধ প্রস্তর-স্তূপের সুমুখে দাঁড়িয়ে কাঙালপনা প্রকাশ করবো—সে যে ভয়ানক ছেলেমানুষী! অথচ একজন পথশ্রান্ত সামান্য তীর্থযাত্রী, সেইটুকুই ত আমার শেষ পরিচয় নয়; আমি-যে ক্ষুদ্র, আমি যে নগণ্য—এই কথাই বা অনুভব করি কোন্ সঙ্কীর্ণতায়? আবেগ দিয়ে, আনন্দ দিয়ে, বিশ্বাস ও প্রেম দিয়ে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা এই যে মাটি আর পাথর, এর পাশে এসে দাঁড়িয়ে নিজেকে যদি ছোট করে ভাবতে না পারি, সে কি নিতান্তই অহমিকা? দেবতার কাছে এসে দাঁড়ালেই যে আমি আপন দেবত্বকে অনুভব করি!

অন্ধকারের ভিতর থেকে পা বুলিয়ে-বুলিয়ে দরজা দিয়ে বা'র হয়ে এলাম। হাত, পা, মুখ ঠাণ্ডায় বেঁকে যাচ্ছে, নেমে এসে কোনোক্রমে জুতো জোড়া পায়ে ঢুকিয়ে ছুট্‌তে-ছুট্‌তে চললাম। হাতে লাঠি, তাকে চালনা করার আর শক্তি নেই, পায়ের তলায় বরফের চাপড়াগুলিতে মচ মচ করে শব্দ হচ্ছে, অন্ধকার থেকে তুষারের আলোয় নেমে আবার চোখ বুজে আসচে—মুখে এক রকম শব্দ করতে-করতে এসে ধর্মশালায় উঠলাম।

ছোট্ট পাথরের ঘরখানি বরফের গর্ভে সমাধিস্থ হয়ে রয়েচে। ভিতরে আমরা কয়েকজন যাত্রী। গোপালদা ও বুড়ীরা কম্বল জড়িয়ে কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে বসে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপচে, কারো মুখে আর কথা নেই, চোখে ও মুখে সকলেরই প্রাণভয়ের চিহ্ন। বাইরে মেঘলা আকাশ, প্রতিনিয়ত নিঃশব্দে তুষার ঝরে পড়চে,—যতদূর পর্যন্ত কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখা যায়, পাথরের ঘরগুলির মাথায়, জান্‌লায়, দরজায়, পথে-ঘাটে

দোকানগুলির চালায় স্তূপাকার বরফের কঠিন আবরণ। কোনো-কোনো স্থানীয় লোক লোহার অস্ত্র নিয়ে বরফ কেটে আপন চলাচলের পথ সুগম করচে। প্রত্যেক দিন দুবার-চারবার করে তাদের অস্ত্র ধরতে হয়। সবাই যদি এদেশে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে তবে একদিন বরফে তাদের গ্রাস করবে। ঠাণ্ডায় শরীরে শক্তি জমে, গরমে শক্তি গলে।

এমন সময় অম্‌রা সিং কতকগুলি কম্বল আর কাঠ এনে হাজির করলো। পাণ্ডারা এদেশে বিনামূল্যে কম্বল ধার দিয়ে যাত্রীদের সাহায্য করেন, কাঠও তাঁরা কিছু এমনিই আনিয়ে দেন্। কম্বল এল বটে কিন্তু সহজে সেগুলি স্পর্শ করা গেল না, তারাও বরফ হয়ে গেচে, ছুঁলেই হাত কন্‌কন্ করে ওঠে, গায়ে চাপালে শীতে হাড়ে-হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগে। অম্‌রা সিং একটা লোহার খাপ্‌রায় কাঠের আগুন জ্বাল্‌লো। আগুন দেখে আমাদের কী আনন্দ! ও যেন মৃতসঞ্জীবনী, ও যেন আমাদের সকলের লুপ্ত পরমায়ু! কাঠ এত ঠাণ্ডা যে ভালো করে জ্বল্‌তে চায় না, তবু সেইটুকু আগুনের চারিদিকে যাত্রীরা গিয়ে ঘিরে বসলো। কেউ তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেয়, কেউ দেয় পা। হাত-পা পুড়ে যাক্, ছ্যাঁকা লাগুক্, গ্রাহ্য নেই,—আগুন নিয়ে কাড়াকাড়ি, ঝটাপটি, আগুন নিয়ে মনোমালিন্য। একজনের শরীর একটু বেশি গরম হয়ে উঠলে আর একজন ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। বামুন-বুড়ীর সম্বন্ধে এমনো সন্দেহ হ'লো, সে হয়ত বা এইবার কাঠের আঙ্‌রাগুলি সকলের কাছে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের গায়ের উপরেই ছড়িয়ে দেবে! ইতিমধ্যে যাত্রীদের ভিতরে বামুন-বুড়ীর পর-পীড়ন ও আত্মপরতা সর্বজন-বিদিত হয়ে উঠেচে। কোমরভাঙা চারুর-মা এতক্ষণ ঠাণ্ডার জ্বালায় কম্বলরাশির তলায় আত্মগোপন করে ছিল, এইবার হঠাৎ একখানা কম্বল

হাতে নিয়ে উঠে পাগলের মতো আগুনের দিকে এগিয়ে গেল, দিল কম্বলখানা আঙ্‌রাগুলির মধ্যে ঢুকিয়ে। একটি রোঁয়াও তার পুড়লো না, বামুন-বুড়ী হাঁ-হাঁ করে উঠতেই সে আবার সেখানা তুলে নিয়ে উঁচুতে ধরে কিয়ৎক্ষণ তাতালো, তারপর আবার এলো এগিয়ে। কাঠের মতো কঠিন ও নিশ্চল হয়ে এতক্ষণ একপাশে বসেছিলাম, চারুর-মা হঠাৎ সেই গরম কম্বলখানা খুলে আমার গায়ে জড়িয়ে দিল। বললে, 'সব আগুনটুকু ওরা চেটে খাচ্চে, তুমিও যে একটা মানুষ তা আর ওদের···কম্বলখানা একটু গরম হয়নি, না বা'ঠাউর?' বলেই সে আবার সেই কম্বলরাশির তলায় গিয়ে ঢুকলো।

কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা হয়ত ছিল কিন্তু শক্তি ছিল না। শুধু কেবল শীত-কাতর মুখখানা ফিরিয়ে এই স্নেহময়ী বৃদ্ধার দিকে তাকালাম। এই মেরুদণ্ডভাঙা চারুর-মা কঙ্কাল-দেহখানিকে নিয়ে বরাবর হেঁটে চলেচে, অথচ আশ্চর্য, মুখে তার নিরন্তর হাসি ও রসালাপ। এই বুড়ীকে সবাই করে তাচ্ছিল্য ও অনাদর, সামান্য কারণে ধম্‌কায় ও শাসন করে, কথায়-কথায় সরস মন্তব্য করে বলে' অনেকের কাছেই সে পাগল, পয়সা-কড়ি খরচ করে' হিসাব রাখে না বলে' বামুন-মার কাছে সে লক্ষীছাড়ি, অথচ চটিতে-চটিতে দেখি অনেকের উচ্ছিষ্ট বাসন সে মেজে দেয়, কারো ধরিয়ে দেয় উনুন, মাঝে-মাঝে দেয় মশলা পিষে, অপ্রার্থিত সেবায় সে সকলকে সুস্থ রাখবার চেষ্টা করে। এগুলি নিতান্তই সামান্য পরিশ্রম, কিন্তু পথশ্রান্ত অনড় যাত্রীদের পক্ষে এগুলি মহৎ উপকার হয়ে দেখা দেয়।

ঘরখানির চারিদিক বন্ধ, পাথরের মজবুদ ঘর, কোথাও একটি ছিদ্র নেই, বাইরের বাতাসকে সবাই বাঘের মতো ভয় করে—সেই বায়ুলেশহীন ঘরের ভিতর আগুন জ্বালিয়ে সবাই বসে রইলাম। ধোঁয়ায় ও আগুনের

আভায় ভিতরটা যখন একটু গরম হ'লো, তখন ফুটলো কারো-কারো মুখে কথা। বেলা তখন অনেক, হয়ত বারোটা হবে। একরাত্রি কেদারনাথে বাস করে' যাওয়া রীতি। অম্‌রা সিংয়ের সাহায্যে সেদিন পুরি ও আলুর তরকারির ব্যবস্থা করা গেল। আকাশের দুর্যোগ কমলো না, সূর্য নাকি এদেশে নেই, মেঘ ও কুয়াশায় চিরদিন এদেশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। কখনো তুষারের বদলে পড়ে বৃষ্টি, কখনো বৃষ্টির বদলে তুষার, সেই তুষার দেখতে দেখতে জমাট বরফে পরিণত হয়। বর্ষাকালের শেষ পর্যন্ত কেদারনাথে মানুষের সমাগম থাকে, শরৎকাল পড়লেই সবাই নীচে নেমে যায়—পশু, পক্ষী ও মানুষের চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যায় না। ঘরবাড়িগুলি বরফের তলায় কয়েক মাসের জন্য অদৃশ্য হয়ে থাকে। এই বাড়িগুলি ও পথঘাট নাকি বহু শতাব্দী পূর্বে নির্মিত, কিন্তু আজো যেমনি আন্‌কোরা, তেমনি পরিচ্ছন্ন, কোথাও বিনাশের চিহ্ন নেই। খুব সম্ভব এই ঋতুর আবহাওয়ায় থেকে তাদের পরমায়ু এত দীর্ঘ হয়ে উঠেচে।

সমস্ত দিন আগুন জ্বালিয়ে কম্বল জড়িয়ে ঘরের ভিতর অকর্মণ্য হয়ে বসে রইলাম। কখন্ বিকাল গড়ালো সন্ধ্যার দিকে, কখন সন্ধ্যা রাত্রিতে পরিণত হ'লো, কিছুই বোঝা গেল না। চোখে ঘুম জড়িয়ে এল বটে কিন্তু ঠাণ্ডায় নিশ্চল হয়ে রইলাম, হাত-পা ছড়াবার শক্তি লুপ্ত হয়ে গেচে। শীতের অসহ্য ক্লেশ ও পীড়নের ভিতর দিয়ে সেই ভয়-ভীষণ রাত্রি অতিবাহিত করা গেল।

*   *

*

তার পর আর বল্‌বো না। সেদিন প্রভাতে সেই আকাশের অবারিত দুর্যোগ, তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি, মেঘান্ধকার—তাদের ভিতর

দিয়ে কেমন করে পালিয়েছিলাম, কেমন করে উৎরাই পথে রামওয়াড়া পার হয়ে সোজা গৌরীকুণ্ডে এসে পুনরায় থামলাম, তার কথা বলে' আর কাজ নেই। আগেকার পথ ধরেই আমাদের প্রত্যাগমন। দুদিনের পথ পার হয়ে একদা মধ্যাহ্নে আমরা সেই নলাশ্রম চটিতে এসে উঠলাম। এখানেই আমরা কিছু-কিছু পোঁটলা-পুঁটলি ফেলে গিয়েছিলাম। এবারে আর শীত নেই, আকাশ নীলকান্তমণির মতো ঝলমল করে উঠেচে, সুন্দর আরামদায়ক রৌদ্র, আবার দেখা দিল অরণ্যে সুস্নিগ্ধ শ্যামলতা—বসন্তকালকে বরণ করে নিলাম। এবারে পথ আবার নতুন। দক্ষিণের পথ গুপ্তকাশীর, সম্মুখের পথ গভীর নীচের দিকে মন্দাকিনীর তটে নেমে গেচে। আবার সেই প্রচণ্ড মাছির উৎপাত শুরু হ'লো, সেই আপাদমস্তক পোকা, গায়ের চুল্‌কানি, পায়ের হাঁটুতে সেই ব্যথা! নলাশ্রম চটিতে আহারাদি শেষ করে সেই পুরাতন ঝোলাঝুলি ঘাড়ে নিয়ে এই উৎরাই পথটি ধরে পুনরায় যাত্রা করলাম। শোনা গেল মন্দাকিনী পার হয়ে এখান থেকে উখীমঠ মাত্র তিন মাইল। আজ আমাদের উখীমঠ পৌঁছতেই হবে। কেদারনাথ শেষ করা হয়েচে, এবার একটু নতুন উৎসাহ, এবার সোজা বদরিকাশ্রম, আর অন্য কথা নয়, এক লক্ষ্য!

কিন্তু হায় রে তিন মাইল! গড়গড়িয়ে যাত্রীর দল নামচে ত নামচেই, তিন মাইল আর শেষ হয় না। যাত্রীদের উৎসাহকে সজীব করে রাখার জন্য কোন্ মিথ্যাবাদী প্রচার করেচে যে, এই দীর্ঘ পথটা মাত্র তিন মাইল? পাকদণ্ডীর পথ ঘুরে-ঘুরে যখন মন্দাকিনীর পুলের কাছে নেমে এল তখন আমরা যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে উঠেচি। পুল পার হয়েই পথের চেহারা সম্পূর্ণ বদ্‌লে গেল। একেবারে খাড়াই পর্বত, বুক-বুক চড়াই, এবং সে-চড়াই যে কী ভীষণ তা অনুমান করাও কঠিন। এক হাতে

লাঠি, অন্য হাতে পথের উপর রীতিমতো ভর দিয়ে চল্‌চি। সে ত' চলা নয়, হামাগুড়ি দেওয়া। এমন ভীষণ চড়াই গত দিন দুই আমরা অতিক্রম করিনি। নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিচ্চি, মাঝে মাঝে কোনো-কোনো আর্ত যাত্রী মুখে একরকম শব্দ করে উঠচে,—ফাঁসির দড়িতে টান্ পড়বার মুহূর্তে অপরাধীর মুখের ভিতর থেকে কী রকম আওয়াজ বেরিয়ে আসে? চলতে-চলতে দেখি, পথের ধারে সেই খিদিরপুরের নির্মলা কাঁদতে বসেচে। একেই ত সে পরিশ্রমের ভয়ে রান্না করে' খায় না, তার উপর এই চড়াই,—আহা বেচারা!—বেচারা? বেশ হয়েচে হতভাগীর, খুব হয়েচে! এসেছিলি কেন মরতে? মর্ তুই, মরে যা, চুলোয় যা!

আবার এক-পা এক-পা করে চলেচি। কমণ্ডলুর জল ফুরিয়ে গেচে, গলাটা কাঠ হয়ে এসেচে, চোখ দুটো জ্বালা করচে—তা করুক, চল এগোই! গোপালদা কই? সেই জংলী ভালুকের মতো কুৎসিত লোকটা? লোকটার চেহারা যেন আধপোড়া রোঁয়া-ওঠা একখানা কম্বল! পাপ, এরা সবাই পাপ! দুইদিকে আমার পাপের শোভাযাত্রা, কলুষ-কালিমার প্রদর্শনী, অসুন্দর ও অশ্লীলতার মেলা! এরা কেউ আনন্দ দেয় না, দুঃখ দেয়, এদের চেহারায় সমস্ত জীবনের পাপের ছাপ, দুষ্কৃতির দাগ, লিপ্সা লোভ ও বাসনার শ্মশান,—সংসার এদের ঘৃণা করে তাড়িয়ে দিয়েচে, তাই এরা সেই পাপের ভার নামিয়ে চলেচে তীর্থে-তীর্থে। এদের উপর দেবতার দয়া ও করুণা হবে? দয়া ও করুণা কি এতই সুলভ? সেদিন কোথায় ছিলে তোমরা দুর্ভাগ্য—যেদিন তোমাদের পরমায়ুতে ছিল বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, মনের ঐশ্বর্য; যেদিন ছিল তোমাদের যৌবন? কী করেছিলে যৌবনে?

একটু দাঁড়াই, তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যেতে চায়, তা যাক— আবার শামুকের মতো এগোই। ওপারে দূর পর্বতের চূড়ায় গুপ্তকাশীর ক্ষুদ্র শহরটি দেখা যাচ্চে! কতদিন কতকাল আগে যেন ওই শহরটিকে পিছনে ফেলে এসেচি, অতীত জীবনের পৃষ্ঠায় ওটি যেন সামান্য একটুখানি স্মৃতির মতো জড়িয়ে রইলো। প্রতিদিন আমরা ভুলে যাই পূর্ব দিনটিকে, প্রতি প্রভাতে আমাদের হয় নবজন্ম। আমরা যেন চিরদিবসের তীর্থযাত্রী, চির-তীর্থপথিক, জন্মজন্মান্তর পার হয়ে চলেচি চির-সুন্দরের পদপ্রান্তে; যেমন চলেছিলেন একদিন শ্রীমতী শতবর্ষ বিরহ পার হয়ে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে আত্মাঞ্জলি দিতে। প্রেমের তপস্যাই এই, বেদনার মধ্যে তার রূপ, অন্তরে তার দুঃখলোক। যে চিরদুর্লভ, যার জন্য এই দুর্গম পথযাত্রা, এই পীড়ন, যার জন্য এই যন্ত্রণাজর্জর পথের প্রাণান্তকর তপস্যা, সেই রূপাতীত রূপকে আমরা চাই, সে আমার আশার পরিতৃপ্তি, সকল পাওয়ার শেষ পাওয়া! আজকের এই যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ জীবনের রহস্যময় গতিতত্ত্বটি যেন চক্ষের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। নারীর গতি মিলনের পথে, পুরুষের গতি বিরহলোকে। নারী চলেচে পরম পুরুষের পায়ে আত্মদান করতে, পুরুষ চলেচে পরম জ্যোতির্ময়ীকে আবিষ্কার করতে। মিলনের আনন্দে নারী অতিক্রম করে নিজেকে, আবিষ্কারের আনন্দে পুরুষ অতিক্রম করে জীবনকে। নারী সৃজন করেচে প্রেমের সুকোমল মর্তলোক, পুরুষ সৃষ্টি করেচে বিরহের সুদূর স্বর্গলোক! নারীর তপস্যা আনন্দময় বন্ধন, পুরুষের দুঃখময় মুক্তি।

থাক্ আপাতত স্ত্রী-পুরুষের গতিতত্ত্ব! বুকের রক্ত শুকিয়ে দুস্তর পথ পার হয়ে যখন উখীমঠের ধর্মশালায় এসে পৌছলাম, দিন তখন শেষ হতে

আর দেরি নেই। খুব ছোট শহর নয়। কতকগুলি বিশৃঙ্খল নাগরিক সাজ-সরঞ্জাম এখানে-ওখানে ছড়ানো। যথা, একটি বাজার, থানা, ছাপাখানা, হাসপাতাল ও কম্বলীবাবার সদাব্রত। উখীমঠের সংস্কৃত নাম উষামঠ। পুরাকালে এখানে বাণাসুরের রাজধানী ছিল। তাঁর কন্যা উষাকে নাকি শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধ অপহরণ করেন শ্রীকৃষ্ণের উপযুক্ত নাতি বটে! আমাদের ধর্মশালার গায়েই প্রকাণ্ড মন্দির। এই মন্দিরে কেদারনাথের পূজারী রাওল মহাশয়ের বাসস্থান, শীতকালে কেদারনাথের উদ্দেশে এখান থেকেই পূজা নিবেদন করা হয়। আজ পর্যন্ত আমরা সর্বসমেত আঠারো দিন পথ হাঁটচি। আঠারো দিন পূর্বে আমাদের মৃত্যু ঘটেচে, আমরা সবাই প্রেতাত্মার দল, আপন-জন যদি আজ কেউ আমাদের দেখে, চিন্‌তে না পেরে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। আমরাও তাদের চিন্‌বো না, চেনালে তারা ভয় পেয়ে পালাবে, পূর্বজন্মের পরিচয়কে প্রেতজন্মে টেনে কেনই বা আনবো? মন্দিরের মধ্যে কিয়ৎক্ষণ টহল্ দিয়ে ঘুরে বাইরে চত্বরে এসে বসলাম। পাশেই একটা দোকান। দোকানটা বেশ মান্যগণ্য, তারই নীচে একখানা কাঠের চৌকি আশ্রয় করা গেল। মন্দিরের পাশেই পুলিশের থানা, তারই জমাদার দারোগা বেরিয়ে এসে চৌকির আর একপাশে বসে গল্প জুড়ে দিল। বোঝা গেল থানার ব্যয় আছে কিন্তু আয় নেই, মাইনে দিয়ে সবাইকে পুষে রাখা আর চল্‌চে না। থানার দারিদ্র্য শুনে এখানকার জনসমাজের সম্বন্ধে ভালো ধারণাই হয়। চুরি, ডাকাতি এবং অন্যান্য সামাজিক অপরাধ কম, এমন দেশ এই গাড়োয়াল। দারোগাবাবুর হাতে একখানি পুরাতন ইংরেজি সংবাদপত্র দেখে চমকে উঠলাম! তবে কি আমরা সত্যই মরজগতে জীবিত অবস্থায় আছি!

আশ্চর্য, আজ এই প্রথম এতকাল পরে কাগজের টুকরো দেখলাম; হিমালয়ের কোথাও কাগজ নেই। কাগজখানি যেন বাইরের পৃথিবীর প্রতিনিধি হয়ে চোখের সুমুখে এসে দাঁড়ালো। কাঙালের মতো হাত পেতে একবার সংবাদপত্রখানি চেয়ে নিলাম। কী যত্ন, কী আগ্রহ! কাগজখানি লাহোরের ট্রিবিয়ুন। পাঞ্জাব,—বাংলা দেশ,—বিলাত—আমেরিকা,—সবাই যেন পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে রয়েচে। মহাত্মাজী কারাগারে বন্দী। পঞ্চম জর্জের স্বাস্থ্য ভাল আছে। একটি মেয়ে উড়েচে উড়োহাহাজে বিলেত থেকে অষ্ট্রেলিয়া। মেদিনীপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট্ হত্যার জের। মুসোলিনীর মুখে দেখা গেচে ঐতিহাসিক হাসি। রাউণ্ড টেবলের পরিশিষ্ট। চীনা সহরে জাপানী বোমা। ডি ভ্যালেরা। সুভাষ বোসের পীড়া।—সংবাদগুলির দিকে তাকিয়ে আমার প্রিয় পৃথিবীর দেহস্পর্শটিকে নিবিড় আনন্দে অনুভব করতে পেলাম। চোখে আমার অশ্রু এলো।

কাগজখানি ফিরিয়ে দিয়ে নীরবে বসে রইলাম। শরীরটা ঝিম্ ঝিম্ করচে। আজ এই সামান্য পথটুকু আসতে অতিরিক্ত পীড়া অনুভব করেচি। যতই দিন যাচ্চে ততই সহজে ক্লান্ত হয়ে উঠ্‌চি। কষ্ট সহ্য করবার শক্তিও কমে আসচে। শরীরে এসেচে অকাল বার্ধক্য ও জীর্ণতা। এমনি করেই এক জায়গায় এসে পৌঁছবো কৌতূহল ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এবং ঠিক এমনি করেই যাবার সময় অবহেলায় ফেলে চলে যাবো—মনে একটুকু দাগ থাকবে না। আমরা সকল জায়গায় দুষ্প্রাপ্য একটা কিছু খুঁজে বেড়াই, কোথাও তাকে লাভ করিনে,—এক চোখে আমাদের আশা, অন্য চোখে আশাভঙ্গের মনস্তাপ। এই খোঁজাখুঁজি এবং ব্যর্থতাই জীবনের আসল চেহারা। যে-পথটা আমাদের জীবন থেকে

মৃত্যুর দিকে প্রসারিত সেই পথের দু'ধারে কত আনাগোনা, কত জানাশোনা; কত আশা ও আশাভঙ্গ; কত আনন্দ ও বেদনা; কত সন্ন্যাস ও কত ভোগ। আমরা এদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাই; কোথাও বাধা নেই, তারা আমাদের অগ্রগতির সহায়, পূজার উপকরণ মাত্র। জীবনের যে স্রোতটা চলে উৎপত্তি থেকে নিবৃত্তির দিকে, সেই স্রোতের দুই তীরে কত হাসিকান্না, কত সুখ-দুঃখ, কত মানুষের ছোট-বড় অসংখ্য বিচিত্র ইতিহাস! কোথাও ভালোবেসেচি, কোথাও সৃষ্টি করেচি স্নেহ ও মমতার বন্ধন, কোথাও সয়েচি প্রতারণা ও পীড়ন, কোথাও দৈন্য ও অপমান। তবু জীবন কোথাও ব্যাহত হয় না, রুদ্ধ হয় না, পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের প্রেরণায় আপন বেগে ছুটে চলে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'লো, তার সঙ্গে নেমে এল অপরূপ জ্যোৎস্না। সম্ভবত আগামী কাল পূর্ণিমা। জানি এটা বৈশাখী পূর্ণিমা। সেই শুক্লা চতুর্দশীর দিকে তাকিয়ে চোখে এল ঘুম। কোথাও একটু চুপ করে বসলেই ঘাড় ভেঙে তন্দ্রা আসে। ঘুমোতে পারলেই আমরা বাঁচি; প্রেরণা আমাদের নিস্তেজ, উৎসাহ আমাদের স্তিমিত। আমরা ক্লান্ত, বড়ই ক্লান্ত। সর্বনাশিনী পথমায়া গলায় দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলেচে,—ধুলোয়, কাঁকরে, পাথরে, কাঁটায় আমরা ক্ষতবিক্ষত। তবু না গেলে উপায় নেই, এই আমাদের নিয়তি। পিছনের পথ যেমন অতলে তলিয়ে গেচে, সম্মুখের পথ তেমনি অনন্ত রহস্যে অবলুপ্ত। নিজেদের উপরে আর আমাদের কোনো হাত নেই, নিয়তির কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করেচি, আমাদের জীবন ও মরণ তারি কাছে বাঁধা। আমরা নিয়তির খেয়ালের খেলায় সাজানো পুতুল, তার ইচ্ছার ইঙ্গিতে নড়ে চড়ে বেড়াই, হাসি আর কাঁদি, বাঁচি আর মরি।

আমাদের সকল কাজকর্মের পিছনে সে আছে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে, তার অঙ্গুলি-নির্দেশ মেনে নিতে হবে, আমাদের স্বতন্ত্র সত্তা কিছু নেই।

ঘুমোতে পারলেই বাঁচি, তন্দ্রায় চোখ জড়িয়ে এসেচে। পথ হাঁটতে হাঁটতে আজকাল আমাদের চোখে তন্দ্রা নেমে আসে। কখনো-কখনো বহুদূর পথ হেঁটে গিয়ে হঠাৎ চমক ভাঙে, তাই ত, চল্‌তে চল্‌তে সত্যিই যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিছু ত মনে নেই! হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের নাক ডাকার শব্দে নিজেরাই বিস্মিত হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাই। ঘুমের ঘোরে পাছে কোনোদিন পাহাড়ের গা থেকে পা পিছলে যায়, সেই আতঙ্কে সতর্ক হয়ে থাকি। নাল্ বাঁধানো লাঠিটা শক্ত হাতে ধরে' ঠুকে ঠুকে চলি। পথের একদিকটা পাহাড়ের গা, অন্য দিকটা একেবারে আলগা, সুতরাং পাহাড়ের গা ঘেঁসেই চলি। এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন সম্বন্ধে আমরা নিরন্তর সন্ত্রস্ত, কেবলই আমাদের সতর্কতা; অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দিকে আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাকাই, প্রতিদিন প্রভাত থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত মৃত্যুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে করতে সবাই আমরা ক্লান্ত হয়ে উঠি। অথচ জানি একদিন আর পালাতে পারবো না, ধরা একদিন দিতেই হবে। এত সাজসজ্জা, এত বিলাস, এত ভোগ ও তিতিক্ষা, এত দুঃখ ও প্রেম—সমস্ত আয়োজন মৃত্যুর দিকেই, সকল উপকরণ দিয়ে একদিন আত্মবলি দিতেই হবে মৃত্যুর পদতলে! অজ্ঞান মানুষের স্থায়িত্বের প্রতি তাই এত প্রলোভন। কেউ গড়ে তাজমহল, কেউ পিরামিড্, কেউ বা মহাপ্রাচীর। মৃত্যুর কোনো সান্ত্বনা নেই, সে অকরুণ তার ষোল আনা প্রাপ্য এক সময় চুকিয়ে নেবেই। আশী লক্ষ জীবের সঙ্গে মানুষও তার চোখে সমান। মানুষ বলে' কোন বিশেষ সম্মান অথবা পক্ষপাতিত্ব তার কাছে নেই, তার ধ্বংসের সম্মার্জনী ঝেঁটিয়ে

সবাইকে এক একবার সাফ করে দিচ্চে। আজ যারা নবীন, যাদের চোখে নতুন আলো, নব উদ্যম ও অনুপ্রেরণা, কাল তারা পক্বকেশ ও প্রবীণ, সংসার থেকে তাদের প্রয়োজন নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল, তারা আবার ছুটলো মৃত্যুর গর্ভে। দুরন্ত উল্লাসে বারে বারে তারা ছুটে আসে, দুর্দান্ত তাড়নায় বারে বারে তারা ছুটে পালায়। এর নাম জীবন।

আকাশ ও পৃথিবী প্লাবিত করে শুক্লা চতুর্দশীর চন্দ্রালোক ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগ্‌লো, পর্বতের চূড়ায়-চূড়ায় উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি রইলো জেগে। বসন্তের বাতাস আপন উত্তরীয় উড়িয়ে ভ্রমণ করে ফিরতে লাগ্‌লো—মন্দির-চত্বরের একান্তে শুয়ে আমার চোখে এল ঘুম।

পরদিন ভোর-রাত্রে আবার তল্‌পি-তল্‌পা কাঁধে নিয়ে সেই একটানা যাত্রা। যে-উখীমঠে পৌঁছবার জন্য এত আয়োজন ও আকর্ষণ, আজ তার প্রতি যাত্রীদের নির্দয় অবহেলা। আমাদের জীবন থেকে তার প্রয়োজন একেবারে শেষ হয়ে গেচে, সে পিছন থেকে সকরুণ দৃষ্টিতে আমাদের পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। আমাদের ডাক এসেচে প্রভাতের দিকে, ডাক দিল শুক্রতারকা, আহ্বান এল দূর-দূরান্তরের। রাত্রির আঁধার রইলো পিছনে, আলো পাঠিয়েচে তার নতুন সংবাদ, আমাদের যাত্রা শুরু হ'লো। ভোরের মুখচোরা বাতাস চলাচল করচে, পাখীর কলকাকলি জানাচ্চে আনন্দ-অভিনন্দন, পথের পাশে-পাশে বসন্ত-পুষ্পের সমারোহ, আকাশের দেবতা স্বরঞ্জিত বরণডালায় উষাকে বন্দনা করচেন, তারই নীচে-নীচে তীর্থযাত্রীদের পথ। পথ কেবল চড়াই, কেবল উঠ্‌চে উপর দিকে, আমরা চল্‌চি গুটি-গুটি। কারো এগিয়ে যাবার উপায় নেই, ছন্দটি ঠিক বজায় রেখে চলতেই হবে; যে দু'পা

পিছনে থাকবে তাকে বরাবর পিছনেই থাকতে হবে। যদি সে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে তবে দম্ ফুরিয়ে এক সময় তাকে বসে পড়তেই হবে। কেউ যদি বাহাদুরি প্রকাশ করে, পথ তার কাছে কড়ায় গণ্ডায় মূল্য আদায় করে নেবে। শক্তিমান এবং দ্রুতগামীর প্রতি বাবা বদরীনাথের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব একটুও নেই, দুর্বল এবং বলবানকে তিনি সমশ্রেণীভুক্ত করে কাছে টেনে নেন্।

কাঁথা চটি এবং গোলিয়া বগড় পার হয়ে আরো এক মাইল চড়াই অতিক্রম করে আমরা সেদিন মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে অধমৃত অবস্থায় দোয়েড়া চটিতে এসে পৌঁছলাম। এই চটিগুলো যে কবে শেষ হবে জানিনে, এরা যেন পথের ধারে বসে থাকে যাত্রীদের ধরে গিল্তে এবং ঠিক সময়ে উদ্গিরণ করে দিতে। অথচ, উপমাটা উল্টে দাও, এই চটির মতো বন্ধু পথে আর কেউ নেই। যে-পথ অবারিত এবং বাধাবন্ধনহীন, যে-পথে মুক্তির অনাবৃত অবকাশ, সে-পথে চলা যায় না, পথিকের পায়ে সে-পথ ভয়ানক বাধা, তার নাম মরুভূমি,—তাই পরিশ্রান্ত পথচারীকে সাদরে আহ্বান করে নেয় এই ডালপালায় বাঁধা, লতাপাতায় ঘেরা চটি। দরিদ্রা দুঃখিনী মাতা যেন পথের ধারে দাঁড়িয়ে পথক্লান্ত সন্তানের আশায় চেয়ে থাকেন—এক হাতে তাঁর ঝরণার সুশীতল জল, অন্য হাতে যৎসামান্য বিদুরের খুদ্।

ভোজন ও নিদ্রার পরে বেলা তিনটে লাগাৎ আবার পথে নেমে এলাম। রৌদ্র তখনো প্রচণ্ড, মেঘের চিহ্ন কোথাও নেই। দিন তিনেক আগে যে আমরা বরফের গর্ভে ঠাণ্ডায় সমাধিস্থ হতে চলেছিলাম আজ ঘর্মাক্ত কলেবরে যেতে-যেতে সে-কথা ভুলেই গেচি। এবেলার পথটিতে শীতকাল, ওবেলার পথে নেমেচে চারিদিক আবৃত করে বর্ষাঋতু।

গ্রীষ্মের পরই হয়ত এক সময় দেখা দিল সুন্দর বসন্তকাল। দুপুরবেলায় শীতে হয়ত সর্বশরীর ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপচে, রাত্রে হয়ত বা গ্রীষ্মাধিক্যে অনাবৃত দেহে চটির দরজার কাছে ঘুমিয়ে রইলাম। একটি দিনের মধ্যেই কখনো পাই শরৎকালের নীলোজ্জ্বল আকাশ, মল্লিকা ও শেফালির সমারোহ; কখনো পাই শ্রাবণের মতো সকরুণ জলধারা,—কদম্ব-চম্পকের শোভা; কখনো পাই ঋতুরাজের বসন্তবিলাস,—পূর্ণিমার মধুযামিনী; কখনো বা পাই শীতের শীর্ণতা;—প্রকৃতির রুক্ষ বৈধব্য-বেশ। প্রতিদিন আমাদের চোখে বৈচিত্র্যময় ঋতু-উৎসব। উৎপীড়িত আমরা জীবন-বৈরাগীর দল অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে তাদের দেখে দেখে উদাসীন হয়ে চলে যাই। আমরা আর কিছুতেই যেন মোহগ্রস্ত হইনে।

আগের দিন মন্দাকিনী পার হয়ে উখীমঠের পথে সেই যে চড়াই শুরু হয়েছিল, সে-চড়াই আজ এখনো চল্‌চে, এর আর শেষ নেই, বিরাম নেই। আমাদের নিঃশক্তি করা ও রক্তশোষণ করাই এ পথের উদ্দেশ্য। আজ সকালে রুইদাস সুকুল ও পণ্ডিতজীকে অকর্মণ্য হয়ে পিছনের চটিতে পড়ে থাকতে দেখে এসেচি। সেই বৃদ্ধা ও স্থূলকায়া মারহাট্টি স্ত্রীলোকটিকেও পথে বসে আর্তনাদ করতে দেখেচি। মনসাতলার মাসি চড়া দামে একটা কাণ্ডি ভাড়া করে কুলীর পিঠে উঠেচে। মাছির কামড়ের ঘায়ে ও পোকার তাড়নায় একেই ত সবাই যন্ত্রণাজর্জর, তারপরে এই চড়াই, জীবনের আশা আর কেউ তারা করে না। নির্মলা চল্‌তে চল্‌তে একবার করে দাঁড়ায়, বোধ হয় কাঁদবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না, জিহ্বার সঙ্গে টাগ্‌রা স্পর্শ করতে না পেরে কেমন একরকম ভঙ্গীতে মুখের শব্দ করে, অনেকটা মৃত্যুপথযাত্রীর খাবি খাওয়ার মতো! চল্‌তে চল্‌তে কেউ হয়ত যন্ত্রচালিতের মতো তার মুখে একটু জল দিয়ে যায়, সে

তখন ঢোক গিল্‌তে চেষ্টা করে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিরুপায় হয়ে তাকায়। মুখে কথা এদের কারো নেই, দাঁতের সঙ্গে জিহ্বা তালু জুড়ে এঁটে গেচে, বাক্যব্যয়ের শক্তি নেই। তাদের একটিমাত্র কথা—পথ আর কত দূর? পথ আর কতদূর তা কেমন করে জান্‌বো! একই অজানা পথের যাত্রী আমরা সবাই, কী করে বল্‌বো সেই চির-ঈপ্সিত দুর্লভের মন্দির আর কত দূরে! ইচ্ছা হয় বলি, তোমরা আর এগিয়ো না, এইখানে থেমে যাও, এইটুকুই তোমাদের সীমা ও শেষ; কিন্তু কেমন করে বলি? থামবার জায়গা ত এ নয়, এ সমস্তই যে অতিক্রম করে যেতে হবে, না গেলেই চল্‌বে না, পিছনে হিমালয়ের অনন্ত পর্বতমালার গর্ভে আমরা হারিয়ে গেচি, থামলেই যে চিরদিনের মতো থামতে হবে, অগ্রগতি ছাড়া আর আমাদের গতি নেই। এ পথে ক্ষমাও যেমন নেই, সুবিধারও তেমনি অভাব। পদব্রজে যে চলেচে তার অবস্থা যতই সচ্ছল হোক, বিশেষ সুযোগ পাবার কোন উপায় তার নেই। এইটি সকলের চেয়ে বড় পরীক্ষা। ছোট-বড়র প্রশ্ন এখানে ওঠবার এতটুকু অবকাশ নেই, দরিদ্র ও ধনীর বিভিন্ন হয়ে চলবার কোন পথ নেই, অহমিকা আত্মম্ভরিতা, বিদ্বেষ চিত্তমালিন্য, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতা—এগুলিকে প্রকাশ করবার কোনো সুবিধাই নেই। জাতিবর্ণনির্বিশেষে আমরা সবাই সমান। আহার-বিহার, বিশ্রাম-শয়ন ও পরিশ্রম—সকলেরই এক ধরণের। একজন যে কোথাও আর একজনের চেয়ে ভালো খেয়েচে, ভালো থেকেচে, এ-কথা বলবার উপায় নেই, যদি কেউ বলে তবে সে মিথ্যাবাদী।

পৌথীবাসা ও বানিয়া কুণ্ড ছেড়ে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা চোপতা এসে পৌঁছলাম। সম্মুখে একটি বড় ধর্মশালা, তারই প্রায় কোল ঘেঁসে খানিকটা খোলা জায়গা এতক্ষণে দেখতে পেয়ে আমরা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস

ফেললাম। সমতল স্থানের কাঙাল হয়ে উঠেচি, যেদিকেই তাকাতে যাই পাহাড়ে-পাহাড়ে দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে, কোথাও আমাদের মুক্তি নেই। কেবলই মনে হয়েচে কোথাও ছুটে পালাই, কোনো উন্মুক্ত সমতল প্রান্তরে, কোনো দূর সমুদ্রের তীরে। কোথায় আঁকাবাঁকা বনপথ, গ্রাম থেকে বেরিয়ে যে-পথ গেচে ধানক্ষেতে, সেখান থেকে নদীর কিনারায়, গ্রাম-বধূর দল যে-পথ দিয়ে কলস নিয়ে ফেরে, বাউল যে-পথে গান গেয়ে যায়—'মনের মানুষ মনের মাঝে কর অন্বেষণ।' সে-পথ কোথায়? আমরা এ হিমালয় আর চাইনে, পাথরের পর পাথরের পুঁজি আর চাইনে, আর চাইনে পার্বতী নীল নদী, উন্মাদিনী অন্ধ ঝরণা।

মানুষের জীবন যেখানে সঙ্গিহীন একাকী, যেখানে সে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েচে, যেখানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে নিজের কর্তৃত্ব নিজে করে, সেখানে সে অতিরিক্ত অসহায়। সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের দিন নিজেই ঠেলে চলা, সে ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নয়, তার নাম উচ্ছৃঙ্খল আত্মপরতা। যারা দোকানে বসে খায়, ধর্মশালায় গিয়ে ঘুমোয়, প্রমোদাগারে গিয়ে লীলা-বিলাস করে, যথেচ্ছ ভ্রমণে বেরোয়, রুগ্ন অবস্থায় হাঁসপাতালে গিয়ে ভর্তি হয়, তারা স্বাধীন হতে পারে, কিন্তু তারা দুর্ভাগ্য। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গেই পৃথিবীর একটা দেনা-পাওনা আছে। দু'টি বন্ধন আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে, স্নেহের ও সেবার। সকল মহাপুরুষের জীবনেতিহাসে দেখতে পাই এই স্নেহ ও সেবার খেলা। মানুষকে ভালবাসতে হবে এবং ভালোবাসা পেতে হবে, সেবা করতে হবে এবং সেবা নিতে হবে। মানুষের সেবাকে যে অস্বীকার করলো, যে মানলো না স্নেহের বন্ধন, সে হতভাগ্য বিষাক্ত করে গেল মানব-সমাজকে। তাকে আমরা বোহেমিয়ান্ বল্‌বো, কিন্তু মানুষ বল্‌বো

না। আজ যদি সবাই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পেয়ে ক্ষেপে ওঠে, যদি সমাজের কোনো একটা আকারকে প্রত্যেকে না মেনে নেয়, তবে সমগ্র জগৎ মরুভূমিতে পরিণত হবে। পৃথিবীতে স্নেহ ও সেবা নেই, প্রেম ও মোহ নেই, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংসর্গ নেই—তবে তার কেমন চেহারা দাঁড়ায়? যে-সভ্যতা আজ দিকে দিকে প্রসারিত, তার মর্মমূলেই যে এই স্নেহ ও সেবার রস সিঞ্চিত হয়েচে, এদের ছেড়ে মানব-সমাজ চল্‌বে কোন্ দিকে? এই যে তীর্থযাত্রীর দল চলেচে, এদের চেয়ে স্বাধীন আর কে? এরা স্নেহ করে শুধু নিজেকে, সেবা করে শুধু নিজেদের। এদের পিছনেও যেমন আজ বন্ধন নেই, সম্মুখেও নেই তেমনি বাধা। এরা সবাই নিজের পুঁটুলি সাম্‌লায়, নিজেরাই কাঠ-কুটো সংগ্রহ করে আনে, নিজের বিপদ ও কুশল নিয়েই ব্যস্ত, আপন-আপন স্বাতন্ত্র্যই তাদের মূলমন্ত্র। সুখের বিষয় এইটিই এদের আসল চেহারা নয়। এদের দিকে তাকিয়ে ভয় পাই, এরা মানবজীবনের স্নেহহীন কঙ্কালের দল, এদের তীর্থ যেদিন ফুরিয়ে যাবে সেদিন এরা ছুট্‌বে মমতা ও দাক্ষিণ্যের স্নিগ্ধ ছায়ায়, এরা সেদিন পালাবে গৃহে ও সমাজের পথে—এদের আমি জানি। এদের জীবনের সকল ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়নি; ক্ষুধার পথরোধ ক'রে, অস্বাভাবিক সংযমের রূপ পরিগ্রহ ক'রে, মোহ ও ভালোবাসার কারবার স্থগিত রেখে এরা এসেচে এই মহাতীর্থের পথে আত্মশুদ্ধির আকাঙ্ক্ষায়। মন্দিরের কোণে কোণে যদি জঞ্জালের স্তূপ জমা থাকে তবে সেখানে দেবতার আসন পাতা চলে না। যারা তীর্থের পর তীর্থ পর্যটন করে বেড়ায়, তাদের মধ্যে কেবল আছে আত্ম-তাড়না, তারা দেবতার পিছনে পিছনে ছোটে, দেবত্বের স্পর্শ পায় না।

ধর্মশালার রক্ষী একজন পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ। শীতের হাওয়ায় আমাদের

জর্জরিত ও আড়ষ্ট দেখে তিনি কয়েকখানা কম্বল কোথা থেকে আনিয়ে দিলেন। বিনয়ী ও সদালাপী পা-জামা-পরা মানুষটি। যাত্রীদের কাছে সামান্য দু'চারটি পয়সা যা পান্ তাইতেই তাঁর চলে। দুধ ও তামাক খেয়ে গোপালদা একটু সুস্থ হয়ে বসলে তিনি কিয়ৎক্ষণ ধর্মালোচনা করে ও কিছু প্রণামী নিয়ে গেলেন। সমস্ত দিন গ্রীষ্মের পর অকস্মাৎ সন্ধ্যায় এই হিমাচ্ছন্ন বাতাস পেয়ে সবাই কতকটা সজীব ও উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। গোপালদা প্রতি পনেরো মিনিটে একেবার করে ছিলিম্ ধরাতে লাগলেন! বন্ধ ধর্মশালার বাইরে বৈশাখী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় চারিদিক প্লাবিত হতে লাগলো,—তুহিন-শীতল নিভৃত রাত্রি।

পরদিন ভোরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমরা ভুলোকনা চটির ধারে এলাম। আকাশে মেঘ করেচে, মাঝে মাঝে এক এক ফোঁটা বৃষ্টির জল আমাদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাচ্চে। কখনো-কখনো বিদীর্ণ মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ হেসে উঠচে। পথে আজ হয়ত ঘোরালো হয়ে বৃষ্টি নামবে। ভুলোকনা পার হয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই পাওয়া গেল বাঁ-হাতি শ্রীতুঙ্গনাথের পথ। দক্ষিণের পথ সোজা উঠে গেচে লালসাঙ্গা অথবা চামোলির দিকে। পথের ধারে জনকয়েক কাণ্ডিওয়ালাকে দেখা গেল। তুঙ্গনাথের পথ ভয়ানক চড়াই, অনেকটা ত্রিযুগীনারায়ণের মতো, যদি কেউ উঠে গিয়ে দর্শন করে আসতে চায় তবে সে এখানে খুচ্‌রো কাণ্ডি ভাড়া করতে পারে। অনেকেই গেল, কেউ গেল পদব্রজে, কেউ বা কাণ্ডিতে। হিমালয়ে সবসুদ্ধ চার ধাম। বদরীনাথ, কেদারনাথ, ত্রিযুগীনাথ ও তুঙ্গনাথ। তুঙ্গনাথ থেকে চব্বিশ মাইল উত্তরে মান্ধাতার ক্ষেত্র আছে। যাত্রীরা এখানে আকাশ-

গঙ্গায় স্নান করেন। পুরাতন মন্দিরটিতে একটিমাত্র পূজারী, অতিরিক্ত নীরব ও জনবিরল পর্বতচূড়া, আশেপাশে কোথাও গ্রাম বা চটির চিহ্নমাত্র নেই, সামান্য একখানিমাত্র দোকান এক পাশে টিম্ টিম্ করচে। তুঙ্গনাথের উপরে দাঁড়ালে দূর উত্তরে ধবল তুষারময় হিমালয়ের নয়নাভিরাম রূপ দৃষ্টিগোচর হয়। এমন অপরূপ রূপের বৈচিত্র্য তুঙ্গনাথ ছাড়া আর কোনো জায়গা থেকেই এমন করে দেখা যায় না। যেন মহাযোগী কেদার ও বদরীনাথের শ্বেতপুষ্পশয্যা, পদতলে এই একাত্ম হরিহরের সেবায় বসে রয়েচেন শ্যামলশোভাময়ী মহাসতী।

দক্ষিণের পথ তুঙ্গনাথের কটিদেশ বেষ্টন করে পূর্বদিক থেকে ঘুরে পশ্চিম দিকে চলে গেচে, তুঙ্গনাথ দর্শন করে এই পথে নেমে আসতে হয়। পথ এখানে অরণ্যময় ও নিস্তব্ধ, সামান্য চড়াই ও সামান্য উৎরাই, সমুদ্র-তরঙ্গের মতো আমরা কখনো উঠ্‌চি, কখনো বা নামচি, অনেকটা সমতল বলা যেতে পারে। পথটি ধরে যতই এগোই, অরণ্য ততই নিবিড় ও অন্ধকার হয়ে আসে। এখন এখানে বসন্তকাল, শুকনো ঝরা পাতায় পথ আচ্ছন্ন। একা একাই বনপথ দিয়ে চলেচি, উৎরাইটুকু পেয়ে হাঁপ ছেড়েচি বটে, কিন্তু পায়ের সেই ব্যথাটা আবার খচ্ খচ্ করে উঠেচে! শরীরে কোথাও একস্থানে ব্যথাটি যেন থাবা পেতে লুকিয়ে বসে থাকে, সুযোগ পেলেই আত্মপ্রকাশ করে। পত্রপল্লবের ভিতর দিয়ে সর-সর শব্দে বসন্ত-বাতাস থেকে-থেকে বয়ে চলেচে। এবারে বামে ও দক্ষিণে আবার বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি ছুটে গেল। আকাশের দিক্‌বলয় যখন সুবিস্তৃত হয়ে ওঠে তখনই বুঝতে হবে আমরা অনেক উঁচুতে উঠেচি। সকল দিকের দৃষ্টির বাধা যেন খুলে গেচে। জীবনেও এমনি। যখন সঙ্কীর্ণ চেতনার মধ্যে আমরা বাস করি তখন আমাদের মনের আকাশ অল্প-

পরিসর, স্বল্প-আয়তন; মানুষ যখন উদারতা ও মহত্ত্বের শীর্ষে উঠে দাঁড়ায় তখন দেখতে পাই তার হৃদয় ও দৃষ্টির প্রসার, পরিব্যাপ্তি। যারা নিতান্ত আপন ঘর নিয়ে ব্যস্ত তারা সমাজবদ্ধ জীব, তাদের ছাড়িয়ে আর একটু উঁচু স্তরে যাঁরা ওঠেন তাঁদের বলি দেশমান্য, তাঁরা রাষ্ট্রপতি। সমাজ ও রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে যাঁরা আরো উধ্বলোকে উঠেচেন আমরা তাঁদের বলি বিশ্বের কল্যাণকামী মহামানব, মহাত্মা। কাব্য ও সাহিত্যেও এই। সুবিস্তৃত কল্পনা, অনন্ত সৌন্দর্যলোক। কথাকে অতিক্রম করে সুর, ছন্দকে অতিক্রম করে ব্যঞ্জনা। যখন গল্প লিখি তখন কতকগুলি চরিত্র সম্মুখে এসে নড়ে চড়ে বেড়ায়, তাদের স্বাধীন ইচ্ছা, সহজ গতি, তারা নিজেরাই ঘটনার সৃষ্টি করে, নিজেদের চরিত্রের ইঙ্গিত করে। কিন্তু শুধুই ত' চরিত্র নয়, কেবলই ত' ঘটনা নয়—তাদের সাহিত্যে টেনে আনার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? বাস্তব জীবনেও ত আমরা কত বিচিত্র ঘটনার সংস্পর্শে আসি, কিন্তু প্রত্যেকের স্থান ত সাহিত্যে নেই। যিনি বড় আর্টিষ্ট তাঁর আছে এই নির্বাচন-শক্তি, চরিত্র ও ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করার বিশিষ্ট ভঙ্গী। যিনি চরিত্র সৃষ্টি করেন তিনি দ্রষ্টা, যিনি রসসৃষ্টি করেন তিনি স্রষ্টা। শিল্পী হচ্চেন একাধারে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। তাঁর স্পর্শে সামান্য বস্তু হয়ে ওঠে অসামান্য, তিনি নিয়ে যান্ লোক থেকে লোকোত্তরে, সঙ্কীর্ণতা থেকে পরিব্যাপ্তিতে, জীবন থেকে মহাজীবনে।

পাঙ্গরবাসা চটিতে এসে উঠলাম। সূর্যের উত্তাপ এবেলায় অল্প, আকাশ আজ সকাল থেকেই মেঘ-মলিন। উপরে ও নীচে অরণ্যময় পর্বত, সেই অরণ্যের গভীর গহ্বর থেকে ছোট-ছোট এক-একটি ঝরণা এখানে ওখানে নেমে এসেচে। কাছাকাছি কোথাও ঝরণা থাকলেই

আমরা টের পাই। এবেলায় গিরগিটির ডাক অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠেচে। শীত তেমন আর নেই, প্রভাতের শীত মধ্যাহ্নে বসন্তে রূপান্তরিত হয়েচে। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, এবার দেখলাম সর্বাঙ্গে মাছির দল বিড়-বিড় করচে, মৌচাকের গায়ে যেমন লেগে থাকে মধুমক্ষিকা। ফুঁ দিলে মাছি নড়তে চায় না, হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে হয়। মাঝে-মাঝে কোনো-কোনো চটিতে লক্ষ-লক্ষ মাছির এমন একটা গম্ভীর গুঞ্জন ওঠে যে কান পেতে শুন্‌তে ভালই লাগে। একটি মধুর একঘেয়ে উদাসীন সুর। রাত্রির অন্ধকারে অর্ধজাগ্রত তন্দ্রায় কানের কাছে যারা মশার গান শুনেচে, তারা জানে কেমন একটি সকরুণ অবসাদে মন উদাসীন হয়ে ওঠে।

ভোজন ও শয়নের পর আবার ঝোলাঝুলি কাঁধে নিয়ে পথে নামা। জুতোটা একটু ছিঁড়ে গেচে, রাঁধতে রাঁধতে হাত দু'খানায় আঁচ লেগে কালো হয়ে উঠেচে, হাতে আর লোম নেই, বাসন মেজে-মেজে আঙুলগুলো বিবর্ণ ও কদাকার। আহারে কৃচ্ছ্রসাধনা করে শরীর হয়ে এসেচে রক্ত-হীন;—যখন বসি তখন আর উঠতে পারিনে, যখন হাঁটি তখন আর বসতে পারিনে। পথে নেমে যন্ত্রের মতো চলি, পথ পেলেই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পা দু'খানা আপনি চল্‌তে থাকে। নিজেদের দিকে তাকিয়ে আমরা অশ্রুভারাতুর নিশ্বাস ফেলি, ঘুমের ঘোরে মুখের ভিতর থেকে এক রকম আর্তস্বর বেরুতে থাকে, তারি শব্দে নিজেরাই চম্‌কে উঠি, তখন বুঝতে পারি মানুষের নিপীড়িত আত্মা কী কষ্টে মানুষের মধ্যে কেঁদে বেড়ায়।

উপর থেকে নীচে অরণ্যের ভিতরে নেমে চলচি। এখনো সন্ধ্যার অনেক বিলম্ব, তবু ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আস্‌চে। শোনা গেল, এ অঞ্চলে হিংস্র জানোয়ারের উৎপাত মাঝে-মাঝে প্রবল হয়ে ওঠে, সাপ

এখানে পায়ের শব্দে পালায় না, মানুষ দেখলে ঘাড় উঁচু করে তাকায়, গাছ-পালায় তারা ভ্রমণ করে, পথের ধারে-ধারে হাঁটে। কবে নাকি এ অঞ্চলে দাবানল জ্বলে উঠেছিল, তারই পোড়া দাগ গাছে-গাছে এখনো লেগে রয়েচে! সন্ত্রস্ত হয়ে আমরা সদলবলে চলেচি। কেউ যদি এগিয়ে যায় তবে দু'পাশে জঙ্গলের চেহারা দেখে শঙ্কিত হয়ে থম্‌কে দাঁড়ায়, অকারণ গোলমালে পথটা সরগরম করে তোলে,—পিছিয়ে পড়তে কেউ চায় না। কোথাও-কোথাও পথ পিছল, শ্যাওলা-পড়া, কোথাও কোথাও পথের উপর দিয়েই কোনো কোনো ঝরণার আবিল স্রোত বয়ে চলেচে। আকাশ দেখতে-দেখতে ঘন-ঘটাচ্ছন্ন হয়ে এল, মেঘ ডেকে উঠলো, বিদ্যুৎ খেল্‌তে লাগলো—বজ্রপাতের শব্দে এদিকে পাথরে ফাটল ধরে, পাথরখণ্ড স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে নেমে আসে, সে এক ভয়াবহ বিভীষিকা। দেখতে-দেখতে অন্ধকার ঘন হয়ে এল, সপ্‌-সপ করে বৃষ্টি নাম্‌লো। তখন আর উপায় নেই, বর্ষণ শেষ হবার অপেক্ষায় কোথাও দাঁড়ানো যায় না, এ গভীর অরণ্যে একটি মুহূর্তও কোথাও আশ্রয় নেওয়া চলে না। বৃষ্টিতে ভিজি ক্ষতি নেই, কিন্তু এই অরণ্যের কবল থেকে পালাতে পারলে আজকের মত বেঁচে যাই। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে এক-একবার বৃক্ষলতার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে চলেচি, গা ছম্‌ছম্‌ করচে, শরীর ক্ষণে-ক্ষণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠচে। আঁকাবাঁকা পথ, একজন মোড় ঘুরলেই আর অন্য জনকে দেখা যায় না, সবাই কাছাকাছি আছি বটে কিন্তু প্রত্যেকেই হারিয়ে গেচি। এতক্ষণে কথাবার্তা বলছিলাম কিন্তু পথের ঠিক পাশেই কি-একটা জানোয়ারের একখানা শুকনো কঙ্কাল দেখে অবধি আর আমাদের মুখে কথা নেই। কখনো-কখনো অন্ধকারে পাখীর ডানার ঝটাপট শব্দ শুন্‌তে পাচ্চি,

এবার হয়ত সত্যিই সন্ধ্যা হয়েচে। বায়ু ও বৃষ্টির বেগে আমরা সেই অন্ধকারে প্রায় দিশাহারা হয়ে গেলাম।

চারুর-মা কুঁজো হয়ে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালো, বামুন-বুড়ি কুলীর পিঠে কাণ্ডিতে চল্‌চে, তার দিকে তাকিয়ে চারুর-মা ভয়ার্তকণ্ঠে বললে, 'তুমি পাচ্চ না মা ?'

বামুন-বুড়ি চুপি চুপি বললে, 'কি লা ?'

চারুর-মা চল্‌তে চল্‌তে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে, 'কেমন যেন বোট্‌কা গন্ধ! এই কাছেই কোথাও আছে মা।'

'দুগ্‌গা দুগ্‌গা—ও তুল্‌সীরাম, চল্ বাবা এগিয়ে।' বলেই বামুন-বুড়ি হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো, 'পঞ্চাননের কিছু করে আসতে পারলুম না… মধুসূদন, নারায়ণ!'

তুলসীরাম তাকে নিয়ে এগিয়ে যেতেই সেই কঙ্কাল-শরীর জরাজীর্ণা চারুর-মা আমার কাছাকাছি এসে একগাল হেসে বললে, 'দিলাম বামুন-মাকে ভয় খাইয়ে বা'ঠাকুর…মরবার নামে এত ভয়!'—বলতে বলতেই সেই অশীতিপর মৃত্যুভয়হীনা বৃদ্ধা গল্ গল্ করে হাসতে লাগলো। '—আমি যদি মরি তবে চারু রইলো, ও আমি চুকিয়ে এসেচি… সরস্বতী, ভাদু, হাব্‌লি, আর বাকি কটা গরু-বাছুর…তিরিশ সের দুধ রোজ হবেই, চারুর একটা পেট, সেই এগারো বছর বয়স থেকে বিধবা… চল্‌বে না বা'ঠাকুর ?'

'চল্‌বে বৈকি।'

কত গল্পই চারুর-মা সেই দুর্যোগময় পথে যেতে যেতে করে গেল। তার দুধের ব্যবসার ইতিহাস, তার ভাইপোর কাহিনী, তার সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও নেপাল-পশুপতিনাথের রোমাঞ্চকর অ্যাড্‌ভেঞ্চার। কিছুই

কানে ঢুকছিল না, মাঝে মাঝে শুধু 'হুঁ' দিয়ে তাকে উৎসাহ দিচ্ছিলাম। চারুর-মা কোনো বিপদ বা দুঃখকে এতটুকু ভয় করে না।

যাক্, বৃষ্টি ধরে গেল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে, অনন্ত সমুদ্রে পথহারা নাবিক যেমন অকস্মাৎ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আবিষ্কার করে বসে, তেমনি দূর অন্ধকারে আলোকবর্তিকা দেখে আমরা উল্লসিত হলাম। আজকের মতো মৃত্যুকে আমরা তবে এড়াতে পেরেচি! অরণ্যের পথ তখন শেষ হয়েচে। আঃ—বাঁচলাম!

অন্ধকারে খুঁজে খুঁজে চটি পাওয়া গেল। নিকটে বালখিল্য নদীর শীর্ণধারা দৃষ্টিগোচর হ'লো না, শুধু নদীর রেখাটি দেখা গেল। একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে কিন্তু তা দর্শন করার আর শক্তি নেই। ধর্মশালায় জায়গার অনটন হ'লো, আমরা ডালপালায় বাঁধা চটিতেই আশ্রয় নিলাম। এর নাম মণ্ডল চটি, অনেকে জঙ্গল চটি বলেও এ'কে অভিহিত করে। আজকের মতো এখানেই যাত্রা শেষ। গোপালদা মহাসমারোহে গঞ্জিকার ছিলিম্ প্রস্তুত করলেন।

খানিক রাতে, আমরা যখন শয়নের আয়োজন করচি এমন সময় দু'টি হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক ও একটি পুরুষ কাঁদতে কাঁদতে এসে চটির ধারে দাঁড়ালো। কী কান্না, কী আকুলি-বিকুলি! বললে, 'মহারাজজী, তুমারা গোড় লাগি, এক লণ্ঠন হাম্‌কো দেও, এক আদ্‌মি হামারা জঙ্গলমে রহে গৈ, দেও বাবা, দেও।'

এই ঘনঘটাচ্ছন্ন রাত্রে কোথায় কোন্ জঙ্গলে তাদের লোক পড়ে রইলো? সে কি এখনো বেঁচে আছে? জানা গেল সে স্ত্রীলোক। সঙ্গে আসতে আসতে পিছনে পড়েচে, এতক্ষণ অপেক্ষার পরেও সে এসে পৌঁছলো না। আলো হাতে নিয়ে তাকে সেই দুর্গম ও প্রাণঘাতী পথে খুঁজতে

যেতে হবে, কিন্তু হারিকেন লণ্ঠন তাদের কাছে নেই। নির্মলা আর থাকতে পারলো না, দিল তার লণ্ঠনটা তাদের হাতে তুলে, তারা উন্মাদের মতো সেই রাত্রে আবার সেই পথ ধরে চল্‌লো—কথা রইলো, লালসাঙ্গায় গিয়ে তারা লণ্ঠনটা ফেরৎ দেবে।

তারা গেল কিন্তু সঙ্গে নিয়ে গেল আমার এই নিভৃত রাত্রির নিদ্রা। আমারো ব্যাকুল মন ও সজাগ দৃষ্টি তাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই নিরুদ্দিষ্টার সন্ধান করে ফিরতে লাগলো। হয়ত, কে জানে, তাদের মানুষ তারা এক সময় খুঁজে পাবে, কিন্তু আমি পাবো না খুঁজে, আমার লক্ষ্যহারা কল্পনায় সে-মানুষ চিরনিরুদ্দেশ, চিরপথহারা; সে আর কোনোদিন ফিরবে না।

সবাই ঘুমুলো, কিন্তু আমায় দিল বিধাতা কঠিন শাস্তি। গায়ে কম্বল ফুট্‌চে, সর্বশরীরে যন্ত্রণা, বিশ্রী অস্বস্তি,—সমস্ত রাত নদীর দিকে নিঃশব্দে দৃষ্টি প্রসারিত করে জেগে রইলাম, ঘুম আর এল না।

গতদিনকার কথা ভুলে গেচি। যত দিন যায়, স্মৃতি শিথিল হয়ে আসে। গত রাত্রের দুর্যোগ?—সে ত' স্বপ্ন, সে ত' মায়া! আজকের এই সকালবেলাটিই সত্য—এই নীল আকাশ, এই নির্মল রৌদ্র,—বসন্ত-দিবসের এই অপরূপ ঐশ্বর্যসম্ভার। গত দিনের প্রকৃতির আলোড়ন, প্রলয়ান্ধকার, ঝটিকা ও বজ্রপাত—সে অতীত কালের, গত জন্মের। আমাদের সর্বশরীরে তার ছাপ আছে, কিন্তু মনে তার একটুও দাগ নেই। স্মরণ-শক্তির পরিসর আমাদের অতি সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেচে, এবেলার ইতিহাস ওবেলায় হয়ে ওঠে উপন্যাস। আমারই ঘটনা অন্যের মুখ থেকে যখন শুনি, অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। আবার হাঁটচি। সকাল থেকে লেগেচে

চড়াই, দেয়াল বেয়ে যাত্রীর দল উঠ্‌চে পোকার মতো। পোকার মতো অক্লান্ত, পোকার মতো নির্বাক।

স্থটানা চটি ধীরে ধীরে পার হলাম। আর চল্‌তে পারচিনে। শরীর অতিরিক্ত যন্ত্রণায় থর-থর করে কাঁপচে। চোখ জ্বালা করচে, হাতের লাঠি আর শক্ত করে ধরে থাকা যাচ্চে না। ঝোলা ও কম্বল কাঁধের উপরে প্রবল শত্রুর মতো চেপে ধরেচে, এদের গুরুভার ও পীড়ন আর সইতে পারিনে। এমনি করে এলাম আরো মাইল দেড়েক পথ। রৌদ্র অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেচে, এত তীব্র যে গা পুড়ে যায়। কাছেই পাওয়া গেল গোপেশ্বর, সম্মুখে গোপেশ্বরের প্রকাণ্ড প্রস্তরময় মন্দির। অতি নগণ্য একটি শহরের অনুকরণ, দু'একখানি দোকান, নিকটেই ক্ষুদ্র একখানি গ্রাম, গ্রামের ছেলেমেয়েরা পাই-পয়সা ভিক্ষা করতে যাত্রীদের কাছে ছুটে এল। শিবমন্দিরটির সম্মুখে বিরাট এক ত্রিশূল দণ্ডায়মান, তারই লৌহবক্ষে দ্বাদশ শতাব্দীর মহারাজা অনেকমল্লের বিজয়বার্তা এক দুর্বোধ্য ভাষায় লিখিত। যাত্রীরা এখানে বৈতরণীকুণ্ডে স্নান করে। তা করুক, একখানা দোকানের ধারে পাথরের গায়ে হেলান্ দিয়ে বসে পড়লাম। মাথা ঘুরচে, শরীর ঝিম্ ঝিম্ করচে। হঠাৎ বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠে সেই পাথরের ধারেই বমি করলাম। ভগবান, এ কী হলো? দম নেবার আগে আর একবার বমি। লোকজন পাশ দিয়ে চলে যাচ্চে, মুখ ফিরিয়ে তাকাবার প্রয়োজন তাদের নেই, এমন অবিশ্রান্তই ঘটচে।

কে একজন পার হয়ে যাচ্ছিল, বলে গেল, 'এক কাণ্ডি কর্ লেও ইয়ার,—জয় বদরীবিশাল লাল কি!'

না, না, সময় নেই, সবাই গেল এগিয়ে। ওরে শ্রান্ত, ওরে ভ্রান্ত,

মহাপ্রস্থানের পথে

ওরে ভগ্ন, আর একবার উঠে দাঁড়া, কাঁধে তুলে নে ঝোলাঝুলি, ধর বাগিয়ে লাঠি ও ঘটি, অতীত শক্তি ফিরিয়ে আন্, বিদীর্ণ কণ্ঠে চীৎকার ক'রে ওঠ,—

'ব্যাঘাত আসুক্ নব নব—
আঘাত খেয়ে অচল র'ব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব
বাজবে জয়ডঙ্ক,
দেবো সকল শক্তি, ল'ব
অভয় তব শঙ্খ।'

টল্‌তে-টল্‌তে চললাম, ছুট্‌তে-ছুট্‌তে। মরণ আসচে এগিয়ে, সে যেন তাড়া করেচে পিছন থেকে! উজ্জ্বল দিবালোক মুছে গেচে, শুধু নীল অন্ধকার, আকাশটা দুল্‌চে, অর্ধমুদ্রিত কোটরগত চক্ষু দিয়ে নাম্‌চে উষ্ণ জলধারা। আমি কি পাগল হয়ে গেচি? আমি কি মাতাল? কেন এমন ক'রে পা কাঁপে? কেন সমস্ত মন প্রচণ্ড প্রতিবাদে এমন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে? জানিনে কী আশা নিয়ে চলেচি, কী পাবো সেখানে গিয়ে! সেখানে কি আমার সকল আশার পরিসমাপ্তি, সকল চাওয়ার শেষ? আমার পরম পাওনা বুঝে পড়ে নেবো তার কাছে যার আশায় এই অকাল-মরণের হাত এড়িয়ে চলেচি, যে রয়েচে আমারই প্রতীক্ষায়? আমায় কণ্ঠে দেবে পরম বাণী, কানে দেবে আত্মপ্রকাশের মূলমন্ত্র, সৌন্দর্যসৃষ্টির উৎসমুখ দেবে খুলে, শক্তি ও সাহস-বিস্তৃত হৃদয়, অফুরন্ত প্রেম ও অকৃপণ দাক্ষিণ্য, চোখে দেবে অনির্বাণ স্বপ্নালোক, বুকে অনন্ত বহ্নিক্ষুধা!

বালি-পাথরের পাহাড়, সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে নানাবর্ণে ঝলমল

করে উঠ্চে, পাশে বনগোলাপের জঙ্গল, ডালিম আর আখ্রোটের বন। তারপরেই বাঁ দিকে পথ ঘুরলো। ঘুরতেই দেখলাম বহু নীচে চামোলি শহর, লালসাঙ্গা! তার নীচে অলকানন্দা নদীর ওপারে সাদা সূতোর মতো শীর্ণ সেই মহাপ্রস্থানের পুরাতন পথটি কর্ণপ্রয়াগ হয়ে লালসাঙ্গায় এসে মিলেচে, ওই পথটি ধরে যাত্রীরা ফিরে যায়। ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর অলকানন্দার পুল পার হয়ে লালসাঙ্গার ধর্মশালায় এসে উঠলাম। বেলা তখন টা টা করচে।

কেদার, বদরী ও কর্ণপ্রয়াগের কেন্দ্রস্থল এই চামোলি। ছোট্ট শহর, কিন্তু সমৃদ্ধ। এখানে গাড়োয়াল জেলার একটি আদালত, বনবিভাগের দপ্তর, কালেক্টরী, পুলিশ, কুলী-এজেন্সী, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, বাজার, সদাব্রত ও ডাকঘর প্রভৃতি শহরের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। অকর্মণ্য যাত্রীরা এখান থেকে বদরীনাথ পর্যন্ত মূল্য দিয়ে ঘোড়া সংগ্রহ করতে পারে।

ধর্মশালায় গোপালদা ও বুড়ীদের দেখা পেলাম কিন্তু বাক্যালাপের রুচি হ'লো না। তিনি কেবল একবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও কি হ'লো দাদা তোমার ?'

কথা বলতে পারছিলাম না, কেবল কম্বলটা কোনো রকমে ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। চোখ বুজে নিঃশব্দে পড়ে রইলাম। মাটির ভিতরে যেন তলিয়ে যাচ্চি। গোপালদা সরে এলেন, গায়ে ও কপালে কিয়ৎক্ষণ ত্রস্তভাবে হাত বুলিয়ে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, যা ভেবেচি তাই, এ ত' রোদের গরম নয়, গা যে তোমার জ্বরে পুড়ে যাচ্চে! কী হবে!'

কী হবে তা সবাই জানে, গোপালদারও অবিদিত নয়; তাঁর সস্নেহ উক্তিটি বিদ্রূপের মতো কানের ভিতর বাজ্লো। কিন্তু তখন

উত্তর দেবার আর সামর্থ্য ছিল না, জ্বরে আমি অচেতন। আর আমার মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি নেই। যে প্রকাণ্ড আমাদের দল একদিন হৃষীকেশ থেকে যাত্রা করে দেবপ্রয়াগ পৌঁচেছিল, সেই দল আমাদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেচে। কেউ গেচে ফিরে, কেউ থেমে গেচে, কেউ অকর্মণ্য হয়ে কোথায় পিছনে নিরুদ্দেশ হয়ে গেচে, কেউ পড়েচে মৃত্যুমুখে! আমাদের দলের তিনজন নেই, আজ আমাকেও থেমে যেতে হ'লো। বাইশটি দিনে প্রায় সমস্ত শেষ করেছিলাম, আর মাত্র সামান্য পথ বাকি, অতি সামান্য পথ, কেবলমাত্র আটচল্লিশ মাইল, এক ছুটেই হয়ত এই আটচল্লিশ মাইল শেষ করে দিতাম, কিন্তু তা আর হ'লো না। জ্বরাক্রান্ত, পঙ্গু হয়ে এই পথের ধারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য পড়ে রইলাম। গোপালদা কেবল হাসপাতালের দিকটা দেখিয়ে দিলেন।

কোনোক্রমে সামান্য আহারাদি শেষ করে আমার এই পরম প্রিয় দলটি যাত্রার আয়োজন করলো। আমার সাড়া ছিল না, বাক্‌শক্তি ছিল না, তাদের বিদায় দেবার মতো উৎসাহও নেই, কেবল নিঃশব্দে পড়ে রইলাম। যাবার সময় চারুর-মা দিল একটু জল, গোপালদা দিয়ে গেলেন সহানুভূতি ও শুভকামনা। বলে গেলেন, 'দুঃখ করবার কিছু নেই, সবই বাবার ইচ্ছে। ফেরবার সময় এই পথেই আসতে হবে, এসে দেখি যেন তুমি সেরে উঠেচ ভাই। জ্বর একটু কমলে কিছু খাবার চেষ্টা করো।'

এটুকুও পাবার আশা করিনি, এই সামান্য মমত্ববোধের স্পর্শটুকু পেয়ে বুকের ভিতরটা উদ্বেল হয়ে উঠলো। এ লোকটাকে কোনদিন পছন্দ করিনি, আজ সন্দেহ হ'লো এ বোধ হয় আমার কল্যাণকামী। কম্বলের ভিতর থেকে মুখ বার করে শুয়েই রইলাম, তিনি ধীরে ধীরে

বিদায় নিলেন, এবং যাবার সময় আর একবার বলে গেলেন, 'তিন চারদিন ধরে তোমার মেজাজ যে রকম রুক্ষ হয়েছিল, তাতেই বুঝেছিলাম তোমার শরীর ভালো নেই।'

নির্জন ধর্মশালা, মাথার দিকে নীচে অলকানন্দার কলকল শব্দ শুনতে পাচ্চি। কাছেই কোথা থেকে একটু আধটু মানুষের গলার আওয়াজ কানে আসচে। মাথার কাছে দেখতে দেখতে অপরাহ্ণের রৌদ্র এসে পড়লো, হু হু করে বসন্তের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। সম্মুখে লাল ও শ্বেত পাথরের দুটো পাহাড় সূর্যকিরণে এক আশ্চর্য রূপ পরিগ্রহ করচে। নদীর ওপারে যে-পথটা দিয়ে আমরা এসেচি সেই পথ-রেখাটি স্বপ্নলোকের মত দেখা যাচ্চে। ধীরে ধীরে আমার রক্তরাঙা রুগ্ন ও স্তিমিত দৃষ্টি আবার বুজে এল। সর্বশরীরে জ্বরের অসহ্য যন্ত্রণা ও জ্বালা ধরেচে, আর আমার কোনো আশা নেই। মনে-মনে সকলের নিকট সজ্ঞানে বিদায় নিলাম। জন্মভূমির দিকে তাকিয়ে অভিবাদন জানালাম।

কতক্ষণ পড়ে ছিলাম মনে নেই। এক সময় উঠে পাগলের মতো ছুটে ধর্মশালার পিছন দিকের পথে নেমে এলাম। তখন অপরাহ্ণ চলেচে সন্ধ্যার দিকে, বেলা আর বাকী নেই। বালি ও পাথরের দুস্তর পথ দিয়ে সোজা নেমে নদীর তীরে এলাম। দু'চার জন সাধু-সন্ন্যাসী এখানে-ওখানে জটলা করে বসে রয়েচে। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে সবসুদ্ধ জলের মধ্যে নামলাম, স্রোত অত্যন্ত প্রবল, কিছুদূর জলের মধ্যে গিয়ে একখানা বড় পাথর আঁকড়ে ধরে ডুব দিলাম!

প্রায় আধঘণ্টা বেপরোয়া স্নান করে যখন ধর্মশালায় এসে উঠলাম

তখন শরীর একটু সুস্থ হয়েচে। বিষে বিষক্ষয় হ'লো। কোনোদিকে আর না তাকিয়ে ঝোলাঝুলি আর লাঠি নিয়ে একাকী পথে এলাম। সন্ধ্যা তখন সমাগত। তা হোক, খানিকটা পথ এখনো হাঁটা যাবে। আমি সেদিন মরীয়া।

কেমন করে কয়েকটা চটি পার হয়েছিলাম আজ আর স্পষ্ট মনে নেই। রাত্রে এক জায়গায় আশ্রয় নিলাম। পরদিন প্রভাতে পার হলাম পিপলকুঠি। পথের ধারে কয়েকটি রক্তকরবীর গাছ পাওয়া গেল। লাল ফুলের সমারোহের উপরে এসে পড়েচে নবীন সূর্যের কিরণচ্ছটা। এখানে বাঘ ভালুকের চামড়া খুব সস্তা দরে বিক্রি হয়। পিপলকুঠিতে গাড়োয়ালী মেয়েরা কম্বলের ব্যবসা করতে আসে। মধ্যাহ্নে এসে পৌছলাম গরুড়গঙ্গার চটিতে। এখানে গরুড়গঙ্গার ও অলকানন্দার সঙ্গম। গরুড়মন্দির ও সামান্য শহর পাওয়া গেল। প্রকাশ, ফেরবার পথে গরুড়গঙ্গায় এক ডুবে একটি পাথরের নুড়ি তুলে বাড়ি নিয়ে গিয়ে পূজো করলে সাপের ভয় থাকে না। গরুড়গঙ্গা থেকে পাতালগঙ্গা চার মাইল চড়াই পথ। পথটি চিড় ও পাইনের জঙ্গলে সমাকীর্ণ, ছায়াবীথির মতো। সন্ধ্যার সময় পাতালগঙ্গার চটিতে এসে আশ্রয় নেওয়া গেল। পাশেই গণেশের মন্দির, পাতালগঙ্গা গিয়ে মিশেচে অলকানন্দায়।

পরদিন সকাল থেকেই পথ হাঁটতে শুরু। সঙ্গে-সঙ্গে জনকয়েক অপরিচিত যাত্রী চলেচে। গোলাপকুঠি পার হয়ে মধ্যাহ্নে এসে পৌছলাম কুমারচটিতে। সমতল পথ, প্রাকৃতিক শোভায় চটিটি সমৃদ্ধ। নিকটে কর্মনাশা নদী। আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, কোথাও অকারণে বেশিক্ষণ থাকতে আর ভালো লাগচে

না। বরং পথে-পথে বসে বিশ্রাম নেওয়া যাবে, পথেই আমাদের যা-কিছু।

ঝড়কুলা ও সিংহদ্বার পার হয়ে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে যেখানে এসে পৌঁছলাম সে আমার আবাল্যের স্বপ্ন যোশীমঠ। অল্প-অল্প বৃষ্টি পড়চে। আবার বেশ শীত লেগেচে। যোশীমঠ নামে এই ক্ষুদ্র শহরটির খ্যাতি, এর সংস্কৃত নাম জ্যোতির্মঠ। এখান থেকে শঙ্করাচার্য্যের উত্তরধাম শুরু হ'লো। বদরীনাথের পূজারী রাওল মহাশয়ের এখানে বাসা, শীতকালে এখান থেকেই তিনি বদরীনাথের পূজা করেন। নৃসিংহদেবপ্রমুখ অনেকগুলি দেবতার মন্দির এখানে রয়েচে, সবগুলি মন্দিরই একটি চত্বরের চারিপাশে অবস্থিত। এখানে নভোগঙ্গায় স্নান অপেক্ষা দণ্ডধারায় স্নান প্রশস্ত। আসলে দুটিই অব্যবহার্য,—তালপুকুরে ঘটি ডোবে না। যোশীমঠ ক্ষুদ্র শহর বটে কিন্তু উখীমঠের চেয়ে বড়। বাজার, ডাকঘর, ছাপাখানা, সদাব্রত, বসতবাটী—কী নেই? কাছেই তিব্বত ও মানস-সরোবর যাবার পথ। অনেকেই এখান দিয়ে যান কৈলাস ও মানস-সরোবর। মাইল তিনেক গেলেই ভবিষ্যবদরী দর্শন হয়। ধর্মশালায় উঠে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম নিয়েই শীতের কাঁপুনি ধরলো, নিকটে পাহাড়ের চূড়ায় একটু-একটু সাদা তুষার দেখা গেল। তুষার সম্বন্ধে একটা ভীতি জন্মে গেচে। যোশীমঠের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর।

রাত্রি শেষে শীতার্ত দেহে একাকী যোশীমঠের নিকট বিদায় নিয়ে উৎরাই পথে নামতে লাগলাম। তিন মাইল পথ নামতে হয়, পায়ের ব্যথাটা জেগে উঠলো। তিন মাইল পথ এসে নদীর পুল পার হয়ে যখন শ্রীবিষ্ণুপ্রয়াগে পৌঁছলাম তখন সকাল হয়েচে। এখানে বিষ্ণুগঙ্গা বা অলকানন্দা ও ধবলীগঙ্গার সঙ্গম। পুরাকালে বিষ্ণু-আরাধনা করে

নারদমুনি এখানে সর্বজ্ঞ হবার বর লাভ করেছিলেন। নীলবসনা অলকানন্দার কোলে গৈরিকবসনা গঙ্গার আত্মসমর্পণ এস্থলে এক রোমাঞ্চকর নয়নাভিরাম দৃশ্য। এখান থেকে বদরীনাথ আর মাত্র যোলো সতেরো মাইল পথ।

ধবলী গঙ্গার তীরে-তীরে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বিপজ্জনক পথ; খানিকটা সমতল, খানিকটা বা চড়াই। খাড়া দেওয়ালের মতো চড়াই নয়, ধীরে-ধীরে উঠ্‌চে। কোথাও পথ সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়ে নদীর মধ্যে অদৃশ্য হয়েচে। কোথাও পড়েচে পাথর, তাকে অতিক্রম করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কোথাও পথ নেই, ঝরণার জলের উপর দিয়েই চলতে হচ্ছে। কোথাও স্তূপাকার বালি ও নুড়ি, অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলে এগোতে হয়। কাল থেকে মার্বেল পাথরের পাহাড় দেখতে পাচ্ছি, কোনটা হাঁসের পালকের মতো সাদা, কোনোটা গোলাপী, কোনোটায় নীল ও হরিদ্রার সমাবেশ। দুইদিকে শ্বেত পাথর, মাঝখানে কুলুকুলু গঙ্গার প্রবাহ। অল্প-অল্প চড়াই পথ ধরে কেবলই আমরা উপর দিকে উঠে চলেচি, আজকের চড়াইতে বুকে ব্যথা ধরচে না বটে কিন্তু ক্লান্তি আসচে—পা কন্‌কন্ করচে। জ্বর ছেড়ে গেচে, কিন্তু শরীর সুস্থ হয়নি। অর্ধাশন ও উপবাসে দেহ বেতসলতার মতো দুলচে। ঘাটচটি পার হয়ে দু'মাইল চড়াই উঠে অনেক বেলায় অবসন্ন শরীরে পাণ্ডুকেশ্বর গ্রামে এসে পৌছলাম।

গ্রামখানি মন্দ নয়, নদীর উপরেই। পাথরের খাদরি করা গ্রামের উচুনীচু পথ, ডালপালা ও গাছের গুঁড়ির তৈরি অনেকগুলি চটি, ক্ষুদ্র একটি ধর্মশালা, নিকটে যোগবদরী মন্দির। একটি ঔষধালয় পাওয়া গেল, সেখানে মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা তুক্‌তাকের কারবার। সম্মুখের পর্বতচূড়ায় পাণ্ডুরাজা বাস করতেন, মন্দিরে তাম্রশাসন-পত্র আছে।

স্থানীয় লোকেরা বোঝাতে চাইলো, এই পথ দিয়ে একদিন পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী স্বর্গারোহণ করেছিলেন, কতকলি প্রমাণোপযোগী চিহ্ন পর্যন্ত তারা দেখিয়ে দিল। আমরা স্বর্গদ্বার অবধি যাবো কিনা অনেকে প্রশ্ন করলো। শীতপ্রধান মুলুক, তাই এদিকের সাধারণ অধিবাসীরা সুশ্রী ও সুন্দর। আজকের পথের আশেপাশে বহু ভূর্জপত্রের গাছ, মাঝে-মাঝে কোনো-কোনো চটির চালাগুলি মোটা-মোটা ভূর্জপত্রের তৈরি। কোথাও-কোথাও রক্তরাঙা জবাফুলের মতো পাহাড়, কোনো পাহাড় উজ্জ্বল কালো রঙের, কোনোটা নীলাভ্রের মতো, আবার কোনো পাহাড় দুগ্ধশুভ্র,—নির্বাক বিস্ময়ে দেখে-দেখে চলে যাই। আহারাদির পর আবার পথ ধরেচি। বর্ষণোন্মুখ মেঘ মাঝে-মাঝে সূর্যালোককে আবৃত করে ভেসে চলেচে, নদীর তীর ধরে হাঁটচি, গঙ্গার ধারা আর নীল নয়, কোমল মৃত্তিকাবর্ণের। নদী এখন আমাদের দক্ষিণে। পথের নির্দেশে একই নদী বহুবার এপার-ওপার হতে হয়। যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল ঋজু-কুটিল অনন্ত উপলখণ্ডময় গঙ্গা সগর্জনে ছুটে আসচেন। পথ থেকে নেমে পাথরের জটলা পার হয়ে নদীর জল স্পর্শ করা অসাধ্য ব্যাপার, সে সম্ভব নয়। আবার নদীর সমতল ছেড়ে উপর দিকে উঠ্‌চি, অল্প-অল্প ঘিন্‌ঘিনে চড়াই, পায়ের হাঁটু কন্‌কন্ করে। কখনো-কখনো দু'চারজন বদরী প্রত্যাগত প্রসন্নমুখ যাত্রীর দেখা মিল্‌চে। সকলের মুখেই খুশী, আনন্দ ও বদরীনাথকীর্তন। কাঙালের মতো তাদের দিকে মুখ তুলে আবার এগিয়ে যাই।

লামবগড় চটি পার হলাম। পথ আস্তে-আস্তে উপরে উঠ্‌চে, কেবলই উঠ্‌চে। এবার নদীও উঠে এসেচে, মুখর তার প্রবাহ, ভীমগর্জনে নীচের দিকে ছুটচে। পাথরের সঙ্গে নদীর খেলা দেখলে আর চোখ ফেরানো

যায় না। কতবার যেতে-যেতে থামি, চোখ ভরে দেখে দেখে মনে ছবি এঁকে রাখি, নিশ্বাস ফেলে আবার চল্‌তে থাকি। নদীর অবিশ্রান্ত গতির দিকে তাকিয়ে মানুষের মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে কেন তা বল্‌তে পারিনে, কিন্তু দুরন্ত জলস্রোত শিরার রক্তে যে দোলা দিয়ে যায় তা জানি। এক জায়গায় এসে থামতে হ'লো, এমন সঙ্কীর্ণ ও গড়ানো পথ যে, বসে-বসে নামা ছাড়া উপায় নেই। বসে-বসেই নীচের দিকে লাঠি গেঁথে নদীর ধারে নেমে এলাম। এপার থেকে ওপারে যেতে হবে, মাঝখানে দড়ির পুল। এই দড়ির পুল অত্যন্ত স্বদেশী, আদি ও অকৃত্রিম। এপারের পাহাড়ের সঙ্গে ওপারের পাহাড়ের পাথরে বাঁধা মোটা দু'জোড়া কাছি, সেই কাছির সঙ্গে বাঁধা কয়েকখানা তক্তা, তার উপর দিয়ে ভয়ার্ত মহাপ্রাণী হাতে নিয়ে পার হয়ে যেতে হবে। উপায় নেই, মরেচি না মরতে আছি, চোখ বুজে কম্পিত কলেবরে ভয়ে ও সাবধানে পুলটা পার হয়ে গেলাম। পার হয়ে যে পথটি স্পর্শ করলাম তার চেহারা দেখেই ত চক্ষুস্থির। একখানি খাড়া মনুমেণ্ট, অথচ ওঠবার সিঁড়ি নেই। আর কত বাধা ও বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, বাবা বদরীনাথ? কিন্তু বাবা আছেন এখনো আট ন' মাইল দূরে, তাঁর বাবারও সাধ্য নেই, পথটা সুগম করে দেন! কী আর হবে, পাথর আর মাটির দেওয়াল আঁচড়ে, নাকখৎ দিতে-দিতে, কাৎ হয়ে, চিৎ হয়ে, বদরীনাথের ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের শ্রাদ্ধ করতে করতে, লাঠিটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে' ডন্ দিয়ে-দিয়ে অবশেষে এক সময় উপরে উঠলাম। ধন্য তীর্থ! অথচ এইটিই বাবাজির মন্দিরে যাবার রাজপথ, নান্য পন্থাঃ। এত ধৈর্য ধরে ও এতখানি কষ্ট করে যাচ্চি, গিয়ে দেখবো হয়ত একখানা পাথরের স্তূপ, কিংবা কিম্ভূত-

কিমাকার একটা কিছু ফাঁকি। তীর্থকামীর অভিসম্পাতভরা কাতরতায় বদরীনাথ চিরগৌরবান্বিত। রোগ-জরাহীন, আনন্দোজ্জ্বল, পরিচ্ছন্নদেহ ও বলিষ্ঠ যাত্রীদের উপরে বদরীনাথের দৃষ্টি নেই; মুমূর্ষু, অকালবার্ধক্য-ক্লিষ্ট, দুঃখপীড়িতদেহ, চলৎশক্তিহীন—এদের নৈলে তাঁর চলে না। এদের নিয়েই তাঁর যত মহিমা ও গৌরব। যে পথ দিয়ে তাঁর ভক্তরা আসবে সে-পথে তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন দুর্ভিক্ষ, মারীভয়, মহাসঙ্কট, অকাল মৃত্যু ও দুরারোগ্য ব্যাধি। আর্তের আর্তনাদই তাঁর পূজার মন্ত্র, মানুষের বাহ্য কলুষ আর মালিন্য নিয়ে তাঁর আনন্দ-আয়োজন। দুঃখ, দুর্যোগ ও পীড়নের মধ্যে এসে তীর্থযাত্রী আপন আন্তরিকতার পরীক্ষা দেয়, তাই বোধ হয় তাদের শারীরিক অপরিচ্ছন্নতায় বদরীনাথের পথ ও মন্দির অপবিত্র হয় না।

হনুমান চটিতে পৌঁছে সেদিনের মতো যাত্রা শেষ করলাম। প্রচণ্ড শীতের হাওয়ায় সর্বশরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপচে, আবার বরফের তীরে এসে পৌঁছেচি। আকাশ মেঘলা, টিপ্ টিপ করে বৃষ্টি পড়চে, চারিদিক অন্ধকার করে এসেচে। কাল সকালে বদরীনাথে গিয়ে পৌঁছবো, যাত্রা শেষ হবে। পাশেই হনুমানজির প্রাচীন মন্দির, কিন্তু ভিতরে ঢুকে দর্শন করবার আর সামর্থ্য নেই। বাঁ-হাতি পাকা ধর্মশালাটার দোতলায় এসে উঠলাম। ভিতরে-বাইরে তখন বহু যাত্রীর সমাগম হয়েচে।

'ওমা, বা'ঠাউর যে! এলে?'

ফিরে দেখি, চারুর-মা। বললাম, 'এই যে, ভালো ত সব? গোপালদা কই?'

ভিতর থেকে শীতার্ত কণ্ঠে সানন্দে উত্তর এল, 'এসো দাদাভাই.

তামাক ধরাচ্চি। সমস্ত পথটা তোমার কথা ভাবতে-ভাবতে···ভাগ্যি এ বেলায় বেরিয়ে পড়িনি !"

আর সবাই বললে, 'তুমি বাবা সন্নিসি নও, সন্নিসি হ'লে মানুষের ওপর এত টান্ হ'তো না !'

'তথাস্তু।' বলে গোপালদার পাশে গিয়ে কম্বল বিছোলাম। ভয়ানক ঠাণ্ডায় তখন হাত-পা জড়িয়ে যাচ্চে। চারিদিকে শীতজর্জর সন্ধ্যা নেমে এসেচে।

*

* *

"যাত্রা কর, যাত্রা কর যাত্রীদল",
উঠেছে আদেশ,
"বন্দরের কাল হ'ল শেষ।"

প্রত্যূষের তরল অন্ধকারে কাঁপতে কাঁপতে সবাই নামলো পথে। মেঘে-মেঘে দিগ্‌দিগন্ত ঘনতমসাবৃত, বৃষ্টির ফোঁটাগুলি চাবুকের মতো সপাসপ গায়ে এসে আঘাত করচে। বাঁ-দিকে নদীর ভাঙন ঘুরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি পথ উত্তর দিকে চলে গেচে। হিমকণাযুক্ত তীক্ষ্ণ বাতাসে বুকের রক্ত পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্চে, দাঁতের সঙ্গে দাঁত ঘষে একরকম শব্দ হচ্চে। আবার সেই কেদারনাথের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বন-বালিকার মতো লতা-পুষ্পালঙ্কার-শোভিত ঝরণাগুলি যাত্রীদের সাদর অভিনন্দন জানাতে পথের উপরেই নেমে এসেচে। কোথাও অরণ্যের আর দেখা মিল্‌চে না, এদিকে তাদের আর আশ্রয় নেই, এদিকে তুষারের দেশ,—কোথাও কোথাও দরিদ্রবেশধারী কয়েকটি গাছপালা স্বদেশী নেতার মতো জটলা করে তুষারের অত্যাচার সম্বন্ধে ভীরু প্রতিবাদ

জানাচ্চে। তাদের উপর দিয়ে চল্‌চে দুর্যোগের ঝটিকা। নদীর প্রবাহ কোথাও লুপ্ত হয়েচে, উপরে আস্তৃত হয়েছে জমাট বরফের শয্যা। দুই তীরের কৃষ্ণকায় পর্বতের গা বেয়ে সাদা তুষারের ধারা নেমে এসেচে, যেন ঘনশ্যাম বনমালীর গলায় দুল্‌চে মল্লিকার মালা।

প্রভাত হয়েচে, সূর্যালোকহীন প্রভাত। প্রভাত কিংবা গোধূলি ঠিক বোঝা যায় না। সৃষ্টির আদিযুগে যেন উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি, তখন সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র ছিল না, এমনি একটা অনৈসর্গিক অনুজ্জ্বল আলোয় বসে বিধাতা আপন কাজ করে গিয়েচেন। এ আলো যেন জীবনের শেষ প্রহরগুলির মতো স্তিমিত ক্লান্ত, অন্তিমদিনের মতো ঝাপ্‌সা এবং নিরানন্দ। স্থবিরত্বের চেহারা বোধ করি এমনিই। আজ আমাদের শেষ যাত্রা, শেষ খেয়া, শেষ পথের হিসাব। যে প্রকাণ্ড দল নিয়ে একদিন বেরিয়েছিলাম তাদের কথা ভাবচি, তাদের অনেকেই নেই, অনেকেই গেচে থেমে, একজন বাচ্চা ঘোড়ায় যেতে-যেতে পা পিছ্‌লে এক মাইল নীচে নদীর গর্ভে চিরদিনের মতো অদৃশ্য হয়ে গেচে। যারা আজো সঙ্গে আছে তাদের দিকে তাকালে কান্না পায়। কেউ আমাশয়-ব্যাধিগ্রস্ত, কারো জ্বর, কারো কানে লেগেচে তালা, চোখ গেচে খারাপ হয়ে, কেউ আর কথা বলে না, কারো মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা যাচ্চে, কেউ পরনের কাপড় ছিঁড়ে পায়ের তলায় ফালি বেঁধে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁট্‌চে। কিছুদূর যাই, খানিকক্ষণ বসি, পিছনের পথের দিকে বারে বারে তাকাই। কিন্তু কিছু ভাবতে গেলে মাথার যন্ত্রণা হয়, মস্তিষ্ক-বিকৃতির ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াই, আবার এগিয়ে চলি। ঘাড় আর সোজা হয় না, মাথা উঁচু হয় না, আপন পদক্ষেপের দিকে তাকাই আর হাঁটি।

'মেরি লাল ?'

উদাসীন দৃষ্টিতে মুখ ফেরাই, কতবার শুনেচি এমনি অনড় যাত্রীর কাতর কণ্ঠ, নিরুত্তরে আবার মুখ ফিরিয়ে চলে গেচি।

'আওর কেত্‌না রাস্তা বা, মেরি লাল?'—একটি স্ত্রীলোক ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো। মুখ দিয়ে তার ফেনা নির্গত হচ্চে, সঙ্গে ছিটা-ছিটা রক্ত। হাতে রিভল্‌বার থাক্‌লে ওর যন্ত্রণা শেষ করে দিতাম!

'থোড়াই হ্যায় মায়ি।' বলে আবার এগোই। পথের ঠিক পরিমাণটা বলিনে, শুন্‌লে হয়ত ওর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া এখনি বন্ধ হয়ে যাবে। পথের দূরত্ব সম্বন্ধে কোনো শ্রান্ত যাত্রীকে ইঙ্গিত করতে নেই, তার উৎসাহ ও শক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

কয়েকজন মাত্র সারবন্দী হয়ে চলেচি। পথ আজ অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন, কোথাও-কোথাও বালুময় কিনারা, পথ নদীর মধ্যে ধ্বসে গেচে,—অগাধ নীচে নদী। ভয়ে পা কাঁপচে। কোথাও কয়েক ইঞ্চি মাত্র কিনারা, কাৎ হয়ে পাহাড়ের গায়ে পিঠ ঘেঁসে চোখ বুজে পার হচ্চি, কেউ পিছন থেকে এক-একবার প্রাণভয়ে আর্তনাদ করে উঠ্‌চে, একটিবার মাত্র পা ফস্‌কে গেলেই—ব্যাস্‌, আর টাল্‌ সাম্‌লানো যাবে না, তুষারময় নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে হবে।

কিছুক্ষণ এমনি করে হাত্‌ড়ে-হাত্‌ড়ে আবার একটু ভালো যায়গায় এসে পৌছলাম। কাছেই যৎসামান্য একটি পাহাড়ী বসতি। মেয়েরা পিঠে কাঠের বোঝা নিয়ে বদরীনাথের দিকে রওনা হচ্চে। কেদারের মতো বদরীনাথেও জ্বালানি কাঠ মেলে না, দক্ষিণের বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে স্ত্রী-পুরুষে পিঠে বেঁধে নিয়ে যায়, এক আনায় মোট এক আটি বিক্রি করে। তাদের গতিবিধির দিকে তাকিয়ে মনে হ'লো পথ ফুরিয়ে এসেচে।

ভূত যখন ছাড়ে শেষ দৌরাত্ম্য দেখিয়ে যায়। আবার লাগ্‌লো

প্রাণঘাতী চড়াই। চড়াই, চড়াই আর চড়াই। চল্‌তে-চল্‌তে একবার দাঁড়াই, বুকের মধ্যে কেমন একটা বিশ্রী শব্দ হতে থাকে, কানের মধ্যে বাজে জলতরঙ্গের মতো একটা অস্বাভাবিক কোলাহল।

তারপর ?

তারপর স্বপ্ন দেখচি। অর্ধনিদ্রার আবেশে জেগে উঠ্‌লো একটি রূপলোক, মায়াময় বিচিত্র অমরাবতী,—সম্মুখে দূরে একটি বিপুল-বিস্তৃত তুষারময় প্রান্তর, তারই একান্তে কুয়াশায় ঢাকা একখানি গ্রামের অস্পষ্ট চিত্র, মধ্যস্থলে মন্দিরের একটি স্বর্ণচূড়া, পদ-প্রান্তে স্রোতস্বিনী জাহ্নবালা !

নিশ্চয়, নিশ্চয় বেঁচে আছি। বুকে এখনো আছে প্রাণচিহ্ন, এখনো শিরায় আছে শেষ রক্তবিন্দু, চক্ষু এখনো নিঃশেষে অন্ধ হয়নি ; এই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাত, এই পীড়ন-জর্জর চরণ, এই শুষ্ক নীরস দেহ, এই ভগ্ন অবসন্ন হৃদয়—এ আমার, এ আমিই !

"দুর্জয়ের জয়মালা
পূর্ণ করে মোর ডালা"

জয় বদরী-বিশাল-কি জয় !

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯।

মহাকালের জপের মালায় আজকের দিনটি নেই, আজকের এই হিমকণাময় কুয়াশাভরা প্রভাতটি আমাদের পরমায়ু থেকে বিচ্ছিন্ন, মৃত্যুর অন্ধকার ঠেল্‌তে-ঠেল্‌তে আমরা একটি নূতন লোকে উত্তীর্ণ হয়ে এসেচি। তাই প্রথমেই মনে হ'লো, আমরা বুঝি বেঁচে নেই, এ বুঝি বা একটা নির্দয় প্রলোভন, অমর্ত্য মরীচিকা।

দূর থেকে বদরীনাথের ক্ষুদ্র গ্রামখানি যখন প্রথম দৃষ্টিগোচর হ'লো তখন এই কথাটিই ভেবে নির্বাক হয়েছিলাম। আনন্দ ও উল্লাস করবার শারীরিক এবং মানসিক সঙ্গতি নেই। কেমন করেই বা থাকবে? আমরা ফুরিয়ে ফতুর হয়ে গেচি নিঃশেষিত তৈলপ্রদীপের মতো। দীর্ঘ পঁচিশ দিনের যে দুঃখময় ইতিহাসটা আমাদের পিছনে পড়ে রইলো, তাকে আমরা ভুলেই গেচি, আজ আমাদের যাত্রার শেষ, দুঃখ-দহনের নিবৃত্তি। যে-পদচিহ্নময় পথ একদিন গ্রামের সীমা অতিক্রম করেছিল, পার হয়েছিল নদী ও অরণ্য, উত্তীর্ণ হয়েছিল দেশ-মহাদেশ, আজ সেই পথ প্রসারিত হয়েচে বিশ্বের দিকে; আমাদের সেদিনের সামান্য তীর্থযাত্রা আজ বিরাটের পদতল স্পর্শ করেচে। মন বললে, তুমি এই? এই তোমার রূপ?—যার জন্যে এলাম সে ত' মন্দিরে নেই, সে যে আমার আছে পথে-পথেই! সামান্য মন্দিরে তুমি ত বন্দী নও।

গঙ্গার পুল পার হয়ে ঢুকলাম গ্রামে। গ্রামের নামও বদরিকাশ্রম; কেউ বলে বদরী বিশালা, কেউ বা নারায়ণাশ্রম। প্রথমেই বাঁ-হাতি

ছোট ডাকঘর। তারপরেই পথের দু'ধারে ছোট ছোট দোকান। আকাশ মেঘলা, ঝুপ্ ঝুপ্ করে বৃষ্টি পড়চে, বাতাসের বেগে ও অসহ্য ঠাণ্ডায় কোনোদিকে আর মুখ ফেরাবার উপায় নেই। তাড়াতাড়ি নির্দিষ্ট বাসায় এসে উঠলাম।

বাসাটির আভিজাত্য অল্প নয়, বেশ পাকা পাথরের দোতলা বাড়ি। দরজা, জান্‌লা, উপরে ওঠবার সিঁড়ি, সম্মুখে পাথরের খাদরি-করা প্রকাণ্ড চত্বর। এটি আমাদের পাণ্ডার বাসা-বাটী। যে পাণ্ডাকে আমরা আশ্রয় করেচি তিনি এখানে বেশ প্রসিদ্ধ, নাম-ডাক আছে। তাঁরা পাঁচ ভাই। সূর্যপ্রসাদ, রামপ্রসাদ প্রভৃতি। পুত্রের নাম পিয়ারীলাল। দেবপ্রয়াগেও এঁদের প্রতিনিধি আমাদের তত্ত্বাবধান করেছিলেন। প্রথমেই এঁদের অতিথি-সৎকারে আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। নীচের ঘরে কতকগুলি কম্বল এনে এঁরা আমাদের জন্য বিছিয়ে দিলেন, কাঠ এনে আগুন জাললেন। এই আগুন আর কম্বল সেই দুর্যোগে আমাদের জীবন দান করলো। সূর্যপ্রসাদ এবং রামপ্রসাদের মতো এমন ভদ্র ও সদালাপী পাণ্ডা তীর্থস্থানে অতি বিরল। প্রায় প্রত্যেক বাঙালী এবং হিন্দুস্থানী যাত্রীই এঁদের বাসাবাটীতে এসে ওঠেন।

দুর্যোগ ও ঠাণ্ডায় অকর্মণ্য হয়ে সমস্ত দিন ঘরের ভিতরে অতি অস্বস্তিতে কাট্‌তে লাগ্‌লো। মাছি নেই, কিন্তু কাপড়চোপড় ও কম্বলে পোকার ভয়ানক উৎপাত। আহারাদি তথৈবচ। রান্নাবান্নার জায়গাও নেই, সুবিধাও নেই, শক্তিও নেই—অতএব অম্‌রা সিংয়ের মারফৎ পুরি আনাতে হ'লো। ধন্য পুরি! পুরিই সর্বদেশে অগতির গতি।

কোথা দিয়ে কাট্‌লো অপরাহ্ণ, কোন্ পথ দিয়ে এল সন্ধ্যা। বাইরে

টিপ্-টিপ্ করে তখনো বৃষ্টি পড়চে, বাতাস মাঝে-মাঝে দরজা-জান্‌লা কাঁপিয়ে ছুটচে, বন্ধ ঘরের ভিতর আগুনের চারিদিকে আমরা কয়েকজন ঘিরে বসে গল্প করচি, গোপালদা গুটি-গুটি উঠে তামাক টান্‌চেন। বামুন-বুড়ী পথ থেকে রোগ কুড়িয়ে এনে একপাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে নির্জীব হয়ে রয়েচে এবং সেই সুবিধা নিয়ে দুর্দম শক্তি কঙ্কাল-দেহ চারুর-মা শুরু করেচে তার গৃহপালিত গোরুর গল্প। ধীরে ধীরে রাত্রি নিশুতি হয়ে এল।

পরদিন প্রভাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা সকলেই বিস্মিত হলাম। রাঙা রোদে চারিদিক হাসচে। আকাশ পরিচ্ছন্ন নীল। আশপাশের পাহাড়-গুলির মাথায় স্তূপীকৃত বরফ রৌদ্রালোকে ঝলমল করচে। নদীর ওপারে সমতল জায়গাটুকুতে চাষের কাজ চল্‌চে, কোথাও কোথাও সামান্য বৃক্ষলতা বাতাসে মাঝে-মাঝে আন্দোলিত হয়ে উঠচে, আমরা পরম তৃপ্তিতে চারিদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখলাম। এই রৌদ্রময় অলস দিনটি রেখে-রেখে উপভোগ করার মত সৌভাগ্য হবে এ আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। মানুষের ভাগ্য-বিপর্যয়ের পর যেমন সুদিন আসে, আজকের এই সুনির্মল আলোকোদ্ভাসিত দিনটি তেমনি আমাদের উপরে বিধাতার আশীর্বাদের মতো নেমে এসেচে। আজ সকালবেলা উঠে হাঁটতে হয়নি, সমস্ত শরীর বিশ্রাম পেয়েচে। কোমল উষ্ণ রোদে চক্ষু বুজে বসে রইলাম।

মন্দির ও ঠাকুর দর্শনের আগ্রহ আমার নেই শুনে অনেকেই চোখ কপালে তুলে নানা মন্তব্য করে বসলো এবং যখন শুন্‌লো দেবমূর্তির সম্বন্ধে আমার কোনো মোহ অথবা কৌতূহল বিন্দুমাত্রও নেই, পূজাও দেবো না, মুক্তিও চাইবো না—তখন তাদের সমস্ত চেহারাই গেল বদ্‌লে।

'কিছু না হোক, পেন্নামও ত একটা করবে বাছা?'

'কাকে?'

'কা'কে! গা জ্বলে যায় বাছা তোমার কথা শুন্‌লে। তা হ'লে বলো বাপ-পিতামো'র মুখে একটু জলও দিতে যাবে না?'

ব্রহ্মকপালীতে এখানে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করা বিধি। জনশ্রুতি, স্বর্গীয় পিতৃপুরুষগণ স্বর্গদ্বার থেকে অঞ্জলি প্রসারিত করে উত্তর-পুরুষের নিকট এইস্থলে পিণ্ড গ্রহণ করেন। গৌরীকুণ্ডের মতো এখানেও একটি উষ্ণ জলধারা আছে, যাত্রীরা অতি আরামে সেই জলে স্নান করে! পথের ধারে আর একস্থলে আছে একটি ঈষদুষ্ণ ঝরণা, এই জলে স্নান করলে শরীর সতেজ হয়ে ওঠে, সুতরাং এর প্রতিই যাত্রীদের আগ্রহ সকলের চেয়ে বেশী। গঙ্গায় একটি লোককেও স্নান করতে কিংবা জল ব্যবহার করতে দেখা গেল না। তুষারাচ্ছন্ন গৈরিকবেশা গঙ্গাকে স্পর্শ করার মতো দুঃসাহস কারো নেই।

স্খলিত দেহ, নগ্ন পদ, মলিন পরিচ্ছদ, বীতস্পৃহ উদাসীন মন,—এক সময় ধীরে-ধীরে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। জাতি-নির্বিশেষে যাত্রীর দল ভিতরে কোলাহল জুড়ে দিয়েচে। আজ সবাই এসে পৌঁছেচে তাদের পরম লক্ষ্যে, মুখে ফুটেচে তৃপ্তির হাসি। কারো শরীর রুগ্ন, কেউ ক্ষত-বিক্ষত, কেউ হাঁটচে খুঁড়িয়ে, কেউ বা ভগ্ন-কণ্ঠ—তা হোক, আপন-আপন ললাটে তারা জয়টিকা পরেচে। মন্দিরের ভিতরে অন্ধকার, নানা অলঙ্কার ও আভরণে আবৃত বদরীনাথকে স্পষ্ট করে দর্শন করা এক দুরূহ ব্যাপার। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুর মূর্তি, আশেপাশে ছোট ছোট দেব-দেবী। মূর্তিটি ছোট। সম্মুখে অন্ধকারে ঘৃতদীপ জ্বলচে, নিকটেই অন্নভোগ থরে-থরে সাজানো। শ্রীক্ষেত্রের মতো এখানের অন্ন সম্বন্ধে স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যের ভেদাভেদ নেই।

এতদিনের পথশ্রম এত সামান্যতেই আজ শেষ হয়ে গেল। দুঃখ,

পীড়ন, কাতরতা, উপবাস ও পথশ্রম, এত কৌতূহল, ব্যথা-বেদনা ও আয়োজন—সমস্ত এসে থাম্‌লো এক প্রস্তর-মূর্তির পদপ্রান্তে! কত মৃত্যু-মহামারী, কত ক্লেশ ও উৎপীড়ন, কত পথের কত ঘটনা ও সংঘাত—আজ কি তার কোনো মূল্য নেই?

কে বলেচে মূল্য নেই। কত যুগ-যুগান্তর, কত কাল-কালান্তরব্যাপী লোকপ্রবাহ অবিশ্রান্ত ব'য়ে এসেচে এই বিরাটের তীরে, কোটি কোটি পিপাসার্ত হৃদয় মুক্তি বাসনায় বিগলিত অশ্রুতে ভেঙে পড়েচে এর চরণপ্রান্তে,—আজ আমার মতো নগণ্য মানুষের শিথিল সন্দেহ আর অবিশ্বাসবাদে তার মূল্য কি যাবে ক'মে? এত বড় অহঙ্কার ত আমার নেই!

চারিদিকে একবার তাকালাম। সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীগুলির ভিতর আমার কেমন একটা অদ্ভুত আন্দোলন জেগে উঠেচে। এরই নাম কি নাস্তিকের আত্মগ্লানি? এ'কেই কি বল্‌ব অবিশ্বাসবাদীর অবচেতন প্রতিক্রিয়া? কিন্তু ঘুচে যাক্‌ আমার প্রকৃতিগত অহঙ্কার, মুছে যাক্‌ আমার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নিষ্ফল দম্ভ,—আমি এদেরই একজন, এদেরই মতো ভক্তিরসের প্লাবন-বন্যায় আমিও ভেসে যেতে চাই। তাদের সকলের সম্মিলিত প্রার্থনার ভিতরে নিজের কণ্ঠ মিলিয়ে আমারো বলতে ইচ্ছা হ'লো, হে দেবাদিদেব, আমার সন্দেহ আর অবিশ্বাস দূর করো, দূর ক'রে দাও কিছু জঞ্জাল! হে পরশরতন, যত মালিন্য, যত কুরূপ, যত বিরূপতা, যত কিছু আবরণ,—তোমার স্পর্শে যেন সব সুন্দর হয়ে ওঠে। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে যারা তোমার দর্শন-কামনায় ওই দুর্যোগ-দুর্গম পথের ভিতর দিয়ে দলে দলে এসেচে, মহাকালের স্রোত-তাড়নায় দলে দলে যারা অদৃশ্য হয়ে গেচে, হে ঠাকুর, যুগ-যুগান্তরের সেই কোটি-কোটি

অগণ্য আর নগণ্য নরনারীর মোক্ষলাভের অতৃপ্ত বাসনা আমার এই তৃষাতুর হৃদয়ে আশ্রয় করেচে,—তুমি এ'কে মুক্তি দাও! অবিশ্বাস নয়, সন্দেহ নয়, মোহ নয়,—আমি সেই আবহমানকালের হিন্দু, সেই চিরন্তন হিন্দুকুলে আমার জন্ম, আমার শিরার রক্তে হিন্দুর সেই আদিম শুচিতাবোধ,—তোমার চরণের তলায় আমিও যেন দলিত হই, ধন্য হই, কৃতার্থ হই।

ভারাক্রান্ত মনে আবার পথ পার হয়ে এসে বাসার ধারে বসলাম। নীল আকাশে রৌদ্র ঝলমল করচে, দুই ধারের ফেনশুভ্র তুষারময় পর্বত-চূড়াগুলিতে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে অপরূপ শোভা বিকীর্ণ করেচে, মহাযোগীর আলম্বিত জটার মতো বরফের ধারাগুলি ঝরণার আকারে নীচে নেমে এসেচে। দূরে মাঝে-মাঝে বেজে উঠ্‌চে মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টা। ওপারের পাহাড়ের নীচে একখানি সরকারি বাংলো, তারই পাশে কোমল সবুজ চাষের জমি। তিন চার মাসের মধ্যে যেটুকু ফসল উৎপন্ন করা যায়,—তারপরেই শরৎকাল থেকে আবার এ রাজ্য ধীরে-ধীরে বরফের গর্ভে সমাধিস্থ হয়ে যাবে; গ্রামবাসীদের নেমে যেতে হবে নীচে। বদরীনাথের মন্দির অদৃশ্য হবে, পূজারী রাওল মহাশয় গিয়ে বাস করবেন যোশীমঠে, সেখান থেকেই শীতকালে তিনি বদরীনাথের উদ্দেশে পূজা নিবেদন করবেন।

'দাদা?"—করুণ কণ্ঠ কেঁপে উঠলো আমার কানের পাশে।

মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। সে-কণ্ঠস্বর আমি আজো ভুলিনি।

'এসেচেন আপনি! ভালো আছেন ত?'

ব্রহ্মচারীকে সহসা চিনতে পারলাম না। চেন্‌বার উপায়ও নেই। রুক্ষ শীর্ণ দেহ, শীতশুষ্ক আটফাটা মুখ, দুই পায়ে বীভৎস গলিতক্ষত,

হাত-পা ভয়ানক ফুলো,—হাঁ করে নিশ্বাস টান্‌তে টান্‌তে পাশে এসে বসলো। বললে, 'ক'দিন জ্বরে ভুগ্‌চি। আর এই পা···কী যন্ত্রণায় যে দিন কাটচে!'—চোখে তার জল এল।

'পায়ে অমন হ'লো কি করে?'

'মাছির কামড়ের ঘা...দাদা, আপনার কাছে আমার শত অপরাধ, আপনাকে ত্যাগ করেই আমার এই শাস্তি। ক্ষমা করুন আমাকে।'

ডান্‌ পায়ে তার একগোছা ছেঁড়া চুল আর কড়ি বাঁধা, সেইদিকে একবার তাকিয়ে বললাম, 'ক্ষমা করবার ত কিছু নেই। তুমি যে একদিন আমাকে ছেড়ে এসেছিলে সে-কথা ভুলেই গেচি।'

এ-কথা আমার মিথ্যা নয়। যে ব্রহ্মচারীর প্রতি সেদিন মমতায় ও স্নেহে অন্ধ হয়েছিলাম, যাকে ছাড়তে গিয়ে বুক ভেঙে গিয়েছিল, আজ তার সম্বন্ধে আমার কোনো চেতনাই নেই, মনের দেউল আমার ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেচে। ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে আমার হৃদয় আজ নিতান্তই উদাসীন।

'ভাবচি এই পা নিয়ে কেমন করে আবার এই হিমালয় পার হয়ে যাই... আর বোধ হয় বাঁচবো না।'

বললাম, 'মরবে ত সবাই একদিন, ব্রহ্মচারী!'

ব্রহ্মচারী কিয়ৎক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর বললে, 'আপনার আশাতেই আমি এখানে রয়েচি আজ চার দিন, রোজ দু'একবার আপনাকে খুঁজতে বেরোই, আপনি এসে পৌছলেন কি না। জানি আমার সব দাবিই আপনি পূরণ করবেন।'

আবার সে বললে, 'উপবাস করতে-করতে এসেচি, উপবাস করতে-করতেই যাবো, কিন্তু রামনগর থেকে বৃন্দাবন পর্যন্ত ট্রেন-ভাড়াটা না হ'লে চলবে না···আমি শুধু আপনার ভরসাতেই—'

মুখ তুলে তাকাতেই সে পুনরায় বললে, 'যদি কিছু ভিক্ষা দেন।'

এতদিন নিজের আগ্রহেই ব্রহ্মচারীর ব্যয়ভার বহন করেছিলাম কিন্তু সে-হৃদয় আজ আমার বেঁচে নেই। তার করুণ প্রার্থনায় হঠাৎ নির্দয় হয়ে উঠলাম, বললাম, 'সঙ্গে আমি জমিদারি ত বেঁধে আনিনি!'

মুখখানা তার দেখতে-দেখতে অপমানে, ভয়ে ও নিরুপায়ে শাদা হয়ে গেল। দুর্বল ও রুগ্ন দেহ তার এ আঘাত সইতে পারলো না, পাথরে সে হেলান্ দিল। বললাম, 'আমি দান করতে আসিনি, পুণ্য করতেও না, ভিক্ষে আমার কাছে মিল্‌বে না।'

'সামান্য কিছু...অন্তত আনা আষ্টেক পয়সা—?'

কঠিন কণ্ঠে বললাম, 'না।'

ব্রহ্মচারী আর কিছু বললে না, শুধু নিঃশব্দে তার অকর্মণ্য পা দু'টো সাবধান করে হেঁট হয়ে নমস্কার করলো, তারপর অতি কষ্টে উঠে আস্তে-আস্তে চলে গেল। ব্রহ্মচারীর কাহিনীর এইটুকুই পরিশিষ্ট।

এও ত জীবনের আর একটা চেহারা। যার কাছে আঘাত পাই, যে করে তাচ্ছিল্য ও অনাদর, তাকে জয় করে করতলগত করবার জন্য মন যায় ছুটে। আবার যেখানে আমারই কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, আমাকে অবলম্বন করে যে বাঁচতে চায় তার প্রতি আমার নির্দয় অবহেলা, নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য। জীবনের গতি সোজা দিকে নয়। ঈশ্বর উদাসীন বলেই তাঁকে পাবার জন্য আমাদের এত আগ্রহ, এত ব্যাকুলতা। দেবতা কথায়-কথায় আমাদের করতলগত হলেই তাঁর মূল্য যেত কমে, আমাদের কামনা ও কৌতূহল যেত থেমে। প্রেমেরো দুই দিক। একদিকে একজনকে অবলম্বন করে হৃদয় রঙে ও রসে সিক্ত হয়ে উঠে, প্রেমকে কেন্দ্র

করে মানুষের হয় আত্মবিকাশ; অন্যদিকে আমরা ছুটি তার পশ্চাতে যাকে পাইনে, যাকে পাওয়া যায় না। বহু মানুষের মধ্যে আমরা চির-ঈপ্সিত মনের মানুষকে খুঁজে-খুঁজে চলে যাই, বহু জীবনের ঘাটে-ঘাটে তাকে হাতড়াই, নিষ্ফল হয়ে ঘুরি-ফিরি।

গ্রামের চেয়ে বদরীনাথকে ক্ষুদ্র শহরও বলা যেতে পারে। ওইটুকু একটিমাত্র পাথর-বাঁধানো দু'শো গজ আন্দাজ লম্বা পথ, কিন্তু তার উপরেই দু'ধারি দোকানের সারি। কাপড়-চোপড়, বেনে-মসলা, চাল-ডাল, মনিহারি, পুরি-কচুরি—অনেকগুলি দোকান। বিস্মিত হলাম এক জায়গায় একখানি ছবি ও বইয়ের দোকান দেখে। কি ভাগ্যি নাটক-নভেল নয়,—ধর্মগ্রন্থ! তার চেয়েও বিস্মিত হলাম যখন অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হ'লো চা ও পানের দু'খানি দোকান। খুশী হয়ে চা খাওয়া গেল।

শীতের হাওয়ায় গায়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে পিতৃমাতৃহীন বালকের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, সন্ধ্যার তখনো কিছু বিলম্ব ছিল। পথের দক্ষিণ দিকে কয়েকখানি 'শিলাজিৎ' ও চামরের দোকান দেখে-দেখে যাচ্ছিলাম। এ দুটি বস্তু অতি দুষ্প্রাপ্য। শিলাজতু হচ্ছে পাহাড়ের ঘাম। কোনো-কোনো বিশেষ পাহাড়ের এক অলক্ষ্য চূড়ায় আল্‌কাৎরার ন্যায় এই বস্তুটি মধু-র মতো এক জায়গায় প্রকৃতির খেয়ালে জমা হতে থাকে। মানুষ একদা এই বস্তুটি জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন করে ভাবলো, খেতে মন্দ না। চাখতে গিয়ে উদরসাৎ করলো। দেখা গেল, শরীরের পক্ষে পুষ্টিকারক ও বলবর্ধক একরূপ স্বদেশী সানাটোজেন্। অম্‌নি ছুটলো পাহাড়ে-পাহাড়ে, হিমালয়ের ঘাম শোষণ করে এনে ভরি দরে বিক্রি করতে লাগ্‌লো। ভালো এক ভরি শিলাজিতের দাম আট আনা। তার পর চামর।

হিমালয়ের তুষারদেশে 'সুরা' গাই দেখা যায়, কেউ বলে 'চামরী গাই। কঠিন বরফের ভিতরে তারা বিচরণ করে। তুষারের মতো শাদা দেহ, ল্যাজগুলি সুন্দর। ব্যস আর কি, আন্ সেই গোরুর ল্যাজ কেটে। হিন্দুর ছেলে কাট্‌লো গোরু এবং তা'র ল্যাজের সঙ্গে হাতল্ বেঁধে গৃহ-পালিত পশুপতিকে ব্যজন শুরু করলে।

বড় একখানা দোকানে উঠে চামর আর শিলাজিৎ (শিলাজতু) পরীক্ষা করছিলাম। গোপালদা আছেন পাশে, এদু'টি বস্তুর প্রতি তাঁর ভয়ানক মোহ। দর-দস্তুর করবার জন্য তিনি আমাকেই সুমুখে ঠেলে দিলেন, আমি একেবারে পাগলের মতো অনর্গল উর্দু মিশ্রিত হিন্দী ভাষা ছুটিয়ে দিলাম। দোকানে প্রচুর জটলা, স্ত্রীপুরুষের ভিড়ে দোকানদার একেবারে হকচকিয়ে গেছে। তার জিনিসপত্র ওলোটপালট করে মনের মতো ছোট চামরটি খুঁজছিলাম।

হাত বাড়িয়ে একটি চামর ধরতেই অন্যদিক থেকে আর একখানা হাত এসে তার উপর চেপে বসলো। যে-হিন্দুস্থানী মেয়েটি এতক্ষণ ঝাঁ-ঝাঁ করে সমস্ত দোকানখানাকে কথায়-বার্তায়-হাসিতে তর্কে ও দর-কসাকসিতে আলোড়িত করে তুলেছিল এ হাতখানি তারই। স্ত্রীলোক বলে' বেশি সুবিধা দিতে আমি রাজি নই, চামরখানি হাতের মধ্যে টেনে নিলাম।

'ওইটি কিন্তু আমার পছন্দ, দিন্ আমাকে।'

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে চামরটি তাঁর কাছে এগিয়ে দিলাম। ভিড়ের ভিতরে গলা নামিয়ে বললাম, 'আপনি বাঙালী?'

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, 'কী দেখে সন্দেহ হচ্চে? হিন্দী শুনে —কই, দিদিমা গেলেন কোথায়? আমাদের চৌধুরী মশাই? ও হরি,

ওঁরা দেখচি ওদিকে দোকানসুদ্ধ তুলে নিয়ে যাবেন। এ চামরটা আপনার কেমন লাগে?'

বললাম, 'বেশ জিনিসটি, ছোট-খাটো, দামও কম, দশ আনা মাত্র।'

তিনি বললেন, 'দাম বেশীও দিতে পারি যদি মনের মতন হয়। বেশ, এইটিই আমি নিলাম, কিছু মনে করবেন না। আমার ঘরে আছেন নারায়ণ, তাঁর জন্যেই—' এই বলে তিনি আবার দোকানদারের সঙ্গে শিলাজিৎ সম্বন্ধে আলাপ জুড়ে দিলেন।

নিজের হিন্দী বুলিকে সংযত করলাম, এঁর সঙ্গে পেরে উঠবো না, হয় ত এখুনি কী বলতে কী বলে বসবো,—দরকার নেই।

'আপনি এখানে কি করতে এসেচেন?'—আপাদমস্তক তিনি একবার তাকালেন আমার দিকে।

'এসেচি তীর্থে—সবাই আসে যে জন্যে।'

'তীর্থে!'—ঠোঁট উল্‌টে তিনি হঠাৎ এমন অবজ্ঞার হাসি হাসলেন যে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে গেলাম, এবং একটি মুহূর্তে আমার এই ছাব্বিশ দিনের সমস্ত তীর্থযাত্রাটাই যেন মিথ্যে হয়ে গেল। বললেন, 'তীর্থ করবার বুঝি এই বয়স আপনার? ও হরি, আপনার সাজসজ্জাও যে আধা-সন্ন্যিসির!'

কানে তাঁর কথাগুলি তিরস্কারের মতো বাজলো। একটুখানি থতিয়ে গোপালদার কাছ ঘেঁসে বসলাম। তাঁর দীপ্ত চক্ষুর সম্মুখে আমি মুহূর্তে সঙ্কুচিত হয়ে উঠেচি। দেখতে-দেখতে দিদিমা আর চৌধুরী মশাই এসে দাঁড়ালেন। সহজেই আলাপ হয়ে গেল। জিনিসপত্র কিনে সবাই উঠে পড়লাম। সঙ্গে-সঙ্গে ছিলেন পাণ্ডা সূর্যপ্রসাদ। স্বর্গদ্বার সম্বন্ধে আলোচনা উঠ্‌লো। স্বর্গদ্বার যেতে গেলে বরফের ভিতর দিয়ে দু'দিন

হাঁটুতে হয়,—মানুষের অগম্য পথ। স্বর্গদ্বারের পথ গিয়ে মিলেচে 'শতপন্থে'—এই পথের প্রথম প্রান্তে পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদী ভূতলশায়িনী হয়েছিলেন,—মহাপুরুষ এবং প্রকৃত সন্ন্যাসী ছাড়া সাধারণ মানুষ সেখানে যেতে অপারগ। এখান থেকে মাইল ছয়েক পথ বরফের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করলে বসুধারার দৃশ্য দেখা যায়। বসুধারা একটি তুষারের প্রপাত। বরফের উচ্চ চূড়া থেকে একটি বায়ুতাড়িত জলধারা অসংখ্য বিন্দুতে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, অনেকটা নিম্নগামী ফোয়ারার মতো,—তারই নাম বসুধারা। পথে দাঁড়িয়েই গল্প চল্‌ছিল, এমন সময় জ্ঞানানন্দ স্বামী—যাঁর সঙ্গে প্রথম হরিদ্বারে আলাপ, তিনিও সদলবলে এসে পৌঁছচেন,—আমাদের আলাপে তিনি যোগ দিলেন। এখান থেকে ফেরবার পথে যোশীমঠ দিয়ে কৈলাসযাত্রার একটা বাসনা আমার মনে-মনে ছিল, অতএব উঠ্‌লো কৈলাসের কথা। সকল আলাপে, সকল তর্কে ও আলোচনায়, সকল সমস্যায় যিনি অনর্গল নিজের মতামত ব্যক্ত করে যাচ্ছিলেন তিনি হচ্চেন দিদিমার নাত্‌নী,—মার্জিত রুচি, বুদ্ধিদীপ্ত কথা, অসঙ্কোচ ব্যবহার,—সকলকে অবলীলায় অতিক্রম করে তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আমাদের সকলের কাছেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। চৌধুরী মশায় জানালেন, তাঁরা গড়ে দু'বেলায় প্রতিদিন দশ মাইলের বেশী হাঁটেন না,—অল্প-অল্প হাঁটাই ভালো। আজ তিন দিন হ'লো তাঁরা এখানে এসেচেন, কাল প্রভাতে দুর্গা বলে দেশের দিকে রওনা হবেন।

বললাম, 'আমরা রোজ বারো-চোদ্দ মাইল পর্যন্ত হাঁটি।'

নাত্‌নি বললেন, 'তাহ'লে ত পথে আমাদের ধরতেও পারেন,—চলো দিদিমা, তোমার জন্যে কিছু কিনে নিয়ে বাসায় ফিরি, চৌধুরী মশাই শীতে কষ্ট পাচ্চেন। আমাদের চৌধুরী মশাইটি কেমন মানুষ জানেন?—শান্ত

শিষ্ট, গোবেচারী, রোগা-ভাঙড়ো মানুষটি, পূজো-আর্চা করে চালান, শিষ্য-সেবক আছে—আর কি বল্‌বো চৌধুরী মশাই ?'

চৌধুরী মশাই স্নেহের হাসি হেসে বললেন, 'অম্‌নি তোমার রাঙাদিদির কথাটাও বলে দাও ? আমার অবর্তমানে—'

সবাই হেসে উঠলাম। বললাম, 'কিন্তু যাই বলুন, একটি জিনিস দেখে হিংসে হচ্চে, সে আপনাদের ধবধবে কাপড়-চোপড়।'

নাত্‌নী চট করে একবার সকলের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, 'আমরা বিবাগী হয়ে ত' আসিনি, সাজসজ্জা নিয়ে এসেচি।'

কথা ত নয়, যেন চাবুক। তা বেশ, পায়ে তাঁর মোজা, সাদা জুতো, গায়ে জড়ানো পশমের একখানা বেগুনি চাদর, ঐশ্বর্যের ঘরেই তিনি লালিত। তাঁর কথালাপের ভিতর দিয়ে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারকে অতি সহজেই চেনা যায়।

গোপালদাকে নিয়ে চলেই যাচ্ছিলাম, নাতনী পাশ থেকে আর একটি অলক্ষ্য উক্তি করলেন, 'আপনারা সবাই এসেচেন তীর্থে, আমি এসেচি বেড়াতে।'

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বললাম, 'বেড়াবার দেশই বটে। আসুন গোপালদা, আর এক পেয়ালা চা খাওয়া যাক্‌।'

চা পানের পর গরম পুরি সংগ্রহ করে শীতের হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে বাসায় এসে উঠলাম। তখন পাহাড়ে-পাহাড়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নাম্‌চে। রৌদ্রের উত্তাপটুকু রৌদ্রের সঙ্গেই চলে গেচে, আবার উঠেচে বরফের বাতাস। ভিতরে আগুন জ্বল্‌চে; তারই চারিপাশে বুড়ীর পাল নিতান্ত গ্রাম্য আলাপে মত্ত। যে উচ্চাঙ্গের রুচি এবং সুর একটু আগে পথের

উপরে দাঁড়িয়ে মনে মনে সঞ্চয় করেচি, তার সঙ্গে এদের তুলনা করে হঠাৎ বিতৃষ্ণায় ভিতরটা ভরে উঠলো। জানি এ আমার অন্যায় পক্ষপাতিত্ব, কিন্তু একি নিতান্তই অস্বাভাবিক? মনে হ'লো, এই কুৎসিত কুরুচিপূর্ণ গ্রাম্য সংসর্গ ছেড়ে কোথাও ছুটে পালাই, এদের বোঝা আর বইতে পারিনে।

দলাদলি করিনে বটে কিন্তু দলের বৈচিত্র্যের দিকে মন টান্‌চে। বৈচিত্র্যের ক্ষুধা মানুষের সহজাত। বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই সে আন্তরিক আনন্দ পায়। প্রতিমুহূর্তেই সে কামনা করে নূতনতর জীবন, অভিনব চরিত্র, বিস্ময়কর ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত। শিল্পীর মন এমনি। কোথাও সে বন্ধন স্বীকার করে না। স্নেহের কাছে নয়, প্রেমের কাছে নয়, অবস্থার কাছে নয়। সব কিছুকেই সে স্পর্শ করে এবং সমস্তই সে অতিক্রম করে চলে। সামাজিক বিধি-নিষেধ, নীতি ও ধর্মের বাধা-বিপত্তি, মনুষ্যত্বের মাপকাঠি,—এ সমস্ত তার জন্য নয়। শিল্পী বাস করে এক বিচিত্র জগতে, মানব সমাজে সে এক অমর্ত্য দেবদূত।

দেখতে-দেখতে বুড়ীদের কথাবার্তা থেমে এল, এক একজন করে ঘুমিয়ে পড়েচে। ঘরের কোণে হারিকেন্ লণ্ঠনটা কমানো, একপাশে কাঠের আগুন গন্ গন্ করচে, ভিতরটা বেশ গরম হয়ে উঠেচে। পাশে গোপালদা কম্বলের তলায় কোথায় হারিয়ে গেচেন, তাঁর আর সাড়াশব্দ নেই। তাঁর ধারণা, এই বন্ধ ঘরের মধ্যেও কম্বলের ভিতর থেকে মুখ বার করলেই তিনি ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হবেন। আমারো চোখে তন্দ্রা এসেছিল।

বাইরে একটা সোরগোল শোনা গেল এবং সে কোলাহল যে একদল বাঙালীর সহজেই বুঝলাম।

'কে আছ গো, একটু আলো দেখাও না বাবা, পথটা দেখে নিই? দয়া করে একটু আলো দেখাও না বাছা, ভারি অন্ধকার।'

'কোন্ দিকে কিছুই বুঝতে পারচিনে, সেই সিঁড়িটা কোথায় গেল?'

'পিসি আবার রাতকানা, এইদিকে গো, এইদিকে, বকের মতন ঠ্যাং বাড়িয়ো না পিসি, মরবে এখুনি,—খুব জব্দ হয়েচি যা হোক। আমরা সবাই ঠিক আছি ত, হারাধনের দশটি ছেলে?—না হারিয়ে গেল কেউ?'

'কানা ছিলুম, আলো বিনে এবার খোঁড়া হলুম। ওগো, বলি ও ভালো-মানুষের দল, কে কোথায় আছ বাবা, আলো নিয়ে একটু বেরোও, আমরা ত আর বাঘের পেটে যেতে পারিনে!'

কম্বল ছেড়ে উঠে আলোটা বাড়িয়ে হাতে নিয়ে বাইরে এলাম।—'আহা এস বাবা এস, অল্প বয়সের গুণ কত!'

একজন বললেন, 'বোঝা গেল তোমার গায়ে মানুষের চামড়া আছে, এত ডাকাডাকি করচি এই শীতে—'

'এইদিকে একটু ধরুন ত আলোটা,—ইয়া, ঠিক হয়েচে। থ্যাঙ্ক ইউ।'

'ওমা, এই যে বাবা তুমিই উঠে এসেচ দেখ চি, আহা বেঁচে থাকো।'

'দিদিমা বুঝি এতক্ষণে ওঁকে চিন্‌তে পারলে?—খুব সাবধানে চৌধুরী মশাই, সিঁড়িতে হোঁচট্ খাবেন না; ওদিকে বিজয়া-দিদিরা ভাবচে আমরা বুঝি হারিয়েই গেলাম,—সত্যি বাপু, বই কিন্‌তে গিয়ে আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেল, ধর্ম-ধর্ম করেই তোমরা সব অস্থির।'

একজন বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, তোমার কি কৈলাস যাওয়া ঠিক?'

দিদিমা সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন, আলোটা তুলে ধরে বললাম, 'ঠিক এখনো বলতে পারিনে। ওটা খেয়াল।'

নাতনী লাঠি নিয়ে উঠছিলেন সকলের শেষে। মুখ ফিরিয়ে একটু গলা

নামিয়ে বললেন, 'খেয়াল নয়, বদ্‌খেয়াল! কী হবে কৈলাসে গিয়ে, দেশের ছেলে দেশে চলে যান্‌!'

অনেক দূর পর্যন্ত উঠে গিয়ে তিনি পুনরায় বললেন, 'এইবার বাসা চিন্‌তে পেরেচি, আপনি যেতে পারেন,—উঃ কী শীত, বাবারে বাবা!'

ভিতরে এসে দরজা বন্ধ করে আবার কম্বলের মধ্যে ঢুকলাম। গোপালদা চুপি-চুপি বললেন, 'সেই বাচাল মেয়েটার দল বুঝি? ও-মেয়ে স্থবিধে নয়, বসে-বসে পা নাচায়···রক্তের তেজ!'

কিয়ৎক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'কাল চলে যাচ্চি গোপালদা।'

গোপালদা ফস্‌ করে হাতটা ধরে বললেন, 'এই অসুখ শরীরে? তিন রাত্রি যে এখানে বাস করে যেতে হয় ভাই?'

মনের মধ্যে কেমন যেন একটা রুদ্ধ ক্ষোভ ও বিরক্তি ধীরে ধীরে জ'মে উঠেছিল। বললাম, 'কৈলাসের দিকেই যাবো এখন, আপনি দেশে গিয়ে বাড়িতে একটা খবর পাঠাবেন, ঠিকানা দিয়ে যাবো।'

'দাঁড়াও, এক হাত তামাক সাজি।' বলে গোপালদা উঠে বসলেন।

রাত্রে যে-ঝড় উঠেছিল, পরদিন সকালের রৌদ্রে উঠে দেখি সমস্ত শান্ত হয়ে গেচে। আকাশে আর কোনো মালিন্য নেই, দিগ দিগন্ত পরিচ্ছন্ন নীলাভায় ঝলমল করচে। যাত্রীর দল আজ ভাবতে শুরু করেচে। দেশের কথা, আত্মীয়-পরিজনের কুশল। গভীর নিদ্রা থেকে আজ সবাই জেগে উঠেচে। এবারের পালা সঞ্চয়ের। কেউ নিচ্চে তীর্থের 'স্থফল', কেউ ঠাকুরের প্রসাদ, কেউ ছবি ও বই। অনেকে পথ থেকে কাঁচা সিদ্ধির গাছ ছিঁড়ে এনে রোদে শুকোতে দিয়েচে। যাদের আর ধৈর্য নেই, তারা বসে গেচে চিঠি লেখাতে, এখানকার ডাকঘরের ছাপ দিয়ে

দেশে চিঠি পাঠাবে। আজ আর কোনো তাড়া নেই, সবাই নিচ্চে বিশ্রাম, গাল-গল্প চলচে, কেউ ঔষধপত্র সংগ্রহ করচে, কেউ খুঁজচে কাণ্ডি—তার আর হেঁটে ফেরবার সামর্থ্য নেই। মাঝে-মাঝে সূর্যপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ মধুর আলাপে ও ব্যবহারে যাত্রীদের আপ্যায়িত করে যাচ্চেন। এমন হৃদয়বান ও ভদ্র পাণ্ডা ভারতবর্ষের যে-কোনো তীর্থেই বিরল।

পূর্ণযাত্রা

পুনরাগমন

"পথের সাথী, নমি বারম্বার।
পথিক জনের লহো নমস্কার।
ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি, ওগো দিনশেষের পতি,
ভাঙা বাসার লহো নমস্কার।
ওগো নব-প্রভাত-জ্যোতি,
ওগো চিরদিনের গতি,
নূতন আশার লহো নমস্কার।
জীবন রথের হে সারথি, আমি নিত্য পথের পথী
পথে চলার লহো নমস্কার।"

তিন দিন বাস করে' ১৫ই জ্যৈষ্ঠের প্রভাতে আমরা শেষ বিদায় ও অভিবাদন জানিয়ে অখণ্ড পুণ্য সঞ্চয় করে' পরিতৃপ্ত মনে রওনা দিলাম। নষ্ট স্বাস্থ্য ও লুপ্ত শক্তি যেন কোন্ এক মন্ত্রবলে ফিরে পেয়েচি। নূতন উৎসাহ ও নব অনুপ্রেরণা, সতেজ প্রাণধারা,—এমন সুস্থ ও সহজ আর কোনোদিন বোধ করিনি। যত অস্বাস্থ্য ও ক্লেদকালিমা রেখে এলাম বদরীনাথে। স্ফীত দেহ, উল্লসিত মন, চলৎশক্তিমান দুটি পা, রক্তের উত্তেজনা ও একটি অপরিমেয় প্রাণলীলা নিয়ে চলেচি সঙ্গে। আমাদের নবজন্ম হয়েচে। প্রভাতে ঝোলাঝুলি কাঁধে নিয়ে লাঠি দুলিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে চললাম। দু' ঘণ্টায় এলাম হনুমান চটি, মধ্যাহ্নে

এলাম পাণ্ডুকেশ্বর। সন্ধ্যার পরে গিয়ে পৌছলাম বিষ্ণুপ্রয়াগ ও যোশীমঠ পার হয়ে একেবারে সিংহদ্বারে। রাত্রে শয়নের সময় হিসাবে দেখা গেল, আজ আমরা উনিশ মাইল পথ হেঁটেচি! অসীম শক্তি এখন আমাদের পায়ে।

পথ আমাদের পরিচিত, কোথায় কী আছে জানি। আপাতত লালসাঙ্গায় আমাদের ফিরে যেতে হবে, সেখান থেকে নূতন পথে কর্ণপ্রয়াগের দিকে যাবো। সকলেরই এখন তাড়াতাড়ি। তীর্থ শেষ হয়ে গেচে, পাহাড়ের দেশ হয়ে উঠেচে অসহনীয়, আরো দশ এগারো দিন আন্দাজ হেঁটে ট্রেনে উঠতে পারলে হয়—সমতল দেশ দেখবার জন্য সকলের মন হা হা করচে। আমরা প্রত্যেকদিন এখন বুঝতে পারি কোথায় সারবো মধ্যাহ্ন-ভোজন এবং কোথায় করা যাবে রাত্রিবাস। দ্বিতীয় দিন আমরা গরুড়গঙ্গায় রাত কাটালাম। সিংহদ্বার থেকে গরুড়গঙ্গা ষোলো মাইল। পরদিন মধ্যাহ্নে পৌছলাম বাবলা চটি, আহারাদির পর আবার রওনা হয়ে বিকালে লালসাঙ্গায়। তিনদিন হেঁটে এবার আমরা ক্লান্ত হয়েচি। হাঁটতে-হাঁটতে আবার কানে লেগেচে তালা, মন হয়ে উঠেচে উদাসীন, স্মৃতিশক্তি গেচে কমে। যাই হোক, খোঁজখবর করে নির্মলা তার সেই হারিকেন লণ্ঠনটা আবার উদ্ধার করে নিল। সন্ধ্যার তখনো কিছু বিলম্ব রয়েচে, লালসাঙ্গায় না দাঁড়িয়ে আবার আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। এবার পেয়েচি নূতন পথ, হরিদ্বার থেকে এই পথ এসেচে কর্ণপ্রয়াগ হয়ে। নূতন পথে দু'মাইল গিয়ে সেদিনের মতো আমরা কুবের চটিতে রাত্রির মতো আশ্রয় নিলাম। তিনদিনে হাঁটা হ'লো পঞ্চাশ মাইল পথ।

আবার প্রভাতে যাত্রা। পথে-পথে বিশ্রাম নেওয়া, গোপালদার

তামাক খাওয়া, আফিম গেলা আবার হাঁটা। দু'একজন ছাড়া বুড়ীরা উঠেচে সবাই কাণ্ডিতে, সারবন্দী হয়ে কাণ্ডিওয়ালারা চল্‌চে। সকাল বেলায় আমরা শ্রীনন্দপ্রয়াগ পার হয়ে চললাম। এখানে দেখা গেল নন্দা ও অলকানন্দার সঙ্গম। প্রবাদ, রাজা নন্দ পূর্বকালে এখানে যজ্ঞ করেছিলেন। ছোট্ট একখানি শহর। এখান থেকে গরুড়ে যাবার নূতন রাস্তা শুরু হয়েচে। নন্দপ্রয়াগে মহেশানন্দ শর্মার দোকান থেকে কয়েকখানি হিমালয়ের আলোকচিত্র সংগ্রহ করা গেল। খাঁটি শিলাজতুর জন্য এই দোকানখানি বিখ্যাত। শীত কমে গেচে, রৌদ্র উঠচে প্রখর হয়ে। কোথাও পাহাড় ছেড়ে পাহাড়ে, কোথাও বা পাহাড় থেকে পাহাড়ে নামচি। পথ এখনও অনেক বাকি; মধ্যাহ্নে এসে পৌছলাম সোনলা চটি এবং সন্ধ্যায় গিয়ে উঠলাম জয়কণ্ডীতে। মাঝখানে রইলো লঙ্গাসু চটি।

পরদিন বেলা আন্দাজ ন'টার সময় কর্ণপ্রয়াগের তীরে এসে পৌছলাম। সম্মুখে উপলখণ্ডময় বিপুল বিস্তৃত নদী, পিন্দার গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম। প্রবাদ, নদীর তীরে পর্বত-সমীপে একদা কুন্তীপুত্র কর্ণ পিতা সূর্যদেবের দর্শন পেয়ে অভেদ্য কবচাদি বর লাভ করেছিলেন। নদীর ওপারে দক্ষিণের পথ গেচে রুদ্র প্রয়াগের দিকে, বাম দিকের পথটি সোজা চলে গেচে মেহলচৌরীর উদ্দেশে। আমরা এইখান থেকে অলকানন্দাকে বিদায় দেবো। যাত্রীরা নদীর সঙ্গমে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করে।

নদীর পুল পার হয়ে সম্মুখে একটা দীর্ঘ চড়াই পাওয়া গেল। ফেরবার মুখে চড়াই-পথ বড় গায়ে বাজে। উপায় নেই, হাঁপাতে-হাঁপাতে শহরে এসে উঠলাম। বেশ বড় শহর। বড়-বড় পাহাড়ী রাস্তা, সরকারি বাংলা, হাসপাতাল, দোকান বাজার,—একান্তে একটি মান্যগণ্য ডাকঘর, পুলিশের

থানা। জল-হাওয়া চমৎকার। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা ধর্মশালার দোতলায় এসে উঠলাম। খাঁটি গরম দুধ এবং সুস্বাদু জিলিপি কর্ণপ্রয়াগের দু'টি উপাদেয় বস্তু।

যথারীতি রান্নাবান্না এবং আহারাদি। এখানে একটি বিচ্ছেদের পালা ঘট্‌লো। আমাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী, দুর্যোগ ও দুর্দিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু, পথনির্দেশক, ছোড়িদার অম্‌রা সিং এখান থেকে বিদায় নেবে। আজ মনে পড়লো, সে আমাদের আত্মীয় নয়, সে পর, তাকে চলে যেতে হবে। দেবপ্রয়াগের দিকে কোন্ এক দুর্গম পর্বতের চূড়ায় তার ছোট্ট একখানি গ্রাম। ঘরে তার পিতামাতা, ভাই-ভগ্নী এবং নববিবাহিতা পত্নী বর্তমান,—যাত্রীর দলকে মেহলচৌরীর পথে ছেড়ে দিয়ে চলে তাকে যেতেই হবে। মানুষের পরিচয় ব্যবহারে, মানুষ আত্মীয় হয়ে ওঠে ঘনিষ্ঠতায়। দুঃখের দিন, দুর্যোগের রাত যাকে নিয়ে অতিবাহিত করেচি, সে বন্ধু, সে পরমাত্মীয়, তাকে ছাড়তে গেলে বুকে বড় বাজে, মনের ভিতর থেকে প্রাণপণ শক্তিতে যেন একটা শিকড় উৎপাটন করে ফেল্‌তে হয়। অম্‌রা সিং পথের মানুষের হৃদয় জয় করেচে,—বিজয়ী সে, ভাগ্যবান সে।

যার যা সাধ্য,—কাপড়, চাদর, জামা, গামছা, কম্বল ও টাকা,—অকৃপণ হাতে তার ঝুলিতে সবাই ভরে দিল। বদরীনাথ যা পাননি তাই পেলো অম্‌রা সিং। দেবতা পান্ পূজা, মানুষ পায় প্রীতি। অম্‌রা সিং আমাদের বড় আপন, আপনার চেয়েও আপন।

এবারে ভার পড়লো আমার উপর যাত্রীদের চরিয়ে নিয়ে যাওয়ার। সঙ্গে-সঙ্গে চলেচে জ্ঞানানন্দের দল। জ্ঞানানন্দ সম্পর্কে ইতিমধ্যে নানা কথা রটেচে। অম্‌রা সিংয়ের কাছে পথ সম্বন্ধে নানা উপদেশ গ্রহণ করে

বেলা তিনটে লাগাৎ আবার আমরা যাত্রা করলাম। কথা রইলো আমি যাবো সকলের পিছনে-পিছনে! পথে তখনো রৌদ্র প্রখর হয়ে রয়েচে।

গাড়নদীর তীরে-তীরে পথ এবার একটু সমতল, নদীতে নেমে এবার সহজেই জলের তৃষ্ণা মেটানো যায়। আস্তে-আস্তে চলেচি, সকলের পিছনে-পিছনে। নদীর ওপারে কোথাও-কোথাও গ্রামের চিহ্ন দেখা যাচ্চে। নদীর জলে তখনো রোদ ঝিক্‌মিক্ করচে। সমতল পথ পেয়ে হাঁটার সুবিধে হয়েচে। গোপালদাকে আজ এগিয়ে যেতেই হবে, আগে-আগে গিয়ে চটিতে স্থান দখল না করলে, রাত্রে ভারি অসুবিধা হয়। অমরা সিং নেই, অতএব এবার থেকে আমাদেরই সব দেখে শুনে নিতে হবে।

ছেড়ে যাবার আগে গোপালদা তামাক খেতে বসলেন; পাশ দিয়ে জ্ঞানানন্দের দলের মেয়েরা ধীরে-ধীরে চলে যাচ্ছিল। সকল দলেই নারীর সংখ্যা বেশী। তারা যেন কী একটা রূঢ় আলোচনা ক'রে চলেছে।

'সারা পথ পার হয়ে এলাম, এমন ঢলানিপনা কোথাও দেখিনি মা।'

'বড়মানুষের মেয়ে মা, ওদের ঢঙই আলাদা!'

'হাঁট্‌তে যদি না পারবি, কাণ্ডি কি ডাণ্ডি কল্লেই হতো? গেরস্তর মেয়ে হয়ে হুট্ বলতেই ঘোড়ায় উঠ্‌লি, নোকনজ্জা নেই শরীরে? এদিকে ত সিঁদুর মুছে শুধু হাতে এসেচিস, এত প্রাণের মায়া কেন?'

'তাই বটে পাঁচুর-মা, এখনকার জোয়ান বয়সের মেয়ের যত বেয়াড়া ধরন।'

বুড়ীগুলো আরো অনেক কথা কইতে-কইতে চলে যাচ্ছিল।

বললাম, 'এরা কার ওপর হঠাৎ এমন প্রচণ্ড হয়ে উঠলো?'

গোপালদা বললেন, 'তোমায় বল্‌তে ভুলেচি ভাই, মনে আছে সেই ছুঁড়িকে, সেই যে বাবার ওখানে—?'

তাঁর দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকিয়ে রইলাম, তারপর বললাম, 'কার কথা বলচেন?'

'কি আশ্চর্যি, সেই চশমাপরা দিদিমা আর তাঁর বিধবা নাত্‌নী—'

'তাঁরা ত চলে গেচেন!'

'না, আজ কর্ণপ্রয়াগে দেখা হ'লো আমার সঙ্গে। মেয়েটা উঠেচে একটা ঘোড়ায়, পায়ে নাকি ব্যথা হয়েচে। আসচে তাদের দল পেছনে। আচ্ছা, আমি এখন এগোই ভাই।' বলে গোপালদা তাঁর মোটা লাঠি নিয়ে বেঁটে ভালুকের মতো অগ্রসর হয়ে গেলেন। তামাক খেয়ে তিনি পথে সাঁতার কাটতে থাকেন।

কয়েক পা পিছনে হেঁটে পথের একটা বাঁকে মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই চৌধুরী মশায়ের দলটাকে দেখতে পেলাম। একটা জটলা জমেচে। নাত্‌নী তার মাঝখানে পাহাড়ের একটা খাঁজে পা রেখে ঘোড়ায় ওঠবার চেষ্টা করচেন। একটা হাসাহাসি চল্‌চে। দূর থেকে আমাকে দেখতে পেয়ে হেসে তিনি বললেন, 'আপনি মুখ ফিরিয়ে এগিয়ে যান, নৈলে আমার ঘোড়ায় ওঠা হবে না।"

তথাস্তু। আবার ফিরে চল্‌তে শুরু করলাম। বেশ জোরে জোরেই পা চালিয়ে দিলাম। মাইলখানেক আন্দাজ একাকী চলে গিয়ে খটাখট্ শব্দে ফিরে দেখি, অশ্বারোহিণী কাছাকাছি এসে পড়েচেন। সঙ্গে-সঙ্গে আছে একটা সহিস। পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালাম। ঘোড়ার গতি মন্থর হ'লো। দড়ির রাশ দুই হাতে ধরে তিনি বললেন, 'নমস্কার!'

'নমস্কার।'

'ভালো আছেন ত? ভাবছিলাম বুঝি আর দেখা হ'লো না,—পথ ত ফুরিয়ে এল। আপনার সঙ্গে সেই বুড়ো লোকটি, তাঁকে দেখতে পেয়ে পথে তবু যা হোক একটু আশ্বস্ত হলাম। বুঝলাম, শীতের পরেই বসন্ত। খুব তাড়াতাড়ি এসেচেন যা হোক।'

'আপনাদের সব ভালো?'

'আড়ষ্ট হয়ে কথা বলবেন না। দিদিমারা আছেন অনেক পিছনে, ঘোড়ার পায়ের সঙ্গে মানুষের পা মেলে না। হ্যাঁ, সব ভালো নয়। আমার পায়ের তলায় ব্যথা, দিদিমা কিছুতেই শুনলেন না, একটা ঘোড়া জুটিয়ে দিলেন। আপনি এখন দেশে ফিরবেন ত?'

'তাই ভাবচি।'

তিনি হেসে বললেন, 'এখনো ভাবচেন? ধন্য ভাবুক আপনি; আপনার মুখের সঙ্গে বোধ হয় মনের মিল নেই! এত ভাবচেন কী? হাত পা ছেড়ে ভেসে যান্।'

যেন একটা প্রাণের ঝড় বইচে, জীবনের প্রাচুর্য। নির্বাক হয়ে চলেচি।

'আপনারা সব বেরিয়েচেন পুণ্য করতে, আমার ও সব নেই। বহু তীর্থে গেচি, কিন্তু তীর্থ করতে নয়, এম্নি।' হেসে পুনরায় বললেন, 'আমার বেশ লাগে ঘুরে বেড়াতে। এখানে আসার কিছুই ঠিক ছিল না, আসার তিন চারদিন আগে কল্‌কাতা থেকে এসেছিলাম কাশীতে দিদিমার কাছে; দিদিমা ভাসবেন তীর্থে। বললাম, আমিও যাবো। কিছুতেই কেউ ছাড়বে না। বললাম, যাবই আমি। কিসের এত বাঁধাবাঁধি? দেশ-বিদেশের নামে আমার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, সত্যি বলচি আপনাকে।'

বল্‌লাম, 'অমন হিন্দী আর উর্দু শিখলেন কেমন করে?'

তিনি বললেন, 'বাঙালীর মেয়ে, কিন্তু বাংলায় যে থাকতে পাইনে। বাংলার সঙ্গে সম্পর্ক স্বধু বই-কাগজে। ওদিকে বহুদিন ছিলাম পাঞ্জাবে। আজকাল ইউ-পি'র সব শহরগুলো আমি সারা বছর ধরে ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়াই। কিছুই ভালো লাগে না।'

রাঙা রৌদ্র উঠলো পাহাড়ের মাথায়, দিন এল অবসান হয়ে। কোনো কোনো পাহাড়ের গর্ভে এরই মধ্যে অন্ধকার জম্‌চে। নদীর একদিকে শ্বেতকরবীর জঙ্গল, আর একদিকে কাঁটাবন! নদীর দিকে তাকিয়ে মাঝে-মাঝে আলাপ চলচে।

'—এ কিন্তু আমার বিশ্রী লাগ্‌চে, আমি যাবো ঘোড়ায় আর আপনি যাবেন হেঁটে,—চ্চ্‌ চ্চ্‌, কি রে, জল খাবি নাকি?—আমার কলেবরের ভারটি ত কম নয়, ক্ষণে ক্ষণে বেচারার গলা শুকিয়ে উঠ্‌চে—' ঘোড়ার ঘাড়ে তিনি একবার হাত বুলিয়ে দিলেন।

পথের উপরে নেমেচে একটি ঝরণা, ঘোড়াটা গলা নামিয়ে তার উপর মুখ দিল। অশ্ববর নিতান্ত নিরীহ এবং নিস্তেজ, রোগা-পল্‌কা দেহ, এরা সাধারণত পাহাড়ে বোঝা নিয়ে যাতায়াত করে। মালও বয়, মানুষও বয়।

সেমালী চটি ছেড়ে সিরোলী চটির কাছাকাছি এসে পড়েচি। কথা কইতে-কইতে প্রায় পাঁচ মাইল পথ পার হয়ে গেচে! তিনি একবার পিছন ফিরে তাঁর দলের পথের দিকে তাকালেন।

'আমার ঘোড়ার নাম কী জানেন?—বিন্দু! 'বিন্দুর ছেলে' নয়! এদিকে আবার দেখুন, কী কাণ্ড! আমার সহিসটার নাম ভদ্রসমাজে অচল। কী নাম জানেন?—প্রেমবল্লভ। ভেঙে দু'খানা করেও ডাকবার উপায় নেই, বেয়াড়া শোনায়।'

দু'জনের হাসিতে পথ মুখরিত হ'লো। মোড় ঘুরতেই চটি পাওয়া

গেল। বৃক্ষচ্ছায়াময় ফলের বাগানে ঘেরা সিরোলী চটি। ঘোড়া থেকে নেমে তিনি পথের ওপারের চটিতে গিয়ে উঠলেন, আমি এলাম এপারে গোপালদার আশ্রয়ে।

রাত্রে দিদিমার সঙ্গে পরিচয় হ'লো। মেয়েরা সুবিধা পেলে সহজেই পারিবারিক গল্প টেনে আনে। তাঁদের বাড়ি কাশীতে। পরিবার-পরিজন সম্বন্ধে নানা আলাপ চল্‌তে লাগ্‌লো। তিনি নাত্‌নীর যে পিতৃ পরিচয় দিলেন তা'তে সহজেই চিন্‌তে পারলাম। নাত্‌নীর নাম রাণী।

—'মা-বাপ নেই, স্বামীর হ'লো অকাল মৃত্যু, ছেলেটি করতো সরকারি চাকরি। এখন মামার বাড়িতেই প্রায় থাকে। অল্প বয়সে এই অবস্থা হ'লো—কি ভাগ্যি যে কিছু মাসোহারা পায়।'

পরিচয়াদির পর উঠে এলাম। চৌধুরী মশায় প্রভৃতির জন্য রাত্রের আহারাদির ব্যবস্থাটাও করে দেবার ভার এল আমার উপর। খানিক পরে পোয়া তিনেক পুরি ভাজিয়ে যখন তাঁদের চটির ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম, তখন দেখি দিদিমা ও রাণী জপে বসেচেন। দাঁড়িয়েই রইলাম। বহুক্ষণ পরে তাঁদের জপ শেষ হ'লো। বললাম, 'দামটা এখুনি চুকিয়ে দিন্, তিন পো পুরি—সাড়ে সাত আনা।'

রাণী একটা টাকা বা'র করে দিলেন, ভাঙানি আমার সঙ্গেই ছিল, বাকি পয়সা ফেরৎ দিলাম। পয়সাগুলি উল্‌টে-পাল্‌টে দেখে তিনি হেসে বললেন, 'এ ছোট দোয়ানি, এ কি চল্‌বে?'

বললাম, 'চালাতে জান্‌লে অচলও চলে।'—বলে চলে এলাম।

শেষ বসন্তে নদীর রূপ গৈরিকবসনা তপঃশীর্ণা বৈরাগিনীর মতো, বালুময় তীরে তীরে তার পিঙ্গলজট রুদ্র সন্ন্যাসীর আনাগোনা। তার পর

একদিন সেই নদীর সর্বাঙ্গে নামে বর্ষা, আসে জোয়ারের বেগ, দুই কূল তার প্রাণের ঐশ্বর্যে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। জীবনেও তাই।

প্রভাতের রৌদ্রে চারিদিক আলোকিত হয়েচে। আজকের পথ আবার পর্বত গহ্বরে প্রবেশ করেচে। ধীরে-ধীরে ভটোলী চটি পার হয়েচি। কথা ছিল পথে আমাদের দেখা হবে। আমি আগে-আগে যাবো মাইল দুই এগিয়ে, তারপর তিনি দল ছেড়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে পিছন থেকে এসে আমাকে ধরবেন। অর্থাৎ, এই কথাটা আমরা দু'জনেই আন্দাজ করে নিয়েচি, আমাদের কথালাপ আর কেউ না শুনলেও চল্‌বে। সকল কথা ত আর সকলের জন্য নয়। ভটোলী চটি পার হয়ে অনেক দূরে এসে পড়েচি। দল-বল সবাই এগিয়ে গেচে। গোপালদা একবার একটু বসে তামাক খেয়ে চলে গেচেন। মেহলচৌরী পর্যন্ত পথটা শেষ করে দেবার জন্য সকলেরই পায়ে একটা তাড়া আছে। আগে ছিল পথ অতিক্রম করার একটা কঠিন সাধনা, এখন সে সাধনাও নেই, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিও নেই, আজকাল পথের প্রতি সকলেরই বিতৃষ্ণা। কিন্তু একজন মানুষ তাদের মধ্যে রয়েচে, যে, পথটাকে আর পীড়াদায়ক মনে করচে না। তার পায়ে এসেচে অক্লান্ত চলার নেশা, অফুরন্ত উৎসাহ। সে পেয়েচে একটি সহজ ও সরল গতি। সে বল্‌চে—

'পথের আনন্দ-বেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়!'

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে পিছন ফিরে দেখি, দূর থেকে আসচেন অশ্বারোহিণী। পিছনের নদী ও পর্বতের পটভূমিকায় তাঁকে ঐতিহাসিক যুগের দুর্গাবতী কিংবা লক্ষ্মীবাঈ বলে মনে হচ্চে। ঘোড়ার পিঠে বসবার ভঙ্গীটি বেশ তেজোদ্দীপ্ত। পরনে পরিচ্ছন্ন সাদা একখানি থান্, মাথায়

অল্প ঘোমটা, গায়ে সেই ঘন বেগুনি রঙের চাদরখানি। পাশে-পাশে প্রেমবল্লভ আসচে বিড়ি টান্‌তে টান্‌তে।

কাছাকাছি এসে সহাস্যে বললেন, 'ভাগ্যি আপনি যান্‌নি কৈলাসে!'

বললাম, 'ভাগ্যি আপনি এসেছিলেন বদরীনাথে!'

কথার পিঠে কথা শুনে তিনি হেসেই খুন। পরে বললেন, 'কাল রাতে খাওয়া হয়েছিল?'

হা-বিধাতা, এই কি ঘোড়ায়-চড়া মেয়ের মতো প্রশ্ন? হেসে বললাম, 'এ যে একেবারে অন্তরঙ্গের কথা!'

তিনি হেসে চুপি চুপি বললেন, 'দিদিমারা আসচেন, আপনি পা চালিয়ে আর একটু এগিয়ে যান্।'

বললাম, 'না, দিদিমার সুমুখেই আমি গল্প করবো আপনার সঙ্গে।'

'আপনি কি স্বরাজ পেয়ে গেচেন, যান্ বল্‌চি এগিয়ে'—সস্নেহে তিনি ধমক দিলেন। তিনি বুঝতে চাননা যে, চৌর্যবৃত্তি আমার প্রিয় নয়।

অতএব এগিয়ে গেলাম। যেতে যেতে আদবদরি এসে পড়লো। সুমুখেই চত্বরের উপরে নারায়ণের একটি প্রাচীন মন্দির, মন্দিরের গায়ে ধরেচে বহু ফাটল্,—তারই পিছনদিকে কাছাকাছি অতি জীর্ণ-শীর্ণ একখানি গ্রাম। কাছেই একটি স্বচ্ছতোয়া ঝরণা। লোকের ধারণা, এখানকার ঝরণার জল স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি উপকারী। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় আজ অনেকখানি পথ আসা গেচে, আরো এখনো অনেকখানি যাওয়া যাবে। নিতান্ত ক্লান্ত না হলে এবেলা আর কেউ চটিতে আশ্রয় নেবে না। দেখা গেল, আদবদরির ঠাকুর-দর্শনের জন্য সকল দল এসে এক জায়গায় জড়ো হয়েচে। বুঝলাম, সুমুখের দোকানে কিছু জলযোগ করে আবার সবাই হাঁটতে শুরু করবে। সুতরাং আবার অগ্রসর হলাম।

অগ্রসর হলাম বটে কিন্তু আজ সকাল থেকে এই নদী, আকাশ, পর্বত ও দূরের গ্রামগুলির নিকট ইঙ্গিত পেয়ে ভিতর থেকে মহাকবির কবিতার কয়েকটি ছত্র স্বত-উৎসারিত হচ্চে—

'দাও আমাদের অভয় মন্ত্র, অশোক মন্ত্র তব।
দাও আমাদের অমৃত মন্ত্র, দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যু-তরণ শঙ্কা-হরণ দাও সে মন্ত্র তব!'

অতীত তিরিশটি দিনের সঙ্গে এখনকার দিনগুলির আর মিল নেই, আবার উত্তীর্ণ হয়ে এসেচি নূতন আলোয় ও নব অধ্যবসায়ে। জীবনের গতি এমনি। আবার সে পেয়েচে একটি নূতন বেগ। আজ ভাবচি চিত্তধর্মের কোনো নির্দিষ্ট নীতি নেই, চিত্তলোকের কামনার কোনো বাঁধাধরা পদ্ধতি নেই, নিজের আনন্দের পথ সে নিজেই নির্বাচন করে নেয়, সংস্কারের বাধায় সে আপন উৎসকে রুদ্ধ করতে রাজি নয়। আজ আমার মন তাই বন্ধনহীন পক্ষ বিস্তার করে উড়েচে আকাশে-আকাশে।

'কী ভাবচেন?'

মুখ ফিরিয়ে বললাম, 'এই যে, আসুন। ভাবচি আপনার চাদরখানির রং বেগুনি না হয়ে সবুজ হ'লে কেমন হতো!'

'কী বললেন?'

'বল্‌চি যে আপনার ঘোড়াটা নিতান্তই হাঁটে কিন্তু দৌড়য় না।'

'দৌড়য় না বলেই রক্ষে। দৌড়লে আমার কাহিনী অন্য রকম হ'তো।'

'কী রকম ?'—বললাম।

তিনি বললেন, 'দিদিমা বল্‌ছিলেন, ঘোড়ায় চড়েচিস্‌ বটে রাণী, কিন্তু ছুটিস্‌নে যেন ভাই। অর্থাৎ, ঘোড়াটা আমাকে নিরুদ্দেশে না নিয়ে গিয়ে ঠিক জায়গায় যেন পৌছে দেয়। আমি ত আর সওয়ার নই, আমি হচ্চি এর বোঝা।'

তা বটে। বললাম, 'এবেলা কতদূর যাবেন ?'

'চলুন না যতদূর যাওয়া যায়। দিদিমার পায়ে আবার একটা অসুখ আছে, বেশি পথ হাঁটলে পা ফুলে ওঠে। চৌধুরী মশায়েরও শরীর খারাপ।'

নানা আলাপ চল্‌তে লাগ্‌লো। এক সময় তিনি বললেন, 'তীর্থ ত সারা হ'লো, তারপর ? এসে কী লাভ হ'লো ?'

'পুণ্য !'

'সে ত আপনাদের, কিন্তু আমার ?'

'আপনার অন্তত পাপক্ষয় ত খানিকটা হ'লো !'

সহসা তাঁর মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া দেখা গেল। শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'সে মিথ্যে নয়, এদেশে জন্মানোই পাপ।'—আবার তিনি হাসলেন। হেসে বললেন, 'কিন্তু আমার ত পাপ নেই।'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'সেকি, হিন্দুঘরের মেয়ের পাপ নেই !'

'মেয়েদের নিয়ে অনেক রকমের ধারণাই চল্‌তি আছে!'—রাণী বললেন, 'কিন্তু সে যাক গে। আমি ত দেখচি আমার লাভ হ'লো কিছুদিন ঘানির জোয়াল থেকে ছাড়া পাওয়া, পাহাড়ে-বনে হাঁটাহাঁটি, আর এই ঘোড়ায় চড়াটা।'

নানা কথায় এক সময় জিজ্ঞাসা করে বসলাম, 'আচ্ছা, আপনার স্বামী কতদিন মারা গেচেন ?'

'দোহাই আপনার!' বলে' তিনি একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন, 'দয়া করে

সহানুভূতি প্রকাশ করবেন না। অল্প বয়সের বিধবাদের জন্যে কান্নাকাটি, —ওটা ত' লেগেই আছে! আপনি আর কেন তাদের দলের দলী হন্? যেটুকু সময় হাতে আছে, সেটুকু আমাদের তীর্থযাত্রার আনন্দে ভ'রে উঠুক। অনেক কান্না আছে মানুষের জীবনে। কিন্তু কে তার খোঁজ রাখে? দুনিয়াসুদ্ধ লোক আমার দিকে তাকিয়ে আহা বল্‌লেই যেন আমার পিঠে চাবুক পড়ে!'

তা বটে।

ক্ষেতী চটি পার হতেই সূর্য এলেন প্রায় মাথার উপরে। পথ এবার চড়াই এবং সঙ্কীর্ণ। মানুষের সমাগম আর কোথাও দেখা যাচ্চে না, দুই ধারের অরণ্য নিবিড় হয়ে এসেচে। দুই পাশে বৃক্ষলতার ঘন জটলায় এই পরিদৃশ্যমান দিবালোক মাঝে মাঝে ছায়ান্ধকারে আবৃত হচ্চে। ঝিল্লীরব শুনতে পাচ্চি। অরণ্য-পুষ্পের সংমিশ্রিত গন্ধে পথের হাওয়া কোথাও-কোথাও ভারাক্রান্ত। লতাবিতানের ফাঁকে-ফাঁকে বসন্তের বাতাস থেকে-থেকে আপন উচ্ছ্বাসে মর্মরিত হয়ে উঠ্‌চে।

চড়াইটা পার হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর, ঘোড়াটা ক্লান্ত হয়ে এসেচে। সহিস ছিল পিছনে-পিছনে, এবার সে সুমুখে এসে লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে টানতে টান্‌তে উঠ্‌তে লাগলো। পথটা অতিরিক্ত কর্কশ এবং ভাঙাচোরা।

'এত বেলা, নাওয়া-খাওয়া নেই, আপনার নিশ্চয় চল্‌তে কষ্ট হচ্চে।'

বললাম, 'আমিও সেই কথাই ভাবচি। ভাবচি এমন ভয়ানক পথ অথচ চল্‌তে কষ্ট হচ্চে না কেন। বিশ্রাম পর্যন্ত নেবার চেষ্টা নেই!'

আমার কথায় হয়ত প্রচ্ছন্ন পরিহাস প্রকাশ পেয়ে থাকবে—সুতরাং রাণী কৌতুক-কটাক্ষে চেয়ে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, 'সত্যিই তাই; নিজের শক্তি যে কোথায় জমা থাকে নিজেরাই জান্‌তে পারিনে।'

দেড় মাইল পথ পার হয়ে যখন গণ্ডাবাজ চটিতে পৌছলাম তখন আন্দাজ বেলা প্রায় একটা। আর নয়, সুমুখের ছোট চালার ভিতরে এসে ঝোলাঝুলি নামালাম। রাণী নেমে এলেন ঘোড়া থেকে। সহিসটা ঘোড়াকে নিয়ে কোথায় যেন দানাপানি খাওয়াতে গেল। নির্জন চটি, দোকানওয়ালা থাকে পথের নীচে। সুমুখে পথের ওপারে একটা ঝরণা ঝর-ঝর করে নাম্‌চে। ভয়ানক মাছির উৎপাত। তিনি গায়ের চাদরখানা খুলে দিয়ে বললেন, 'পায়ে ঢাকা দিয়ে বসুন, আমি আসচি মুখে-চোখে জল দিয়ে, আর সবাই না এলে ত রান্নাবান্নার ব্যবস্থা হবে না।'

মুখ ধুয়ে তিনি আবার এসে মুখোমুখি বসলেন, মাছির দৌরাত্ম্যের জন্য বাধ্য হয়ে চাদরের আর একটা দিক তিনি নিজের পায়ের উপর টেনে নিলেন। বললেন, 'এমন করে কি বিদেশে-বিভূঁয়ে একলা আসে? শরীর-গতিক বলা ত যায় না, দেশে গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নেবেন; শান্ত হয়ে থাকবেন।'

অঘোরবাবুর স্ত্রীর নিকট বিদায়ের দৃশ্যটা সেদিনও আমার মনে জল্‌জল্‌ করচে, সেই ভয়ানক আঘাত আমি ভুলিনি। ব্রহ্মচারীর সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেচে তাও স্পষ্ট মনে করতে পারি। পথে আর কোথাও স্নেহ-মমতার বন্ধন সৃষ্টি করবো না। হৃদয়াবেগের খেলায় অনেক দুঃখ পেয়েচি। অনেক ভেঙেছে, অনেক রামধনু মিলিয়ে গেছে।

বললাম, 'এত তীর্থ, এত দেবদর্শন, তবু আপনার মুখে সেই ঘরোয়া মনের কথা?'

রাণী বললেন, 'ঘরোয়া মন নিয়েই ত' তীর্থে এসেছিলুম।' বলে হঠাৎ একবার পথের দিকে তাকিয়ে তিনি আমার পায়ের উপর থেকে চাদর-

খানা টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। দিদিমারা আসচেন। রৌদ্র ও পথশ্রমে দিদিমার চেহারা একেবারে বদ্‌লে গেচে।

কাছাকাছি এসে নাত্‌নীকে দেখেই তিনি হঠাৎ ফেটে পড়লেন, 'এই কি তোর মনে ছিল রাণী, যারা হেঁটে আসচে তাদের ওপর এতটুকু মায়াদয়া নেই? চল দেশে, বলবো গিয়ে সকলের সাম্‌নে এই কথা। এত অন্যায়, এত বেয়াদপি! কে তোমাকে আসতে বলেছিল এতটা রাস্তা? কেন দাঁড়াওনি ক্ষেতী চটিতে?' বল্‌তে বল্‌তে তিনি চালার ভিতরে এসে বসে পড়লেন,—'তোমাকে এনে আমার এত দায়িত্ব, এমন চোখে-চোখে রাখা! পরের মেয়ে, অল্প বয়েস, কেন তুমি এলে আগে-আগে? জানো, আমার পায়ের অসুখ, চলতে পারিনে?'

রাণী নীরব, আমি নতমস্তক। বোঝা গেল তাঁর অভিযোগ এবং ভয়টা কোথায়? দেখতে-দেখতে পিসি এবং আর একটি বৃদ্ধা এসে চটিতে উঠলেন। তিরস্কার এবং কটূক্তি সেই মৌনমুখী মেয়েটির উপরে বহুক্ষণ অবাধে বর্ষিত হ'তে লাগলো। ধীরে-ধীরে উঠে পাশের চটিতে এসে ঢুকলাম। রান্নাবান্নার আর দেরি করলে চলবে না।

ঘণ্টা দুই পরে ঝরণার জলে বাসন ধুয়ে যখন চটিওয়ালার কাছে হিসাব নিতে যাচ্ছি তখন চালার ভিতর থেকে গলা বাড়িয়ে রাণী বললেন, 'রান্নাবান্না করলেন, আমাদের কই খেতে ডাকলেন না? আমাদের যে উপবাসেই দিন গেল!' বলে তিনি শুষ্ক হাসি হাসলেন।

দিদিমারাও হাসলেন তাঁর সঙ্গে। বোঝা গেল আবহাওয়াটা হাল্‌কা হয়ে গেচে। দিদিমার দিকে ফিরে বললাম, 'আপনারা রাঁধলেন না কেন?'

তিনি বললেন, 'দল-বল সব ছন্নছাড়া হয়ে গেচে। চৌধুরীদের ফেলে রেখে ত আমরা খেতে পারিনে ভাই।'

অপরাহ্নে যখন কালীমাঠি চটিতে এসে থামলাম তখন শরৎকালের মতো একখানা কালো মেঘ থেকে সপ্ সপ্ করে বৃষ্টি নেমেচে। মেঘের পারে পশ্চিমের আকাশ তখনো রাঙা রৌদ্রে রক্তাভ, সুতরাং বৃষ্টি দেখে চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। গোপালদার দল পিছন দিক থেকে এসে আবার আমাকে গ্রেপ্তার করেচে। এখন আমরা গুটিচারেক বাঙালীর দল একত্র চল্‌চি। স্বামীজির দল এসে মিলেচে। চারটি দলে প্রায় ষাট জন লোক, তার মধ্যে স্ত্রীলোক প্রায় পঞ্চান্ন জন! সবাই এসে থামল। দিদিমার দলের চৌধুরী মশাইদের এখনো দেখা নেই, সেই সকাল থেকে ছাড়াছাড়ি। এদিকে বৃষ্টি দেখে আর অধিকদূর অগ্রসর হওয়া সম্বন্ধে অনেকেই একটু ইতস্তত করতে লাগলো, শেষ পর্যন্ত আকাশের দিকে চেয়ে এগিয়ে যাওয়াই স্থির হ'লো।

দিদিমারা আর এগোবেন না, চটিতে আশ্রয় নিয়ে আজ রাত্রের মতো থেমে গেলেন, চৌধুরী মশাইরা তখনো এসে পৌছলেন না। তাইত, আমি কী করি, ন যযৌ ন তস্থৌ। চটির অঙ্গনে একটি ঝরণার মুখে রাণী একটা বাল্‌তি নিয়ে এসেচেন জল নিতে। জল দেখলেই তৃষ্ণা লাগে, অতএব জলপান করতে গেলাম। রাণী বললেন, 'আপনি আজ এগিয়ে যান, এরা একটা বিশ্রী সন্দেহ করেচে···কাল মেহলচৌরীতে যেন নিশ্চয়ই দেখা হয়।'

বললাম, 'এর পরে দেখা হওয়া কি সঙ্গত?'

মৃদু-কঠিন ও স্পষ্ট কণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন, 'নিশ্চয় সঙ্গত। জান্‌বেন আমি কারো অধীন নই!'

দলের সঙ্গে আবার পথ ধরলাম। এক মাইল পার হয়ে গিয়ে পাওয়া গেল রসিয়াগড় চটি। এই চটিতেই রাত্রিবাস। রাত্রে আহারাদির পর তামাক ধরিয়ে গোপালদা এক সময় বললেন, 'আমি কিন্তু ভাই ওদের কথা বিশ্বাস করিনে, যে যাই বলুক।'

বললাম, 'ব্যাপার কি ?'

'ওই স্বামীজির দলের ওরা বল্‌ছিল তোমার কথা।'

'কী বলছিল ?'

'তুমি যে-মেয়েটার নাম রেখেছ রাঙাশাড়ী, সে নাকি তোমার বিরুদ্ধে যা-তা বলেচে। তোমার কথা সবাই জিজ্ঞেস করছিল,—রাঙাশাড়ী বললে, তিনি ঘোড়ার ল্যাজ ধরে বৈতরণী পার হচ্চেন! মেয়েটা অম্‌নি সবাইকেই খোঁচা দিয়ে কথা কয়। স্বামীজিরা সবাই নাকি হাসাহাসি করেচে। আমি আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়েচি!'

বললাম, 'এত কাণ্ড হয়েছে এর মধ্যে ?

চুপি-চুপি গোপালদা বললেন, 'হোক না, আমি ত জানি তোমাকে, তোমার গায়ে কাদা লাগে না, ওরা তোমাকে কতটুকু জানে ভাই ?'

বললাম, 'সত্যিও ত' হতে পারে গোপালদা ?'

'হোক সত্যি, ওতে আমি ভয় পাইনে, গঙ্গার জলে ময়লা এসে মিশলে গঙ্গা কি নোংরা হয় ?'

হেসে বললাম, 'তবে ভালো কথাটাই বলি, ব্রহ্মপুত্র এসে মিলেচেন পদ্মায়!'

পরদিন খাড়চটি ও ধূনার-ঘাটের ছোট পার্বত্য শহরটি যখন পার হয়ে দাড়িমডালী এসে পৌছলাম তখন সকাল হয়েচে। ধূনারঘাট থেকে

পেয়েচি রামগঙ্গা নদী, আর পেয়েচি ছোট-ছোট প্রান্তর। কোথাও কোথাও মাঠে চাষ-আবাদ চল্‌চে। ঢেউ-খেলানো প্রায়-সমতল পথ। আশেপাশে কয়েকখানি গ্রাম। গ্রামগুলি সমৃদ্ধিশালী। বেলা আন্দাজ ন'টার সময় আরো প্রায় সাড়ে চার মাইল হেঁটে এতদিন পরে আমরা গাড়োয়াল জেলার শেষপ্রান্ত মেহলচৌরীতে এসে পৌছলাম। ভেবেছিলাম মেহলচৌরী একটা হোম্‌রা-চোম্‌রা কিছু, কিন্তু সে যে এত সামান্য তা স্বপ্নেও ভাবিনি। এইখানে টিহরী রাজ্যের শেষ। যে সমস্ত গাড়োয়ালী কুলী একদিন হরিদ্বার থেকে যাত্রীর বোঝা বহনের জন্য নিয়োজিত হয়েছিল, এইখান থেকে তারা বিদায় নেবে, এর পরে বৃটিশ-সীমানা; বিনা ছাড়পত্রে বৃটিশ-সীমানার মধ্যে প্রবেশ করবার হুকুম তাদের নেই। আমরা সবাই একই দেশের মানুষ, সবাই ভারতবাসী, অথচ কি-একটা রাষ্ট্রগত সামান্য কারণে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। মেহলচৌরী অত্যন্ত অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর। পাশেই রামগঙ্গা নদী এবং নদীর উপরে একটা পুল।

বেলা আন্দাজ এগারোটার সময় চৌধুরী মশায়ের দল মহাসমারোহে এসে পৌছলেন। সঙ্গে তাঁদের জন-দশেক কাণ্ডিওয়ালা। রাণী এলেন ঘোড়ার পিঠে। দূর থেকে পরস্পরের দৃষ্টি-বিনিময় হতেই অলক্ষ্যে অভিবাদনের পালা সমাপ্ত হ'লো। তারপরে বিশ্রাম এবং আহারাদির আয়োজন। এদিকে গোপালদার দলের বামুন-মার সঙ্গে কি-একটা কারণে আমার বাধ্‌লো বচসা; ক্রমে তিল হ'লো তাল। চারুর-মা চুপি চুপি বললে, 'বা' ঠাউর, ও বুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করাও তোমার অপমান, তুমি চুপ করে যাও।'

হেসে বললাম, 'ঝগড়া ত করিনি চারুর-মা, ধমক দিচ্ছি।'

চারুর-মা একগাল হেসে বললে, 'ও, এটা তবে ঝগড়া নয়, ধমক? তাহ'লে আরো দুকথা শুনিয়ে দাও বা'ঠাউর, আমিও খুশী হই।'

আমরা সবাই চুপি-চুপি হাসাহাসি করতে লাগলাম, বামুন-বুড়ী নিল কান্না। স্নান করবার সময় হ'লো, গামছা নিয়ে এলাম রামগঙ্গায়। পাথর ভেঙ্গে নীচে নামতে হয়। একটু-একটু বৃষ্টি পড়চে।

স্নান সেরে সাবধানে ও সন্তর্পণে রাণী তখন নদী থেকে উঠে যাচ্ছিলেন। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'বাবারে, এমন চেঁচামেচি করতে পারেন আপনি? দেখ্‌চি, নিতান্ত ছেলেমানুষ নন। শুনুন, এবার ওদের দল ছেড়ে দিন, চলুন আমাদের সঙ্গে, একসঙ্গে ফিরবো। আর হ্যাঁ, আপনি এখান থেকে একটা ঘোড়া করুন, বুঝলেন, দু'জনে ঘোড়ায় থাক্‌লে বেশ হবে!'

'কিন্তু—'

চোখ পাকিয়ে তিনি বললেন, 'আমার কথার অবাধ্য হবেন না—' বলে হেসে তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন।

অমৃরা সিং চলে গেচে, আজ কাণ্ডিওয়ালারাও বিদায় নিল। বিদায়ের দৃশ্যটি করুণ। তুলসী, কালীচরণ, তোতারাম সবাই জানালো প্রীতিসম্ভাষণ; গাড়োয়ালীদের সে এক বিস্ময়কর সারল্য। চৌধুরী মশায়ের কাণ্ডিওয়ালারা ত কেঁদে-কেটেই অস্থির। রাণী নাকি তাদের সকলের মাতৃরূপিণী, এমন দয়াবতী, স্নেহময়ী দেবীর দেখা তারা নাকি জীবনে পায়নি। রাণীর দানে তাদের ঝোলাঝুলি ভরে উঠলো। কাপড়, চাদর, পুরোনো কম্বল, বাসন এবং নগদ বকৃশিস; পাওনা-গণ্ডার চেয়ে বকৃশিসের পরিমাণ বেশী হ'লো। সকলের চেয়ে যে কুলীটি বয়সে ছোট, সে কিছুই চাইল না, শুধু নিতান্ত শিশুসন্তানের মতো রাণীর আঁচলে মুখ

লুকিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। পর যখন আপন হয় তখন সে আপনার চেয়েও আপন। এমন দৃশ্য জীবনে কখনো দেখিনি। রাণীর চক্ষুও শুষ্ক রইলো না। রাজকন্যা ও দিনশ্রমিকের মধ্যে আজ আর কোনো ব্যবধান নেই। দুঃখে, দুর্যোগে, পথে পথে প্রায় এই দীর্ঘ তেত্রিশ দিনে আজ তারা জান্‌লো, সে মা তাদের আপন মা নয়, বৃহৎ পৃথিবীর জনারণ্যে মা তাদের নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন।

এদিকে আমাকেও বিদায় নিতে হ'লো সকলের কাছে। বামুন-বুড়ীর সঙ্গে বিবাদের পর গোপালদার দলকে আজ এইখান থেকে ত্যাগ করতে হ'লো। যদি সম্ভব হয় দেশে গিয়ে আবার দেখা হবে। দীর্ঘকাল এসেচি গোপালদার সঙ্গে, সেই হৃষীকেশে আলাপ, আজ তাঁকে ছাড়তে বড় লাগলো। যাই হোক্‌, বেলা তিনটে লাগাৎ স্বামীজি ও গোপালদার দল ঘোড়ার পিঠে মালপত্র চড়িয়ে মেহলচৌরী পরিত্যাগ করে গেলেন। তখন বেলা অপরাহ্ণ।

চৌধুরী মশায়দের ভাবগতিক দেখে মনে হ'লো, আজ বুঝি মেহল-চৌরীতেই রাত্রিবাস করতে হবে, তাঁদের বিশেষ তাড়া নেই। এদিকে রাণীক্ষেত পর্যন্ত একটা ঘোড়া নিজের জন্য ঠিক করেচি। ঘোড়া ঠিক করে চৌধুরী মশায়কে তাড়া দিলাম, তিনি অবশেষে যেতে রাজি হলেন।

অতএব আর বাধা নেই। যাত্রা করতে বেলা পাঁচটা বেজে গেল। ঘোড়ার পিঠে কম্বল ও ঝোলা চাপিয়ে লাঠিটা দিলাম সহিস মহেন্দর সিংয়ের কাছে,—সহিসটার বেশ 'মাই ডিয়ারি' ভাবগতিক। তারপর মাথায় রাজা শিবাজীর কায়দার পাগ্‌ড়ি বেঁধে বীরজনের মতো গিয়ে চড়লাম ঘোড়ার পিঠে। দড়ির্‌ জিন্‌ আর লাগাম, অশ্বারোহীর হাতে

গাছের একটা ডাল। তা হোক্, তাই দিয়েই ঘোড়ার ল্যাজের দিকে আঘাত করে বললাম, হট্, হট্!

ঘোড়া পা চালিয়ে হাঁটতে লাগলো, কিছুদূর গিয়ে পিছন ফিরে দেখি রাণী তাঁর ঘোড়া হাঁকিয়ে আসচেন সহাস্য বদনে। পাহাড়ের একটা বাঁকে এসে আমরা একত্র হলাম। তিনি বললেন, 'ঘোড়া আমাদের ছুটিয়ে দিই, পেছনে ধূলো উড়ুক, ওরা যেন দেখতে না পায়, কি বলেন?'

বললাম, 'কিন্তু তারপর?'

'তারপর আবার কি, শাসন আর সন্দেহ মাথা চাপড়াতে থাকুক, আমরা এগিয়ে যাই।'

'তারপর?'

'তারপর, কা'র ঘোড়াটা ভালো তাই দেখচি।'—বলে তিনি হাসলেন।

বললাম, 'আমারটাই ভালো।'

'ছাই ভালো, ওর চেয়ে আমারটার তেজ বেশী।'

'আমারটা বেশী ছোটে।'

'ছুটলেই আর ভালো হয় না, যেখানেই থামে সেখানেই মরে।'

সূর্যদেব নামচেন অস্তাচলে। কোথাও-কোথাও গাছে গাছে অরণ্যপক্ষীর সান্ধ্য কাকলী শুরু হয়েচে। দক্ষিণে নদীর উপরে নাম্‌চে ছায়ান্ধকার। দু'জন সহিস চলেচে পাশে-পাশে, তারা জমিয়েচে গল্প। আমরাও চলেচি পাশাপাশি। যেন স্বপ্নলোক থেকে দুটি পক্ষীরাজ আমাদের দু'জনকে নিয়ে নামচে—নেমে আসচে শূন্যলোক পেরিয়ে।

স্বর্গ থেকে বিদায়। ডাক এসেচে মর্ত্যভূমির, সেখানে আবার ফিরে

যেতে হবে। সেই কলহ-কলঙ্ক, বিদ্বেষ ও মালিন্য, সামান্য স্নেহ-মোহ-বন্ধন, সৌখীন বন্ধুত্ব, নগণ্য আত্মীয়তা। তবু ফিরে যেতে হবে। মহাপ্রস্থানের পৌরাণিক পথ ছেড়ে এসেচি কর্ণপ্রয়াগে; এ পথ ঐতিহাসিক, দক্ষিণ-পূর্বে টিহরী-সীমানা মেহলচৌরী হয়ে এই পথরেখা চলে এসেচে বর্তমান সভ্য ভারতের দিকে, মানবসমাজকে এসে স্পর্শ করেচে। স্বর্গ-প্রবাসে বহুদিন অতীত হয়েচে, স্মৃতি ও বিস্মৃতির একটি গোধূলি-আলোয় নেমে চলেচি, কানে আসচে মর্ত্যভূমির ক্ষীণ কলরব, জীবনের বিচিত্র জটিলতা হাতছানি দিয়ে ডাকচে। চল্, আবার নীচে নেমে চল্।

মেহলচৌরী রইলো পিছনে। চড়াই পথে যাত্রীরা ধীরে-ধীরে উঠচে। আমাদের ঘোড়া চলেচে মন্থর গতিতে। সহিসরা আসচে পিছনে-পিছনে। দক্ষিণে খদের নীচে দিনান্তকালের অন্ধকার গুটি-গুটি দল পাকাচ্চে। সম্মুখে পর্বতের পারে পশ্চিমের আকাশ লাল হয়ে উঠেচে, সন্ধ্যা এসে বসচেন অপরাহ্ণের আসনে। বাম দিকের সানুদেশে চিড়-জঙ্গলে মন্থর বাতাস মাঝে মাঝে গুঞ্জন-ধ্বনি তুলে চলেচে। এদিকের পথ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত,—রাণী তাঁর ঘোড়া নিয়ে পাশাপাশি চলেচেন। এক সময় বললেন, 'ঠিক আমরা চলেচি ত, পথ ভুল হবে না?'

বললাম, 'এ পথ ত ভুল হবার নয়, সোজা রাস্তা।'

অল্প-অল্প আলাপ চল্‌চে। যে-কথাটা বল্‌চি সে-কথাটা নিজেও শুন্‌চি, তিনিও বোধ করি কান পেতে আছেন তাঁর নিজের কথার প্রতি। এমনই হয়। নিজের কথা যখন নিজের কানে শুনি, বুঝতে হবে কথার অতীত বস্তুকে আমরা উপলব্ধি করি।

'চারিদিক কী সুন্দর হয়ে উঠেচে দেখ্‌চেন?'

চারিদিক দেখলাম বটে, কিন্তু সে বিস্ময়কর রূপ বাহিরের, না আমারই

অন্তরের? নারীর মধ্যে রয়েচে একটি রসের প্রকৃতি, হ্লাদিনী শক্তি, সে শক্তি পুরুষের মধ্যে স্ফুরিত করে আনন্দ, অনুপ্রেরণা, মন্দিরের নিদ্রিত দেবতার কানে কানে বলে জাগরণী গান; যেমন নদীর পথে নামে বর্ষার ঢল্, তার সর্বাঙ্গে আনে বেগ, তোলে জোয়ার, তাকে সক্রিয় করে, ছুটিয়ে নিয়ে চলে পরম লক্ষ্যের দিকে। কিন্তু আমার মধ্যে জোয়ারের প্লাবনের এই অধীর উচ্ছ্বাস—এর লক্ষ্য কতটুকু? এর গতি কোন্ দিকে? আমি ত' জানি, আমাদের সামনে-পিছনে দু দিকেই অজানা, শুধু মাঝখানের ক্ষণ-পরিচয়ের স্বল্প সীমানাটুকুর মধ্যে আমাদের দুজনের চলাফেরা! হয়ত সেখানে অন্তরঙ্গতার একটুখানি আলো পড়েছে, হয়ত হ্লাদিনী শক্তির একটুখানি ক্ষণিক বিহ্বলতা দেখা দিয়েছে, কিন্তু তারপর আর কিছু নয়, আর কিছু নেই, আর কিছু থাকবে না। যেদিন ফিরে যাবো, দুজনে হারিয়ে যাবো দুই জগতে, মন-জানাজানির দাগ যেদিন মিলিয়ে যাবে, সেদিন ব্যবধানের দুই পারে ব'সে একজন কি আরেক-জনকে মনে করে কৌতুক বোধ করবে না? বিদ্রূপ করবে না নিজেকে?

ঘোড়ার পিঠে গাছের ডাল আঘাত ক'রে রাণী পুনরায় বললেন, 'এবার কিন্তু আর আপনাকে চেনা যাচ্চে না।'

'কেন?'

'সন্ন্যাসী হয়েচে গৃহী। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবী, মাথায় পাগ্ড়ি, বোধ হয় এর রংটা একসময় ছিল গেরুয়া! পুরুষ-মানুষের চেহারা বড় তাড়াতাড়ি বদ্লায়!'

বললাম, 'বদ্লায় না কেবল মেয়েদের। তীর্থই করুক আর ঘোড়াতেই চড়ুক, আসলে তারা একই?'

দু'জনেই আমরা হেসে উঠলাম।

'খুব খানিকটা স্বাধীনতা পাওয়া গেচে কিন্তু, যাই বলুন। দিদিমাকে আমি বড় ভয় করি।'

'তবে এই যে বললেন আপনি কারো অধীন নন্?'

'সেটা নিতান্ত আর্থিক স্বাধীনতা—' রাণী বললেন, 'কিন্তু জানেন আমি কী ভয়ানক পরাধীন?'

চুপ করে রইলুম।

'এই অবস্থা হয়ে পর্যন্ত আমার অপমানের আর শেষ নেই! বাড়ির বাইরে পা বাড়ানো নিষেধ, জ্ঞাতি ভাই-ভগ্নীপতিদের সঙ্গে কথা বলা নিষেধ, বই-কাগজ পড়া সকলের অপছন্দ—তার কারণ কী জানেন?—বয়স আমার অল্প। এই পিসিমাকে বড় ভয় করি; কারণ দেশে গিয়ে ভালো কথাটা উনি বলবেন না; মিথ্যেটাকেই বড় করে তুলে ধরবেন। দুঃখ আমায় বন্ধুর মতো চিরদিন আশ্রয় করেচে।'

তাঁর নিশ্বাসে বাতাসটা ভারী হয়ে উঠলো। কথা আর মুখে কিছু এলো না, চুপচাপ ঘোড়া হাঁকিয়ে চল্‌তে লাগলাম।

পথ এবার প্রথম দিকটা চড়াই, তারপর সমতল, চল্‌তে আর বিশেষ কষ্ট নেই,—কিন্তু সেই পথের নানা বাঁক, নানা জটিলতা। কোথাও বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হচ্চে, কোথাও বা আমরা ঢুকচি একেবারে পাহাড়ের অন্দর-মহলে। ঘোড়া দুটি আমাদের শান্ত ও নিরীহ, তাদের চালাবার প্রয়োজন নেই, নিজেদের খেয়ালে তারা বৈরাগীর মতো উদাসীন হয়ে চলেচে। তারা জানে আমরা কতদূরে যাবো, কোথায় যাবো।

এই দীর্ঘ তেত্রিশ দিন যে অগণ্য যাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় হয়েচে তাদের কথা ভাবচি। আজ তারা যদি আমাকে দেখে তবে চিন্‌তে পারবে না।

তেত্রিশ দিন ধরে যে-মানুষ স্বল্পভাষী, নির্লিপ্ত ও উদাসী, আজ তার সেই চেহারার বদল হয়েচে। যে-মানুষ বিজ্‌নী, ছাত্তীখাল, গুপ্তকাশী, রামওয়াড়া উখীমঠ প্রভৃতির চড়াই-পথ মুখ বুজে পার হয়ে এসেচে, আজ তার এই সৌখীন অশ্বারোহণ,—তারা সত্যি অবাক হয়ে যেত। তাদের ধারণা আমি পাথরের কুচির মতো কঠিন, আমার মতো কষ্টসহিষ্ণু এবং স্বাস্থ্যবান যাত্রী এ-বছর নাকি একজনও আসেনি। তারা বোধ হয় দেখলেও বিশ্বাস করবে না যে, আমি আজ হয়েচি ফোয়ারার মতো মুখর, আমার মনের আকাশে চল্‌চে রঙের খেলা, আমার সন্ন্যাসীর বেশ খসে পড়েচে, অপরিচিতা এক নারীর সঙ্গে অরণ্যের পথে ঘোড়ায় চড়ে চলেচি,—আমার ফুরিয়ে গেচে বদরিকাশ্রম যাত্রা, শেষ হয়ে গেচে তীর্থপথ! বিশ্বাস তারা করবে না, কারণ, সংসারের নিয়মই এই। সোজা মাপকাঠি দিয়ে মানুষকে আমরা মেপে রাখি, বিশেষ একটা গণ্ডীর মধ্যে তাকে আবদ্ধ করি,—যার রঙ সাদা তাকে চিরদিন সাদা বলেই জেনে রাখতে চাই। জীবনের সহজ বিকাশকে ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চলা সাধারণ মানুষের স্বভাব,—অথচ মানব-ধর্ম কেবলই চাইচে পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করতে। যারা নীতির ক্রীতদাস, সমাজের চল্‌তি সংস্কারের কাছে যারা আত্মবিক্রয় করেচে, চিত্তধর্মকে শত-শত কঠিন বন্ধনে বেঁধে যারা জীবনকে সঙ্কুচিত করেচে, বঞ্চিত করেচে, আত্মবিকাশের তপস্যার সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই।

মানুষের সহজ প্রকৃতি কেন বন্ধন-জর্জর? সহজ আনন্দের ক্ষুধা কেন নাগ-পাশে জড়ানো? মস্তিষ্ক কেন ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধের দ্বারা ভারাক্রান্ত? সহজ হয়ে বাঁচা, সুস্থ মনে বাঁচা আমাদের কাম্য, সূর্যদেবতার দিকে শত-দলের মতো বিকশিত হয়ে ওঠা আমাদের সাধনা—তবে কেন এত মন্দির, এত মসজিদ আর গীর্জার বাহুল্য? যারা ধর্মধ্বজী আর নীতিপ্রচারক—

তারা কেন শাসন-শৃঙ্খলে বাঁধে নির্বোধ জনসাধারণকে আর মূঢ় মানব-সমাজকে? মনুষ্যত্ব আর মানবতা কেন বার বার ধর্মশাসনের শৃঙ্খল ছিন্ন ক'রে উন্মত্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ে রণক্ষেত্রে? কেন এই হিংসা, হানাহানি, রক্তপাত আর সমাজবিপ্লব? যারা যুদ্ধ বাধায়, যুদ্ধ করে, যুদ্ধে মরে, যারা শান্তি আনে, আবার শান্তি ভাঙে, যারা আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ লক্ষ খুনীকে উত্তেজিত কোরে তোলে—তারা কে? দেবতা, না শয়তান? মানুষের হৃদয়ের ভাষা কেন শুকিয়ে মরে লোকচক্রান্তে? ভালোবাসা কেন পথের ধারে আঁচল পেতে উপবাসে মরে? মানুষের বহু তপস্যালব্ধ দেবত্ব কেন বার বার দানবীয় হিংসার লৌহচক্রের তলায় দলিত হয় যুগে যুগে? কেন শান্তিবাদ, প্রেম, দয়া, স্নেহ, স্বপ্ন, সৌন্দর্যবোধ, দেবত্ব-চেতনা—ইত্যাদি মহত্তর জীবনদর্শনের সমস্ত আদর্শবাদ চূর্ণ ক'রে আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ বারম্বার ছুটে যায় সর্বনাশা স্থূল বুদ্ধির পথে? কেনই বা আত্মসৃষ্ট হিংসা ঘৃণা বিদ্বেষ লোভ ক্রোধ মত্ততা—এদের অতিক্রম ক'রে মানুষ আবার ফিরে আসে আনন্দের মধ্যে? মানুষ কি চিররহস্যময় নয়?

আজ আমাকে বিশ্বাস তারা করবে না। এমন কথা তাদের কেমন করে বোঝাবো, শীতের পথে আসে বসন্ত, তারপরে নেমে আসে বর্ষা! একদা নিগূঢ় আনন্দ-বৈচিত্র্য তপস্যায় শঙ্করাচার্যের উত্তরধামের পথে চলেছিলাম—পরনে গৈরিকবাস, মাথায় জট পাকানো চুল, সঙ্গে ছিল শ্মশানের ভূতপ্রেতের দল, চক্ষু ছিল শিবনেত্র। উত্তরের হাওয়ায় দিনে দিনে আমার হৃদয়ের ভিতরে জমেছিল তুষারের স্তর,—কঠিন নিশ্চল হিম-মরুরাশি। তারপরে নেমে এলাম চঞ্চল বসন্তের উপবনে মালতী-মল্লিকা-ছাওয়া অরণ্য-বীথিকায়, দক্ষিণের দাক্ষিণ্যে পেলাম খুঁজে মাধুর্যের আনন্দ! অস্থিমালার পরিবর্তে আমার অঙ্গে অঙ্গে

আজ রাঙা পলাশের স্তবক; মাথায় ঋতুরাজের সোনার মুকুট, চিতাভস্মের বদলে পুষ্পরেণু, হাতের শিঙা হয়েছে বাঁশরী,—বসন্তের বন্যায় আমার বৈরাগ্য ভেসে গেচে।

রাণী বললেন, 'নিজের কথা বলে আপনাকে হয়ত দুঃখই দিলাম!'

দূরে তখন বিজ্‌রাণী চটির আলো দেখা দিয়েচে। বললাম, 'তা'তেই বা কুণ্ঠা কেন, দুঃখই আসে দুঃখের অতিথি হয়ে।'

'বেশ তাই আসুক।' তিনি হেসে বললেন, 'আচ্ছা মনে আছে আপনার রবিবাবুর সেই কবিতাটা?'—বলে' তিনি নিজেই কোমল কণ্ঠে বলতে লাগলেন,—

'রাজপথ দিয়ে আসিয়োনা তুমি, পথ ভরিয়াছে আলোকে
প্রখর আলোকে।
সবার অজানা, হে মোর বিদেশী,
তোমারে না যেন দেখে প্রতিবেশী,
হে মোর স্বপনবিহারী।
তোমারে চিনিব প্রাণের পুলকে,
চিনিব সজল আঁখির পলকে,
চিনিব বিরলে নেহারি,
পরম পুলকে।
এসো প্রদোষের ছায়াতল দিয়ে, এসো না পথের আলোকে,
প্রখর আলোকে।'

হেসে বললাম, 'ভদ্রলোক দেখচি মন্দ লেখেন না। আচ্ছা, এবার কিন্তু আমি এগিয়ে যাই।'

ঘোড়াকে ছুটিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম কিন্তু ছোটানো অত সহজ নয়।

আঘাত করলে খানিকটা এগোয়, আবার দেখতে দেখতেই তার গতি মন্থর হয়ে আসে। এমনি করেই চটির কাছাকাছি যখন এসে ঘোড়া থেকে নামলাম তখন বেশ অন্ধকার হয়েচে। সম্মুখে পাশাপাশি খান দুই কোঠা, কোলে বারান্দা, প্রথম চটিটার নীচে বেশ বড় একখানা খাবারের দোকান,—রাতটা তবে মন্দ কাটবে না। চারিদিকে নানা গাছের জঙ্গল, পিছন দিকে খানিকটা খোলা সমতল জায়গা, পথের এপারে শান্‌বাধানো একটা ঝরণা। একটু আগে বোধ করি এখানে এক পশ্‌লা বৃষ্টি হয়ে গেচে, সমস্তটা স্যাঁত-স্যাঁত করচে।

চৌধুরী মশায় সদলবলে এসে হাজির হলেন। প্রথম চটির দোতলায় সবাই মিলে আশ্রয় নেওয়া গেল। পাশের বাড়িটায় একদল হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারী এসে উঠলো। ঘোড়াগুলোকে নিয়ে মহেন্দর সিং ও প্রেমবল্লভ ঘাস-জল খাওয়াতে কোথায় নিয়ে গেল,—কথা রইলো ভোর রাত্রে আবার তারা এসে হাজির হবে। মোটঘাট খুলে দোতলার ঘরে ও বারান্দায় চৌধুরী মশায়রা বিছানা পাতলেন, নীচের পুরীর দোকান থেকে যৎসামান্য জলযোগের ব্যবস্থা হ'লো,—রাণী একটা বাল্‌তি নিয়ে ঝরণা থেকে জল নিয়ে গেলেন। বয়স যাদের অল্প, পরিশ্রমের ভাগটা তাদের উপরেই বেশি পড়ে।

আহারাদির পর্ব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শয্যাগ্রহণ। ইতিমধ্যে সেই ট্যারাচোখো পিসির সঙ্গে কার যেন একটু মনোমালিন্য হ'লো, তিনি জল-গ্রহণ না করেই বারান্দার ধারে কাঁথা-কম্বল বিছিয়ে শুলেন। পিসির সমস্ত হাসি-রসিকতার পিছনে থাকে একটি বিষাক্ত সাপের ফণা, মানুষকে অতর্কিতে ছোবল মারাই তার রীতি। কিন্তু এই বিলীয়মান কোলাহলের ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে তাকিয়ে যে-দৃশ্য আমি সেদিন দেখেচি

তা আজো স্পষ্ট মনে করতে পারি। রাণী-যে দীক্ষা নিয়েচেন, সকাল-সন্ধ্যা তিনি-যে জপে বসেন তা আমি জানতাম, আড়ালে-আবডালে লক্ষ্যও করেচি। কিন্তু তার চেহারা যে এমন তা এই প্রথম উপলব্ধি করলাম। সম্মুখে লণ্ঠনের আলো জ্বল্‌চে, তারই কাছে আসনের উপরে তিনি ধ্যানে বসেচেন, চক্ষু দুটি মুদিত; মুখের উপরে শুধু-যে তাঁর একটি অপূর্ব লাবণ্য ও দীপ্তি ফুটে উঠেচে তাই নয়, সে-মুখে একটি প্রশান্ত পবিত্রতা; সংযম ও সহজ কৃচ্ছ্র সাধনার একটি অনির্বচনীয় মাধুর্য,—এমন জ্যোতির্ময় রূপ সহসা চোখে পড়ে না! আমি নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। আপাতদৃষ্টিতে দেখে মানুষের চরিত্রের যারা সমালোচনা করে তাদের কথা আমি ধরিনে, কিন্তু এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় অল্পদিনের, কথায়-আলাপে প্রথমটা নানা বিরূপ ধারণা করেচি এঁর সম্বন্ধে,—সে ধারণা আমার সত্য নয়। তথাকথিত শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েদের জানি, এখনকার সমাজে তাঁদের সংখ্যা বেশ ভারী হয়ে উঠেচে; তাঁদের চাল-চলনে ও আচার-ব্যবহারে কলেজী ঢঙ, চেহারায় পালিশ, চরিত্রে চটুলতা, ছলনায় ভরা ভঙ্গী,—জানি তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার গোপন-তত্ত্ব। তাই প্রমথ-প্রথম এঁর অনর্গল হাসি, বুদ্ধিদীপ্ত কথা, নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার ও সরস কথালাপ স্মরণ করে কখনো কখনো ভ্রূ-কুঞ্চন করেচি তাঁর প্রতি,—মনে হয়েচে ইনিও ত তাই, সেই একই বিরক্তিকর চরিত্রের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু না, এখানে মত পরিবর্তন করতে হ'লো। সেই রাত্রি, সেই অন্ধকার, সেই নানাজাতীয় যাত্রীর জটলা, সেই স্তিমিত দীপালোক, তার মাঝখানে বসে মন বললে, সাধারণের কোঠায় এঁর স্থান নির্দেশ করে দিয়ো না, তা'তে নিজেই তুমি ছোট হয়ে যাবে। মেয়েরা তোমার চোখে বড় যদি না হয় ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমার চোখের দোষে তারা যেন ছোট না হয়।

পৃথিবীতে এত নাস্তিকতা, সন্দেহবাদ ও সিনিসিজম্, মনের এত মালিন্য ও চরিত্রের এত অধঃপতন, সাহিত্যের সুলভ রোমান্টিসিজম্ ও সৌখীন কল্পনা, সত্য ও ন্যায়ের তথাকথিত আদর্শের প্রতি মানুষের এত অবিশ্বাস—কিন্তু তৎসত্ত্বেও যা কিছু সদ্‌গুণ মানব-চরিত্রকে উজ্জ্বল করে তার মূল্য আমরা না দিয়ে থাকতে পারিনে। মানুষ যে যে গুণের দ্বারা মহীয়ান্ হয়ে ওঠে, যেখানে সে দৃঢ় নৈতিক শক্তির পরিচয় দেয়, সেখানেই আমরা তার কাছে মাথা নত করি। সেখানে তর্কও নেই অবিশ্বাসও নেই, সেখানে নতজানু হয়ে আমরা বলি, তুমি সাধু, তুমিই মহাত্মা।

রাত্রে শীত পড়লো, কিন্তু কম্বলখানি ছাড়া যখন দ্বিতীয় শয্যা নেই তখন তাই নিয়েই বারান্দার এক কোণে স্থান নেওয়া গেল। উত্তর ও দক্ষিণ দিক খোলা, হু হু করে বাতাস বইচে,—নীচের গোলমাল শান্ত হয়ে এল, পাশের হিন্দুস্থানী দলের একঘেয়ে গানের গোঙানিও থেমে আসচে, আমার চোখে তন্দ্রা জড়িয়ে এল। মাথার কাছে চৌধুরী মশায় শুয়েচেন—অতি অমায়িক মানুষ এই চৌধুরী মশায়,—তাঁরই পায়ের দিকে শুয়েচে ট্যারাচোখো পিসি,—ধাঁ ধাঁ করে পিসির নাক ডাকচে! বারান্দার ভিতর দিকে দলের অন্যান্য বৃদ্ধারা, ঘরের ভিতর আছেন দিদিমা ও রাণী। রাত্রি নীরব ও নিশুতি, দু'দিন আগে গেচে অমাবস্যা। দ্বিতীয়ার শীর্ণ চন্দ্র কখন্ পশ্চিম আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেচে, চারিদিক ঘোর অন্ধকার। আকাশের পরিচ্ছন্ন নক্ষত্রগুলি দপ্ দপ্ করে জ্বলচে।

শীতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিলাম, কেমন করে না জানি একসময় ঘুম ভেঙে গেল। আজ হাঁটা হয়নি, অতএব পরিশ্রমও নেই, গভীর নিদ্রা চোখে আর আসতে চাইচে না। একবার তাকিয়ে আবার চোখ বুজলাম। পরে আবার ছাঁৎ করে ঘুম ভাঙ্‌লো। অন্ধকারে দৃষ্টি মেলে

নিঃশব্দে তাকালাম। দেখি মৃদু-লঘু পদশব্দে অতি সন্তর্পণে একটি মানুষের ছায়া নিকটে এসে একবার ইতস্তত করে আবার ফিরে গেল। ঘরের ভিতরের অতি ক্ষীণ আলোকেও রাণীকে চিনলাম। কেমন যেন অহেতুক আশঙ্কায় আড়ষ্ট হয়ে চোখ বুজে পড়ে রইলাম।

পরদিন প্রভাতে ঘোড়া নিয়ে সর্বাগ্রে বেরিয়ে পড়লাম। আগে-আগে বেরিয়ে পড়াই যুক্তিযুক্ত মনে করেচি। বেরোবার সময় পিছনেও তাকাইনে, আগ্রহও দেখাইনে, যেন কতই উদাসীন! মাঝপথে রাণী পিছন থেকে এসে যে আমার সঙ্গ নেন, তারপর দু'জনে গল্প করতে করতে চলি, একথা কারো মনেও হয় না। অথচ তাঁরা যে আমাদের পাহারা দিতে-দিতে আসবেন, চোখে-চোখে রাখবেন তার উপায়ও নেই। তাঁরা আসচেন পায়ে হেঁটে, আমরা চলেচি ঘোড়ার পিঠে। আমাদের এই ছলা-কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করে আমরা নিজেরাই হাসাহাসি করি। সামাজিক মানুষের মনের চেহারা আমরা জানি,—নরনারীর স্বাধীন মেলামেশা, সহজ বন্ধুত্ব, পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববোধ,—এসব তাদের চোখে অতিরিক্ত বিসদৃশ। স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে তাদের চিরদিন একই ধারণা, অন্য কিছু নেই। এই সামাজিক ও সংস্কারাচ্ছন্ন মনের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করতাম, তাকে জব্দ করবার জন্য আমাদের আগ্রহও বেড়ে যেত,—তাদের শাসন সন্দেহ ও বাঁধাবাঁধি তাচ্ছিল্য করে আমরা গর্বভরে 'কুচ পরোয়া নেই' বলে চলে যেতাম, তারা আমাদের ধরা-ছোঁয়া পেত না।

সকালবেলা সেদিন পিছন থেকে এসে তিনি ধরলেন। ফিরে দেখি দুটি চোখ তাঁর ঘুম-জড়ানো, গতরাত্রে বোধ করি সুনিদ্রা হয়নি,—মুখে হাসি। বললেন, 'গুড্ মর্নিং! চ্চ্, চ্চ্, একটু আস্তে চল্ বাবা, তুইও

কি বিরূপ হ'তে চাস্? এই প্রেমবল্লভ, বিন্দুকে একবার ধমক দে ত'! ঘোড়াটা দেখি দিদিমার চেয়েও এককাঠি!'

হাসছিলাম। তিনি বললেন, 'কাল রাত্রে একটু অন্যায় করে ফেলেছিলাম,—জানি আপনি ক্ষমা করবেন।'

'কী বলুন ত?'

তিনি সলজ্জকণ্ঠে বললেন, 'শীতে আপনি কুণ্ডলী হয়ে পড়ে ছিলেন, একখানা কম্বল দিতে গিয়েছিলাম,—কিন্তু দেবার সাহস হ'লো না। দু'পা এগোই আবার তিন-পা পিছিয়ে আসি,—রাত নিশুতি কিনা!'

চুপ করে রইলাম। তিনি বললেন, 'ভয় পেলাম, সকালবেলা যদি আপনার ঘুম ভাঙতে দেরি হয়? লোকে দেখবে আমার কম্বল আপনার গায়ে! ওমা, কী জবাব দেবো? তার চেয়ে, হোক্ কষ্ট আপনার, অনেক সহ্য করেচেন আপনি।—ভালো কথা, এই কবিতার কটুরোটা আপনি মুখস্থ করবেন। বদরীনাথের মন্দিরে বসে এইটি আমি আবৃত্তি করেছিলাম।'—এই বলে ঘোড়ার পিঠের উপর থেকে তিনি একখণ্ড কাগজ আমার হাতে দিলেন।

কাগজখানা হাতে নিলাম, কিন্তু তিনি আর অপেক্ষা করলেন না, লাগামটায় হেঁচ্‌কা দিয়ে নিজের ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেলেন।

সেদিন জ্যোতির্ময় প্রভাত। অরণ্যে-অরণ্যে সূর্যদেবতা তখন ঐশ্বর্য ছড়িয়ে দিচ্চেন। একহাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে অন্য হাতে কাগজখানি খুলে পড়লাম—

'মোর মরণে তোমার হবে জয়।
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।

মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল
আজ ঘিরিল তোমার পদতল
মোর আনন্দ সে যে মণিহার
মুকুটে তোমার বাঁধা রয়।
মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়।
মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়।
মোর ধৈর্য তোমার রাজ-পথ,
সে যে লঙ্ঘিবে বন-পর্বত,
মোর বীর্য তোমার জয়রথ
তোমার পতাকা শিরে বয়।'

কিছুদূর এসে আবার তাঁকে পাওয়া গেল। তিনি ঘোড়া থামিয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। পুরাতন গল্পের সূত্র ধরে পুনরায় আমরা একত্র চল্‌তে শুরু করলাম। অনেক কথা তাঁর কাছে সংগ্রহ করে চলেচি। নিজের কর্মধারার পরিচয় তিনি দিতে চান্ না, তাঁর লজ্জা আছে, তার চেয়ে বেশি আছে বিনয় ও নম্রতা। কিন্তু আমি ছাড়্‌বার পাত্র নয়, তাঁর সব কথা জানতে চাই,—আমার সাহিত্যিক প্রাণ পরম কৌতূহলে জেগে উঠেচে, তাঁর দুঃখ-কাহিনীর মধ্যেও আমি গভীর আনন্দ পাই। আমার কল্পলোকে তাঁকে নূতন করে সৃজন করতে থাকি,—আমার অনুপ্রাণনার সকল আগল তিনি খুলে দিয়েচেন।

ধীরে ধীরে চলেচি। তাঁর কথায় অজস্রতা, প্রাণের দুর্বার বন্যা—তারই প্রবাহে তাঁর গল্প ভেসে চলেচে মুক্তধারায়।

আমাদের আলোচনা হয় সমাজ, সাহিত্য ও সাধারণ জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে। তিনি উঁচুদরের বিদুষী মোটেই নন্, কিন্তু সমস্ত বিষয়ে তাঁর

একটি সুনির্দিষ্ট ও সুদৃঢ় মতামত পেয়েচি। নিজের জীবন দিয়ে যে-বস্তু তিনি হৃদয়ঙ্গম করেননি তাকে কেবল তর্কে মেনে নিতে তিনি কোনো মতেই রাজি নন্। সমস্ত কথালাপের ভিতর দিয়ে তাঁর একটি সুরুচিসম্পন্ন ও ভদ্র মন আনাগোনা করে। মনটা তাঁর উত্তমরূপে সংস্কৃত।

মেয়েরা প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে পুরুষের সংস্পর্শে এসে। নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর কম নয়, বহু দেশ পর্যটন করেচেন, বহু পরিবার ও পরিজনের মধ্যে মানুষ। এক ছোকরা ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, পশ্চিমের এক শহরে তিনি সংসার রচনা করতে যান্। সেখানে স্বামীর কাছেই গান-বাজনা, সামান্য ইংরেজী লেখাপড়া, হিন্দী ও উর্দ্দু শেখেন,—শিক্ষয়িত্রীর কাছে শেখেন নানা শিল্পকাজ, সেলাইয়ের মেশিন চালানো, ছবি আঁকা,—কিন্তু সে অল্পদিন মাত্র, সেই নিভৃত সুখময় জীবন বিধাতার চক্ষে সইলো না, স্বামীর হ'লো অকালমৃত্যু—তাঁকে মাথার সিঁদুর মুছে খালি হাতে ফিরে আসতে হ'লো। যে-বয়সে নারীর মন সংসার-স্বপ্নের ইন্দ্রজাল বোনে, সন্তান-সন্ততির ক্ষুধায় যে-বয়সে নারীর মাতৃহৃদয় বাৎসল্যরসে উচ্ছ্বসিত হতে থাকে, সেই বয়সে তাঁর এত সম্ভাবনাময় জীবন উত্তীর্ণ হয়ে এল দিক্‌চিহ্নহীন মরুভূমির পথে, সকল গতি হ'লো রুদ্ধ। ঝড়ে যে-পাখার বাসা বিধ্বস্ত হয়ে গেচে তার আশ্রয় এখন গাছে-গাছে,—কখনো তিনি থাকেন শ্বশুরবাড়িতে, কখনো মামার বাড়িতে, কখনো-বা এখানে-ওখানে। মামার বাড়িতে বেশির ভাগ থাকাই এখন সুবিধা। সুবিধা মামার বাড়িরই বেশি। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কাজের চাকায় তিনি বাঁধা। সংসারের হিসাব-পত্র, ভাঁড়ারের চাবি, ছেলেমেয়েদের তদ্বির, আপিস-ইস্কুলের রান্নার আয়োজন, দাদামশায়ের সেবা—অর্থাৎ, নিশ্বাস নেবার সময় নেই। তাঁর হাতে কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথী ঔষধের আড়ৎ,—

অনেকেই আসে তাঁর কাছে ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা নিতে। যে-পল্লীতে তিনি থাকেন সেখানকার মেয়েরা দুপুর বেলায় তাঁর কাছে আসে শেলাই শিখতে, লেখাপড়া করতে। তিনি তাদের জামা, শেমিজ, ফ্রক্ ইত্যাদি তৈরী করে দেন। তাঁর জন্য বাড়ির কোথাও জঞ্জাল জমে না, ঘর-দোর তাঁকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। বাড়িতে কেউ পীড়িত হলে সেবা-শুশ্রূষার ভার তাঁর উপর। পালা-পার্বণ, পূজা-আর্চা, নিয়ম-নিত্য—সমস্ত কিছুর আয়োজন ও বিলিব্যবস্থা তাঁর হাতে। শ্বশুরবাড়ি মাঝে-মাঝে যান্, শাশুড়ি তাঁকে স্নেহ করেন, দেবর ও ভাসুর তাঁকে সম্মান করেন, কিন্তু সেখানে আছে নাকি স্বার্থের গন্ধ। তাঁদের ইচ্ছা, ভ্রাতৃজায়া তাঁদের সংসারে এসে থাকুন, মাসে মাসে মাসোহারার টাকাগুলো তাঁদের হাতে আসুক,—কিন্তু এই গোপন স্বার্থপরতা রাণীর দৃষ্টি এড়ায়নি। যাঁর জন্য শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর মৃত্যু এক দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করেচে।

'শ্বশুরবাড়িতে শোষণ আর মামার বাড়িতে শাসন।'—রাণী বললেন, 'মনে পড়ে কিছুকাল আগে পর্যন্তও একটু বিলাসপ্রিয় ছিলাম—'

মুখের দিকে তাকাতেই তিনি হেসে বললেন, 'ভারি অন্যায় বিধবার বিলাসপ্রিয়তা—নয়? কিন্তু সে অতি সামান্য, ফর্সা জামা-কাপড় পরা আর চুল আঁচ্ড়ে খুশী থাকা এমন কী অপরাধ? অথচ সেই অপরাধে দাদামশাই একদিন ডেকে যখন আমার চুল ছেঁটে ফেল্তে বাধ্য করলেন, তিন দিন আমার চোখে জল পড়েচে—আমার চুল পায়ের কাছে পড়তো! জানি চোখের জল ফেলা ছেলেমানুষী, সর্বস্ব ত্যাগ করলেই বিধবার জীবন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাও জানি, কিন্তু—' বলতে বলতে তিনি ম্লান হাসি হাসলেন।

মাসিচটি পার হয়েচি। পথ সমতল, কোথাও-কোথাও গ্রামের চিহ্ন দেখা যাচ্চে। গাছের ছায়ায় ঢাকা চওড়া পথ, পাহাড়ের চূড়াগুলি দূরে দূরে সরে গেচে। পল্লী-প্রান্তর নীরব, হু হু করে বসন্তকালের হাওয়া চলেচে। পথে আর ঝরণা পাওয়া যাচ্চে না, রামগঙ্গা নদী আছে কাছাকাছি। বুড়কেদারে মধ্যাহ্নের আহারাদি শেষ করে আবার অগ্রসর হলাম। আজকাল সুখ এবং স্বস্তি দুইই লাভ করেচি। ঘোড়ায় চড়ে চলি এবং দিদিমার কাছে রাঁধা ভাত পাই, বাসনও মাজতে হয় না। যেদিন দুঃখের মধ্যে হরিদ্বার থেকে আমার যাত্রা সুরু হয়েছিল, সেদিন স্বপ্নেও ভাবিনি এত আনন্দের ভিতর দিয়ে আমার যাত্রা শেষ হবে। চারুর-মা প্রমুখ গোপালদার দল একবেলার পথ এগিয়ে গেচে, ইচ্ছা হচ্চে ছুটে গিয়ে তাদের ধরে আমার সৌভাগ্যের কথা শোনাই। গোপালদার ধৈর্য ও সহনশীলতায় আমি সত্যই বিস্মিত ও মুগ্ধ। কিন্তু একটা বড় চক্ষুলজ্জার কারণ ঘটেচে। দিনের বেলা দিদিমা ও রাণী রেঁধে দেন, চৌধুরীমশাই যত্ন করে খাওয়ান, অথচ মূল্য বাবদ কিছু গ্রহণ করতে রাজি নন্। আহারের সময় আমি সঙ্কুচিত হয়ে উঠি। আমার সঙ্কোচ ও চক্ষুলজ্জা দেখে রাণীও একটু ইতস্তত করেন। আমার সম্মানে আঘাত লাগা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সজাগ।

সন্ধ্যায় পৌঁছানো গেল নলচটিতে। মনোরম স্থান। কাছেই একটা কদলীর জঙ্গল, তারই পূর্বদিকে ছোট্ট একটি ডাকঘর, ডাকঘরের নিকটেই ধর্মশালা। কিয়দ্দূরে একটি নিভৃত পুরাতন মন্দির, তারই কাছে জনকয়েক সংসারত্যাগী সাধুর একটি আশ্রম। ঘোড়া থেকে নেমে আমরা চটিতে এসে রাত্রির আশ্রয় নিলাম।

আর সেই দুস্তর পথ নেই, সেই সঙ্কীর্ণ আকাশ,—পর্বতরাজির

জটলার মধ্যে প্রাণান্তকর চড়াই-উৎরাইও নেই। এখন আকাশের বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়, নদী এখন আর গর্জমান নয়, স্রোতের সেই অবিরাম ঝর ঝর শব্দ আর নেই,—এখন দেশের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেচি। সকালবেলায় যখন রাণীর সঙ্গে দেখা হ'লো তিনি বললেন, 'এবার একটু আল্‌গা-আল্‌গা চলবেন, আবার ওরা সন্দেহ করেচে···পিসি গোয়েন্দাগিরি করচে। বাস্তবিক, কি ইতর বলুন ত!'

বললাম, 'সবাই মানবে কেন আমাদের আচরণ?'

'আপনার ঘোড়ায় চড়া নিয়ে ওরা নানা মন্তব্য শুরু করেচে। এক কাজ করুন, ঘোড়াটা আপনি ছেড়ে দিন, তেমনি আগেকার মতন হেঁটে চলুন।'

'তাতে কী সুবিধে হবে?'

'সুবিধে না হোক, সন্দেহ ঘুচ্‌বে। আর আপনাকে ঘোড়ায় চড়তে হবে না।'

বললাম, 'তথাস্তু'।

তিনি বললেন, 'একটা সামান্য কথা নিয়ে সন্দেহ। পথে দাঁড়িয়ে আপনি সেই-যে দুধ কিনে আমার হাতে দিয়েছিলেন, সেই কথা সালঙ্কারে পিসি বল্‌ছিল দিদিমাকে। ভাগ্যি চৌধুরী মশাই ছিলেন সেখানে, তিনি বললেন, দুধ কিনে খাওয়ানোতে কোনো অন্যায় হয় নি। পথে এমন সবাই সবাইয়ের জন্যে করে।—যান্ আপনি এগিয়ে, আঃ একটু পা চালিয়ে হাঁটুন বলচি, ওরা আসচে।'

সে-এক কৌতুকপ্রদ ব্যাপার। যেন একটা সাংঘাতিক খেলায় মেতেচি দুজনে। বেশ বোঝা যায় মেয়েদের সম্বন্ধে মেয়েদের দৃষ্টি কি সজাগ, কেউ কারোকে বিশ্বাস করে না। কোথাকার কে এক সম্পর্ক-পাতানো পিসি,

সঙ্গিনীদের চরিত্র-রক্ষার জন্য তার কী মাথা-ব্যথা এবং আগ্রহ। তার ধারণা, সে না থাকলে বাংলাদেশের বহু নারী চরিত্রভ্রষ্টা হয়ে যেত। ভাগ্যি সে ছিল!

রামগঙ্গার তীরে চৌঘুটিয়া চটিতে এসে প্রচার করে দিলাম, কোমরে ব্যথা হয়েচে, ঘোড়ায় আর চড়বো না। রাণী অলক্ষ্যে হাসলেন। পাতার একখানি কুটিরের মধ্যে রান্নাবান্নার আয়োজন চলতে লাগলো। নিকটেই একটি গ্রাম, কয়েকখানি দোকান,—একখানি কামারের দোকানে হাতুড়ির কাজ চলেচে। চটির পিছনে নদীর ধারে অল্প অল্প চাষ-আবাদের চিহ্ন দেখলাম। আজ অনেক দিন পরে স্নান করবার সুবিধে পাওয়া গেল। আবহাওয়াটা গরম! নদীর ধারাটি শীর্ণ, স্রোতোহীন, জল অতি নোংরা। তবু দোকানে যখন সাবান কিন্‌তে পাওয়া গেল তখন আর কি, নদীর ধারে বসে ধুতি, পাঞ্জাবী ও চাদর পরিষ্কার করে নিলাম। দেখা গেল, ঘোড়া, গোরু ও মানুষ পাশাপাশি স্নান করচে। রোদ বেশ প্রখর হয়ে উঠেচে; গ্রীষ্মদেশের দিকে এসেচি, কথায়-কথায় তৃষ্ণা পায়, পরিশ্রমের শক্তি কমে এসেচে। আর সামান্য পথ বাকি, দিন দুই পরেই আমরা রাণীক্ষেত গিয়ে পৌছবো। স্নান সেরে এসে দেখি, জলের নিতান্ত অভাব। লোকপরম্পরায় জানা গেল, কিছুদূরে এক ভূমিগর্ভে চোঁয়ানো ঝরণার জল পাওয়া যায়। বালতি নিয়ে রৌদ্রপথে ছুটলাম। যে-উপায়ে সেদিন এক জলচিহ্নহীন শুষ্ক নদীর পাথরের নীচে থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করে এনেছিলাম তা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। দুই হাতে দুই বালতি জল এনে দিয়ে সকলকে খুশী করে দিলাম। আহারাদির পর দিবানিদ্রা। দিবানিদ্রার ভিতর দিয়ে আমরা নূতন উদ্যম সঞ্চয় করি।

নিদ্রার পর যথারীতি মোটঘাট বেঁধে যাত্রার আয়োজন করা গেল।

ঘোড়ায় চড়ার নেশা ফুরিয়েচে, অতএব তার পিঠে ঝোলা-কম্বল চাপিয়ে এক বৃদ্ধাকে চড়িয়ে দিলাম, বৃদ্ধা আড়ষ্ট হয়ে চলতে লাগলো। অপরাহ্নের রৌদ্র তখনো রয়েচে। নিকটেই রামগঙ্গার পুল; পুল পার হয়ে দক্ষিণ দিকে আমরা অগ্রসর হলাম। পথ সমতল, দু'ধারে দেবদারু, খেজুর ও আমগাছের জঙ্গল, বাঁ-দিকে বহুদুর-বিস্তৃত পাহাড়ের সানুদেশে চাষের জমি। সকলেই একসাথেই চলেচি, রাণীকে নিভৃতে পাবার এবেলায় আর সুযোগ মিলচে না। ইচ্ছা করেই আজ চলেচি পিছনে-পিছনে। পাশে-পাশে আছেন চৌধুরী মশায়। পিসি রীতিমত পাহারা দিতে-দিতে দিদিমা ও অন্যান্য সঙ্গিনীদের সঙ্গে চলেচে। রাণীর দিকে তার প্রখর লক্ষ্য। বিড়াল যেন ওৎ পেতে থাকে ইঁদুর ধরার জন্য।

কিন্তু বিধি সদয়। দেখতে-দেখতে আকাশের চেহারা গেল বদ্‌লে। দিগ্‌দিগন্ত আবৃত করে কৃষ্ণকায় মেঘ এল চারিদিক থেকে ঘনিয়ে। গাছের আগায় উঠলো ঝড়ের হাওয়া, দেখতে-দেখতে মুষলধারে নাম্‌লো বর্ষণ। পাহাড়ের বৃষ্টি বিপজ্জনক, জলের ফোঁটাগুলি তীব্র ও ধারালো। সকলে বিভ্রান্ত হয়ে কে কোথায় আশ্রয় নেবে ঠিক নেই। কিন্তু আশ্রয়ই বা কোথায়? ভিজতে-ভিজতে দ্রুতপদে চলা ছাড়া আর উপায় ছিল না। অনেকেরই কাছে ছিল অয়েলক্লথ—সাধারণত অয়েলক্লথ ঢাকা দিয়ে এদেশে কাণ্ডিওয়ালারা যাত্রীদের মালপত্র বহন করে;—সেই অয়েলক্লথের টুকরো মাথায় চাপিয়ে দিদিমা ও আরো দু'একজন চল্‌তে লাগলেন। রাণীকেও তাঁরা এক টুকরো অয়েলক্লথে ঢাকৃতে ছাড়লেন না, ঘোড়ার পিঠে এক কিম্ভূতকিমাকার চেহারা নিয়ে তিনি চললেন। আমি পিছন থেকে হাসছিলাম।

ঝড়। ঝড় আর বৃষ্টি। বৃষ্টি আর বজ্রপাত। গাছপালাগুলো যেন

পাগলের মতো বেপরোয়া হয়ে উঠলো, বৃষ্টির বেগে চারিদিক প্লাবিত হতে লাগলো। ছুটতে-ছুটতে কে কোথায় গেচে, চৌধুরীমশায় পর্যন্ত নিরুদ্দেশ। সেই দুর্যোগ ও জলধারার মধ্যে রাণী রাশ টেনে তাঁর ঘোড়ার গতি মন্থর করে দিলেন। পাশ কাটিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিলাম, তিনি ডেকে বললেন, 'থাক্, আর ছুটতে হবে না, ভিজতে যেন কিছু বাকি আছে আপনার! না একটা ছাতা, না একটা ঢাকা,—আপনার সন্ন্যিসিপনা দেখলে হাড় জ্বালা করে!'

'আপনি ত দিব্যি চলেচেন।' মুখ ফিরিয়ে বললাম।

'দিব্যি চল্‌তে আর আপনি দিচ্চেন কই? ইচ্ছে হচ্চে আমিও হাল্ ছেড়ে দিয়ে ভিজে-ভিজে চলি আপনার মতন। বলি, দেখলেন ত? এবার ওদের চিন্‌তে পারলেন? পরের জন্য যাদের বেশি মাথা-ব্যথা, বিপদের সময় নিজের প্রাণ নিয়েই তারা পালায়।—সত্যি, আপনার এত সাধের সাবান-কাচা জামা-কাপড়ের কী দশা হ'লো দেখুন! দ্বিতীয় বস্ত্র ত নেই, দাতাকর্ণের মতন সব দান করে এলেন কর্ণপ্রয়াগে, এসব এখন শুকোবেন কেমন করে? চাদরখানাও ত গেল!'

বললাম, 'গায়ে-গায়ে শুকিয়ে যাবে।'

বৃষ্টির ঝাপটায় আমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছিলাম। চোখে, মুখে, সর্বাঙ্গে আমাদের জল। তিনি জলে-ভেজা মুখে কপাল কুঞ্চন করে বললেন, 'গায়ে গায়ে! গা জ্বলে যায় আপনার কথা শুনলে। অসুখ করলে এখানে দেখবে কে শুনি?'

'কেন, আপনি?'—হেসে বলেই ফেললাম কথাটা।

'তা হলেই ষোলো কলা পূর্ণ হয় বটে।'—হঠাৎ পথের দিক চেয়ে ঘোড়াটাকে চাবুক মেরে তিনি দ্রুতবেগে ছুটিয়ে দিলেন।

পাহাড়ী দেশের বৃষ্টি, দেখতে-দেখতে আবার আকাশ হাল্‌কা হয়ে এল। শূন্য মনে ধীরে-ধীরে চলছিলাম। বৃষ্টি ধরে গেল, ঝড় থাম্‌লো, আকাশ হ'লো পরিষ্কার, পথে একটা পুল পার হয়ে দক্ষিণ দিকে চললাম। দেখতে-দেখতে শেষ অপরাহ্ণের ম্লান রৌদ্র আবার নির্লজ্জের মতো দেখা দিল। আরো মাইল দুই পথ হাঁটতে-হাঁটতে সন্ধ্যার সময় আমরা এক ধর্মশালার কাছাকাছি এসে পৌছলাম। স্থানীয় কয়েকজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক এক দোকানের ধারে বসে গল্প করছিলেন। বাঙ্গালীর দল দেখে তাঁরা অগ্রসর হয়ে এসে আলাপ করলেন। সুমুখের ধর্মশালাটা বাসের অযোগ্য বিবেচনা করে তাঁরা এদিকে একটা স্কুল-ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। স্কুল দেখেই বোঝা গেল, আশেপাশে গ্রাম আছে। পণ্ডিতজি এলেন, তাঁর সঙ্গে জনকয়েক বিদ্যার্থী। তারা এসে দেশের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে লাগলো,—কংগ্রেসের অবস্থা কিরূপ, মহাত্মাজি কবে ছাড়া পাবেন, ধরপাকড় এখনো চল্‌চে কি না,—নানা প্রশ্নের ভিতর দিয়ে তাদের উৎসাহ ও আগ্রহ দেখে চমৎকৃত হলাম। শোনা গেল, আল্‌মোড়া থেকে মাঝে-মাঝে তাদের কাছে দেশের সংবাদ আসে। ইংরাজ-শাসনের প্রতি তাদের ঘৃণা তারা জানিয়ে দিল।

স্কুল-ঘরের বারান্দায় আমাদের আস্তানা পড়লো। বারান্দার কোলে কয়েকটি ফুলের গাছ; পাশেই ছেলেদের খেলবার খানিকটা খোলা জমি, পশ্চিমদিকে কাঠের একটা কারখানা। বারান্দার একটা দিকে আমরা সবশুদ্ধ চৌদ্দজন যাত্রী আশ্রয় নিলাম। বৃষ্টির জন্য তখনো কাপড়-চোপড় ও বিছানাপত্র স্যাঁত-স্যাত করচে, কি ভাগ্যি যে পথের হাওয়ায় খানিকটা শুকোতে পেরেছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনালো, দু'তিনটি লণ্ঠন জ্বালানো হ'লো। যাত্রীর জটলার মধ্যে রাণী ও দিদিমা

ব্যস্ত হয়ে রইলেন। আজ অনেকদিন পরে ঝুলির ভিতর থেকে কাগজ আর কলম বার করে নোট্ লিখতে বসলাম। কত পথ, কত ঘটনা, কত স্মৃতি। জীবনের বাহ্য কাহিনীগুলি লেখা চলে, কিন্তু তার সর্বোত্তম মুহূর্তগুলির দুঃখ ও আনন্দকে ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন কাজ। কলম নিয়ে বারান্দার একান্তে বসে তাই প্রথমেই মনে হ'লো কী লিখি। লিখে জানানো যায় কতটুকু!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'লো কিন্তু এক ছত্রও নোট লেখা হ'লো না। এবেলা আমাকে রান্না করতে হবে, চৌধুরীমশায় খাবেন আমার হাতে। বারান্দা পার হয়ে আসবার সময় আজ সন্ধ্যায় আবার সেই চিত্তচমৎকার দৃশ্য দেখলাম। জপ শেষ করে নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে রাণী বসে আছেন, হাতে তাঁর রুদ্রাক্ষের মালা। লণ্ঠনের আলোয় আমার দিকে তাকালেন,—প্রসন্ন আয়ত চক্ষু, সে-চক্ষে স্বপ্ন ও তন্দ্রা জড়ানো, আধনিমীলিত। যে-নারীকে দেখেচি পথে-পথে, যাকে দেখেচি ঘোড়ার পিঠে, যার কলহাস্য, কলকণ্ঠ ও প্রাণ-চাঞ্চল্যে সারা পথ সচকিত ও মুখর —এই মায়াবী যোগিনী সে নয়, এ তার এক আমূল পরিবর্তিত প্রতিকৃতি। দেহকে অতিক্রম করে তিনি যেন কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েচেন, আমাকে চিন্‌তে পারলেন না। চোখের উপর চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিলাম কিন্তু মাথা আমার হেঁট হয়ে এল, মুখ ফিরিয়ে ওপাশে গিয়ে দিদিমাকে বললাম, 'কিছু আন্‌তে হবে আপনাদের জন্যে?'

দিদিমা বললেন, 'হবে ভাই, দোকানে আছে ছোলাভাজা আর প্যাঁড়া, তাই আনো—এই নাও পয়সা। প্যাঁড়াই এদেশে গতি।'

কিয়ৎক্ষণ পরে প্যাঁড়া আর ছোলাভাজা এনে দাঁড়াতেই রাণী বললেন, 'আমার হাতে দিন, দিদিমা বসেচেন জপে।'

তাঁর হাতেই দিলাম, তিনি হেসে বললেন, 'মেনি থ্যাংক্স!'

পরদিন বেলা আটটা। দ্বারিহাটের পাহাড়ী ছোট শহর পার হয়েচি। দুইটি পথ গেচে দুইদিকে, একটি আলমোড়ার দিকে, অন্যটি গিয়ে ছুঁয়েচে রাণীক্ষেত। রাণীক্ষেতের পথ ধরলাম। কাছেই ভৈরবের একটি পুরাতন মন্দির। মন্দিরের পিছন দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, প্রান্তরের অসমতল কোলে-কোলে পাহাড়ী গাঁ। পথ ধীরে-ধীরে নীচের দিকে নামলো। এত-দিন পরে আবার শ্রমিক নরনারীর দেখা মিল্‌চে। কারো মাথায় কাঠ, কারো ঘাস, কারো বা গমের বস্তা; ঘোড়ার পিঠে কেউ বা মালপত্র চড়িয়ে চলেচে। আমাদের দলে সবসুদ্ধ পাঁচটা ঘোড়া; চারটের পিঠে যাত্রী, একটার পিঠে মালপত্র। সারবন্দী হয়ে খটাখট শব্দ করে পথের ধুলো উড়িয়ে ঘোড়ার দল চলেচে। অশ্বশ্রেণীর যে-রকম সাজ-সরঞ্জাম, এবং তাদের পিঠে বুড়ীদের চড়ে' যাওয়ার যে হাস্যকর ভঙ্গী, তা'তে মনে হ'লো অশ্বারোহণের মতো লজ্জাকর ব্যাপার পৃথিবীতে আর কিছু নেই। বুড়ীদের দিকে চেয়ে রাণীর হাসি আর থামে না।

আজ রোদ অত্যন্ত প্রখর লাগ্‌চে, গরমে সবাই ক্লান্ত। ক্ষণে-ক্ষণে গলা শুকিয়ে উঠ্‌চে। ঝরণাও নেই, জলাশয়ও নেই। জলের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। কাল থেকেই রীতিমতো জলকষ্ট শুরু হয়েচে। শুষ্ক রুক্ষ গাছ-পালাহীন পাহাড়, ছায়া কোথাও নেই। গরমের এলোমেলো বাতাসে থেকে-থেকে চারিদিক ধুলোয় অন্ধকার হয়ে আসচে।

জল, জল, জলের জন্য আমরা বড়ই কষ্ট পাচ্চি। সব রকমের পীড়ন সহ্য করেচি, কিন্তু জলাভাবের পীড়ন এই প্রথম। একটি ঘটি জল যদি কেউ এখন দেয় তবে এই ঝোলা-কম্বলটা অনায়াসে তাকে দান করতে

পারি। চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত তৃষ্ণায় জলের জন্য চারিদিকে তাকাচ্চি, কিন্তু কোথাও জল নেই। দশ মাইল পর্যন্ত এই জলকষ্ট।

বেলা আন্দাজ বারোটার সময় এক দোতলা চটিতে এসে উঠলাম। এখান থেকে দূরে পাহাড়ের মাথায় রাণীক্ষেতের অস্পষ্ট শহরটি দৃষ্টিগোচর হচ্চে। চটিতে পৌঁছেই জলের জন্য ছুটোছুটি করলাম। কাছেই খানিকটা চাষের জমি, তারই আ'ল পার হয়ে নীচে নেমে গেলে নাকি একটি ঝরণার ধারা দেখা যায়। কিন্তু খানিকটা বিশ্রাম না নিলে আর চল্‌তে পারচিনে। একটা দোকানঘরের দোতালায় উঠে ভিতরে বসে পড়লাম,—একেবারে চলৎশক্তিহীন। দু'চারজন মাত্র এসে পৌঁছেচেন, বাকি চৌধুরী মশায় ও দিদিমারা কয়েকজন। রাণী অদূরে বসে আমার অবস্থাটা বোধ-করি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। কারো মুখে আর কথা নেই। এমন সময় মেঝের নানা জঞ্জালের ভিতর থেকে কি-একটা চক্‌চক্‌ করে উঠ্‌লো, তুলে দেখি ছোট একটি তাম্রপাত, তার উপর লক্ষ্মীর দুইখানি চরণ ছাঁচে আঁকা। তখনই উঠে গিয়ে বিনামূল্যে সেই তামার পাতটি রাণীকে উপহার দিলাম। লক্ষ্মীর চরণ-চিহ্ন দেখে তিনি সাদরে সেখানি নিয়ে কাছে রেখে দিলেন। সামান্য রইল অসামান্য হয়ে।

অনেক কষ্টে জল সংগ্রহ করে তৃষ্ণা মেটানো গেল। দিদিমারা এলেন, তাঁর সঙ্গে এলেন বিজয়াদিদি কাঁদতে-কাঁদতে। কী ব্যাপার? দেখা গেল তাঁর পায়ের তলায় পাথরের কুচি ফুটে অপরিসীম যন্ত্রণা হচ্চে, পথ আর তিনি চলতে পারচেন না। সকল টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ ব্যর্থ হ'লো। বিজয়াদিদি পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় বিলাপ করতে লাগলেন। রান্নাবান্নার আয়োজন চল্‌তে লাগলো।

পড়ন্ত বেলায় আবার যাত্রা। বিজয়াদিদির অবস্থা দেখে রাণী নিজের

ঘোড়াটি তাঁকে দান করলেন। অতএব আজ প্রথম রাণীর পদব্রজে যাত্রা। পায়ের ব্যথা তাঁর সামান্যই আছে, এইটুকু পথ কোনোক্রমে যেতে পারবেন। এ-ক'দিন তিনি একজোড়া চটি পায়ে দিচ্ছিলেন, আজ আবার পায়ে পরলেন ক্যাম্বিসের সাদা জুতো। পথ এ-বেলা অল্প-অল্প উৎরাই, চল্‌তে কষ্ট নেই। আজ সকাল থেকে কথাবার্তা বলবার একেবারেই সুযোগ মিল্‌চে না, ডাইনে-বাঁয়ে সতর্ক চক্ষু, পিসির নিঃশব্দ পাহারা। এখন আর শাসন নেই, কেবল সতর্কতা। রাণীও তেমনি মেয়ে, যেন কিছুই নয় এমনি ভাবে গাল্‌-গল্প কর্‌তে-কর্‌তে সঙ্গিনীদের সঙ্গে চলেচেন, আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ করবারও তাঁর অবসর নেই। সব বুঝলাম। আমিও অখণ্ড ঔদাসীন্য বজায় রেখে আগে-আগে চলেচি, রাণীকে যেন চিনিইনে। রাণী আবার কে?

গ্রামের ভিতর দিয়ে ভাঙা-চোরা আঁকা-বাঁকা পথ, সেই পথে একটা জীর্ণ কাঠের সাঁকো পার হয়ে বেলা চারটে লাগাৎ আমরা গগাস-এ এসে পৌঁছলাম। গগাস্ একটি জলাশয়ের তীরবর্তী ক্ষুদ্র পাহাড়ী শহর। পায়ে-হাঁটা আমাদের কয়েকজন যাত্রীকে দেখেই স্থানীয় কয়েকজন লোক ঘোড়া এনে হাজির করলো। ঘোড়া দেখেই রাণী খোঁড়া হয়ে বসলেন। বললেন, 'এইটুকু হেঁটেই, বুঝলে দিদিমা, সেই ব্যথাটা আবার...সত্যি কী যে হ'লো আমার!'

অতএব এবারে একটা সাদা রঙের তেজীয়ান্ ঘোড়া তিনি বেছে নিলেন। ভাড়া রাণীক্ষেত পর্যন্ত মাত্র একটাকা। সঙ্গে একটা ছোকরা সহিস যাবে। এবারে চমৎকার সওয়ারি ঘোড়া। আমাকে ইঙ্গিতে এগিয়ে যেতে বলে' তিনি ঘোড়ায় উঠলেন।

আবার সুমুখে এক বিপুল বিস্তীর্ণ চড়াই। প্রথমটা ভয় পেয়ে গেলাম।

কিন্তু এইটিই শেষ চড়াই, শেষ পাহাড়, এইটি কোনো রকমে পার হতে পারলেই আমাদের মুক্তি। পথের হাত থেকে আমরা মুক্তি পাবো এবারের মতো, একথা ভাবতেই আনন্দ লাগচে। অথচ পথ আমাদের এবারের মতো বিদায় দেবে একথা ভাবতেও বেদনা অনুভব করচি। কিন্তু কেন—কেন ভালো লাগচে এই আনন্দ-বেদনার তরঙ্গ-দোলা? কী পেয়েচি? কীই-বা হারাবো?

আর মাত্র সামান্য ছয় মাইল পথ। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখা গেল, খানিকটা বেশি পরিশ্রম করে সোজা উঠে গেলে পথ অনেকখানি শর্ট্‌কাট্‌ হয়। তাই করা গেল, দুর্দান্ত তেজে বেপরোয়া হয়ে পিঁপড়ে যেমন দেয়াল বেয়ে ওঠে তেমনি করে প্রায় আধ ঘণ্টা পরিশ্রমের পর খাড়া পাহাড়ের চূড়ার উপরে উঠলাম। অন্যান্য যাত্রীরা এ-পথের হদিস জানে না, তারা বহু পিছনে পড়ে রইলো। এর নাম কৌশলে পথ চুরি করা। যাদের ধারণা আমি পিছনে-পিছনে আসচি, তারা শেষ প্রান্তে গিয়ে দেখবে আমিই সকলের আগে। পথের ধারে একখানা বড় পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া গেল। যা ভেবেচি তাই, রাণীর সেই সাদারঙের তেজীয়ান্‌ ঘোড়াটা আসচে ছুট্‌তে-ছুট্‌তে। কাঁধে আমার লালরঙের একটা গামছা ছিল, সেইটে তুলে নাড়তেই তাঁর চোখে পড়লো। রক্তপতাকার সিগ নাল! ঘোড়াটাকে আরো জোরে ছুটিয়ে তিনি কাছাকাছি এসে পড়লেন। প্রথমেই হাসতে-হাসতে বললেন, 'এবার খুব জব্দ হয়েচে ওরা—ওরা জানে আপনি অনেক পিছনে। ইস্‌, এখনো হাঁপাচ্চেন দেখচি! কিন্তু দাঁড়ালে চল্‌বে না, চলুন। কি সুন্দর ঘোড়া পেয়েচি এবার দেখেচেন? ইচ্ছে হচ্চে বাড়ি নিয়ে যাই।'—নিশ্বাস ফেলে

তিনি পুনরায় বললেন, 'পথের শেষ দিকটা ভারি আনন্দ পেয়ে গেলাম, চিরদিন মনে থাকবে।'

চলতে-চলতে আবার বললেন, 'পায়ের ব্যথা একটুও নেই, সহজেই এটুকু হাঁটতে পারতাম, কিন্তু তাহ'লে আর কথা বলা যেত না আপনার সঙ্গে···ভাগ্যি ঘোড়াটা পাওয়া গেল!'

অপরাহ্নের রোদ স্তিমিত হয়েচে। চিড়গাছের ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তাঁর ঘোড়া চলেচে। চারিদিকে একটি প্রশান্ত নীরবতা। এক-একবার বাতাস বয়ে যাচ্ছে—সে-বাতাস অরণ্যের মর্মরধ্বনি নয়, সেটি চিড়বনের দীর্ঘ নিশ্বাস, তা'তে যেন সুস্পষ্ট একটি বেদনার ঝলক। আমাদের এই অর্থহীন অচিরস্থায়ী বন্ধুত্বের দিকে তাকিয়ে কালের দেবতা যেন করুণ নিশ্বাস ফেলচেন। আজ প্রভাত থেকে ক্ষণে-ক্ষণে একটি বিদায়ের সুর ধ্বনিত হচ্চে। আমরা পরস্পরের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছিলাম, তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার সময় এসেচে। সহজে আমরা মিলেচি, সহজেই চলে যাবার চেষ্টা করচি। এ-কথা আর অস্বীকার করার উপায় নেই, আমাদের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট মমত্ববোধের বন্ধন সৃষ্টি হয়েচে, আসন্ন বিদায়ের আভাস আঘাত করচে তাকেই। আমরা জানি, আমাদের এই পরিচয়কে অধিকতর নিবিড় করচে দূরের ওই উত্তুঙ্গ পর্বতমালা, ওই নদী, ওই অরণ্য-কান্তার,—পিছনের ওই অনন্ত বিশ্ব-প্রকৃতির পটভূমি না থাকলে আমরা পরস্পরকে এমন একান্ত করে চিন্‌তে পারতাম না। তিনি মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'অনেক চৌর্যবৃত্তি করলাম আপনাকে নিয়ে, কিন্তু তার জন্যে আমার মনে কোনো গ্লানি নেই। আপনার সঙ্গে শেষের এই ক'টি দিন আমার জপের মালায় রুদ্রাক্ষের মতন গাঁথা থাকবে!'

পাইন-বনের ভিতর দিয়ে সূর্যাস্তের রক্তাভা থরথর ক'রে কাঁপছে দেখতে পাচ্চি—যেন তা'রই একটু কাঁপন রাণীর কণ্ঠেও এসে লাগলো। কিন্তু—হয়ত সেটুকু আমার পলকের ভ্রান্তি! থাক্—কোথাও কোথাও গাছের আগায় শুন্‌চি অরণ্যপক্ষীর কোলাহল, ওপারের পাহাড়ের চূড়ায় দিনান্তের ক্লান্ত রৌদ্র রাঙা হয়ে উঠেচে। তিনি পুনরায় বললেন, 'জীবনে আর হয়ত দেখা হবে না আপনার সঙ্গে, কিন্তু তা'তে আমার দুঃখ নেই। আমার সকল কথা যে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করতে পেরেচি এইতেই আমার আনন্দ—হ্যাঁ, ভ্রমণ-কাহিনী কি আপনি লিখবেন? কোন্ কাগজে?'

বললাম, 'যদি লিখি 'ভারতবর্ষে'ই লিখবো।'

'ভালোই হবে, আমি 'ভারতবর্ষে'র গ্রাহক। কিন্তু দেখবেন, সাবধান—আমার নাম-ধাম যেন প্রকাশ করবেন না!'

মিনিট দুই থেমে তিনি পুনরায় বললেন, 'অনুরোধ রইলো, আমার জীবনের সকল কথা আপনি প্রকাশ করে দেবেন। আপনার লেখায় জান্‌তে পারবো আমি কী!'

হেসে বললাম, 'সব কথাই বাদ দেবো, লিখবো সামান্যই।'

তিনি বললেন, 'আমার বিশ্বাস সুন্দর করে বললে সবই বলা যায়। আপনি সুন্দর করে লিখবেন। শুধু আমার কথা নয়, অন্য লেখাও। আপনার সকল রচনার ভিতর দিয়ে এক মহান্ জীবনকে যেন স্পর্শ করতে পারি—তার ভিতরে থাকবে মানুষের গভীর আনন্দ আর বেদনার দোলা!'

চমৎকৃত হ'য়ে তাঁর বাণী শুনে চলেচি। এই তাঁর এক অভিনব মূর্তি! তিনি বলে যেতে লাগলেন, অন্যায় ও অসত্যকে আমি যেন মার্জনা না

করি; সমস্ত সামাজিক মিথ্যাচার, নির্লজ্জ বর্বরতা, মানুষের কুটিলতা ও অবমাননা—আমার রচনায় এদের বিরুদ্ধে যেন সর্বনাশা ধ্বংসের সুর ধ্বনিত হয়। যারা বঞ্চিত হয়েচে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে না পেরে মাথা যাদের হেঁট হয়ে গেচে, শতকোটি বন্ধনের মধ্যে বাসা বেঁধে যাদের নিশ্বাস রুদ্ধ হয়েচে—আমার সাহিত্যে যেন তাদেরই আত্মার ভাষা জেগে ওঠে। আমার গল্পের মধ্যে যে-মানুষের দল আনাগোনা করবে তারা যেন সকল বিরোধ ও অসত্য থেকে মুক্তি পায়, সকল মিথ্যা ও সর্বপ্রকার লজ্জা থেকে তারা যেন মহত্তর জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

'বাংলা বই-কাগজ আমি নিয়মিত পড়ি'—তিনি বলতে লাগলেন, 'রাতে যখন সবাই ঘুমোয় তখন আমার জাগবার পালা। কিন্তু পড়ে' হাসিই পায়। এখানকার সাহিত্যের সঙ্গে খবরের কাগজের তফাৎ নেই। লেখার ভিতর দিয়ে আমি দেখি লেখকদের। কী তাদের সঙ্কীর্ণ জীবন, স্থূল দৃষ্টি! পরিশ্রম আছে কিন্তু সাধনা নেই। নিজের মনোভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজের খুশি মতন তারা স্ত্রী-পুরুষের চরিত্র আঁকে, তাই তারা হয়ে ওঠে কলের পুতুল। পড়ে হাসি পায়। কিন্তু রাগ হয় তখন যখন দেখি তাই নিয়েই অক্ষম লেখকদের নানা কসরৎ, নানান্ কারিকুরি। জীবনের পথে প্রেমের আর বীর্যের অস্বাভাবিক অভাব তাদের চোখে পড়ে না, তাই তাদের সাহিত্য হয়ে ওঠে দুর্বল লালসার ইতিহাস, মর্বিড্ মনের কুৎসিত অভিব্যক্তি।'

কমলিকা যেমন ধীরে-ধীরে এক-একটি দল মেলে এক সময় পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত হয়ে ওঠে, এই মেয়েটির পরিচয় তেমনি করেই পেলাম। সকল কথা তিনি এমন করে গুছিয়ে সেদিন বলেননি বটে, কিছু প্রকাশ

করেচেন, কিছু অপ্রকাশিতই রেখে গেচেন, কিন্তু এই ছিল তাঁর মূল বক্তব্য।

চার মাইল পথ পার হয়ে সন্ধ্যার সময় আমরা পথের শেষ চটিতে এসে শেষরাত্রির মতো আশ্রয় নিলাম। দূরে পূর্বদিকে রাণীক্ষেত শহরের কয়েকটি আলো এখান থেকে দেখা যাচ্চে; কাল প্রভাতে ওখানে গিয়ে পৌছবো। পাশাপাশি দু'টি পাকা ঘর,—এমন সুন্দর থাকার জায়গা আমরা খুব কমই পেয়েচি; ঘরের কোলে একটি খাবারের দোকান। দোকানে রাত্রির আহারের বন্দোবস্ত করা গেল। কিয়ৎক্ষণ পরেই চৌধুরী মশায় ও দিদিমার দল সসমারোহে এসে উপস্থিত হলেন। এসেই কি-একটা কারণে দিদিমার সঙ্গে চটিওলার বিবাদ বাধলো, দিদিমা একটু রাশভারি ও বদ্‌মেজাজী মানুষ,—রাগ করে জিনিসপত্র ও দলবল নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে উঠলেন। আমি একখানি চৌকি আশ্রয় করে এদিকে পড়ে রইলাম। আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে ভাবচি রাণীর শেষ কথাগুলি। শুক্লপক্ষের শীর্ণ চন্দ্র তখন পাহাড়ের পশ্চিম-পারে অস্তে নেমেচে। কিন্তু আমার মনে কোথায় জম্‌চে কথা, কোথায় লাগচে ব্যথা?

পরদিন প্রভাতে প্রথম সূর্যের আলোয়, চিড় ও পাইনের আঁকাবাঁকা অরণ্যের পথে, গোয়েন্দা-পিসির তীক্ষ্ণ দৃষ্টির উপর দিয়ে, শকুনি-সমাকীর্ণ এক শ্মশানের পাশ কাটিয়ে, চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে গল্প করতে-করতে,—এতদিন পরে রাণীক্ষেতের প্রকাণ্ড শহরের তীরে এসে পৌছলাম। নিকটেই একটা গোরা-ছাউনি, তার পাশে সরকারি দপ্তর, হাসপাতাল, ক্লাব, বোর্ডিং হাউস, ডাক-বাংলা, স্যানাটোরিয়াম—শহরের নানা আসবাব। চারিদিকে একবার শূন্যচক্ষে তাকিয়ে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে রাণী

বসে পড়লেন। এই প্রভাতকালেও মনে হ'লো তিনি যেন ক্লান্ত, বড়ই ক্লান্ত। হতাশা, অবসাদ ও কারুণ্যে তাঁর চোখ দুটি যেন আচ্ছন্ন। তাঁকে রেখে এগিয়ে গেলাম। পথ ঘুরতেই দেখা গেল অসংখ্য দোকনে, বাজার, হোটেল্, বাসাবাড়ি, ফিরিওয়ালা, অগণ্য লোকের আনাগোনা,—ওদিকে একদল মোটর বাস্। অবাক হয়ে মোটরগুলিকে দেখলাম। চাকাগুলির দিকে তাকিয়ে দ্রুতগতির আনন্দে উল্লসিত হলাম। ভুলেই গেচি যন্ত্রসভ্যতার কথা,—সমস্ত কিছুর থেকে হয়েচে বিচ্ছেদ, অনাত্মীয়তা। সভ্যতা, সৌজন্য ও সামাজিকতার খোলস আবার পরতে হবে।

প্রথমেই চায়ের দোকানে গিয়ে উঠলাম। যে নিঃশব্দ নীরবতা দীর্ঘকাল ধরে অতিক্রম করে এসেচি তার সঙ্গে এখানকার কী প্রভেদ। লোহা-লক্কড়ের শব্দ, কুকুর ও মোরগের ডাক, গির্জার ঘণ্টা, গোরা-ছাউনির ব্যাগ-পাইপের বাজনা, দোকানদারদের হাঁকডাক, মোটরের আওয়াজ, পথিকজনের উচ্ছৃঙ্খল আলাপ, হাসি তামাসা, হর্ন্‌এর শব্দ,—একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। এদের সঙ্গে আজ আমাদের কোথাও মিল নেই, আমরা যেন নূতন দেশের মানুষ; বন্য ও পার্বত্য প্রকৃতি আমাদের; সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আমাদের আচার-ব্যবহার, ধরন-ধারন—এই সহর-সভ্যতার আয়নায় নিজেদের প্রতিবিম্বিত চেহারা দেখে নিজেরাই আমরা বিস্ময় ও কুণ্ঠায় একান্তে সরে' গেলাম। আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদে, হাব-ভাবে, আচার-আচরণে, অঙ্গ-ভঙ্গীতে যেন হিমালয়ের বন্য-প্রকৃতি বাসা বেঁধেচে; পরস্পরের দিকে চেয়ে আর আমাদের মুখে কথা সরচে না। আদিম যুগের সভ্যতালেশহীন মানুষ আমরা যেন সহসা ছিটকে এসে পড়েচি তথাকথিত সভ্যতার কোলাহলের মধ্যে,—নির্জন হিমালয়ের গহ্বরে আবার আমাদের পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হচ্চে।

আমরা চৌদ্দ জন। প্রত্যেকে দু'টাকা ভাড়া দিয়ে এখান থেকে একান্ন মাইল দূরবর্তী হল্‌দুয়ানি স্টেশন্ পর্যন্ত মোটর বাস নিযুক্ত করা গেল। বেলা প্রায় আটটার সময় গাড়ি ছাড়লো। বাঁ-দিকে একটা পথ এখান থেকে নেমে আলমোড়া পর্যন্ত চলে গেচে, আলমোড়া থেকে ভিকিয়াসেন্। আমাদের গাড়ি ছুটলো কাঠ-গুদামের দিকে। পাহাড় থেকে ধীরে-ধীরে নাম্‌চি, প্রশস্ত বাঁধানো পথ, একধারে পাথরের পাঁচিল, গভীর নীচে একটি নদী বইচে, ওপারে অরণ্য,—অরণ্যের ভিতরে কোথাও-কোথাও কুলুকুলু ঝরণার ধারা চলেচে। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। ঘুর্ণির মতো ঘুরে-ঘুরে গাড়ি নামচে, কোথাও দিচ্চে ঝাঁকুনি, কোথাও দিচ্চে নাগরদোলার মতো দুলিয়ে!

অদ্ভুত লাগচে এই গতি, এই দ্রুততা; মনে হচ্চে এর চাকাগুলি আমাদেরই পা, আমরাই ছুটচি—যেন ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। আমাদের মনে, আমাদের চিন্তায়, আমাদের চরিত্রে যেন সেই অফুরন্ত পথ—পথের পর পথ। গাড়ির ভিতরে বসেও আমরা হাঁটচি—কেবলই হাঁটচি। আমাদের পা থেমে নেই। বুড়িরা গাড়ির ভিতর বমি করতে সুরু করলো,—এ তাদের সইবে কেন? তাদের শরীরের সঙ্গে লেগেচে যন্ত্রযানের সংঘাত। রাণী বসেচেন পিছনের সীট-এ, আমার বাঁ-দিকে বসেচেন চৌধুরী মশায়। গাড়িটা খুব ছোট, ঠাসাঠাসি করে বসে আছি। কারো গায়ের উপর কারো হাত, কারো পায়ের মধ্যে কারো পা জড়ানো—একবার নিজের পা চুল্‌কোতে গিয়ে কা'র যেন পায়ে হাত বুলিয়ে দিলাম। ভিড়ের মধ্যে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা কঠিন।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় হল্‌দুয়ানি স্টেশনে এসে পৌছলাম। শেষ জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে তৃষ্ণার্ত চারিদিক ধূ ধূ করচে। ঠাণ্ডা দেশ থেকে

অকস্মাৎ যেন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম, গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড আগুনের হলকায় সর্বাঙ্গ যেন ঝল্‌সে যেতে লাগল। উঁচু থেকে হঠাৎ এই গরমে নীচে নেমে কেমন যেন দম আটকে আসচে, হাঁ করে বারে-বারে নিশ্বাস টানতে লাগলাম। রাণীর মুখে আর কথা নেই, হিমালয় ছেড়ে এসে কোথায় যেন তাঁর মন ভেঙে গেচে। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে তিনি আর কথা বলচেন না; একটা দোকানের একখানা চৌকির উপরে তিনি উদাসীন হয়ে বসে রইলেন। জিনিসপত্র সমেত আবার আমরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিশালায় এসে সে-বেলার মতো আশ্রয় নিলাম। গুরু-নিশ্বাসের অস্বস্তিতে শরীর ভারি খারাপ লাগচে। রাণী যেন মন্ত্রবলে বুঝতে পারলেন আমার অবস্থা। এক সময় আড়ালে পেয়ে মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে, জননী যেমন উদ্বেলিত আকুলতায় আপন শিশুকে কুশলপ্রশ্ন করেন, তেমনি কোমলকণ্ঠে বললেন, 'এ কি হ'লো মুখের চেহারা, শরীর যেন ভালো নেই মনে হচ্চে?'

বললাম, 'নিশ্বাস টান্‌তে কষ্ট লাগচে।'

তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ও, রেসপিরেশনের গোলমাল। অমন হয়। আমার কাছে ওষুধ আছে, আপনি গিয়ে চৌধুরী মশায়কে বলুন, আমি এখনই ওষুধ বার করে দেবো।'

ঔষধ সেবন করে শরীর সুস্থ হ'লো। চৌধুরী মশায় চুপ করে শুয়ে থাকতে বললেন। শুয়েই রইলাম। দিনের বেলায় আর গাড়ি নেই, সুতরাং সমস্ত দিন বিশ্রাম নিয়ে বিকাল ছ'টায় ট্রেনে চড়ে বসলাম। বালামৌ-র টিকিট কেটেচি, নৈমিষারণ্য হয়ে যাবার ইচ্ছে। একখানি কাম্‌রা আমরা সকল বাঙালী মিলে অধিকার করেচি। ছোট গাড়ি, কিন্তু হু হু করে ছুটচে। গ্রীষ্মকালের দীর্ঘ দিন অবসান হয়ে

এল, প্রান্তরের পরপারে সূর্যদেব নামলেন অস্তাচলে, শেষ দিবসের ক্লান্ত চোখে নেমে এল তন্দ্রা, দূরের পর্বতমালা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেল। দিদিমা, রাণী ও চৌধুরী মশায় চলন্ত গাড়ির মধ্যেই বসলেন জপে।

রাত সাড়ে নটায় বেরিলি স্টেশনে গাড়ি বদল করে কাশীর গাড়িতে সবাই মিলে ওঠা গেল, গাড়িতে খুব ভিড়, অসহ্য গরম। বহু চেষ্টাতেও কোথাও ঠাণ্ডা জল পাওয়া গেল না, সবাই অস্থির, তৃষ্ণায় অবসন্ন হয়ে এক সময় হাল ছেড়ে দিয়ে বসে রইলাম। ক্লান্তি, পরিশ্রম, গ্রীষ্মাধিক্য ও অনাহারে সবাই নেতিয়ে পড়েচে, গাড়ির গতির দোলায় সকলে সহজেই ঘুমিয়ে পড়তে লাগলো। আর কোথাও টুঁ শব্দটি নেই। জান্‌লায় মাথা কাৎ করে রাণীর চোখেও তন্দ্রা এল। আমি উঠলাম বাঙ্কের উপরে।

ঠিক সময়টিতে আচম্‌কা ঘুম ভাঙ্‌লো। রাত আড়াইটে বেজে গেচে। সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। নীচে নেমে দেখি সজাগ দৃষ্টিতে চেয়ে রাণী বসে রয়েচেন। তাঁর চোখে ঘুম নেই, যেন ঘুম কোনদিনই ছিল না। প্রান্তরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে পাষাণমূর্তির মতো তিনি বসে ছিলেন।

বললাম, 'বালামৌ পার হয়ে গেচে?'

রাণী চোখ তুলে কয়েক মুহূর্ত আমাকে লক্ষ্য করলেন, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'যদি যায় তাতেই বা কি, বালামৌতে আপনার নামা হবে না।'

'কেন?'

নিদ্রিত দিদিমার দিকে চেয়ে ধমক দিয়ে তিনি বললেন, 'বাড়ি

ফিরতে হবে আপনাকে! কাশী থেকে এসেচেন, কাশীই চলুন। আর তীর্থ করবার দরকার নেই, খুব হয়েচে।'

বললাম, 'কিন্তু আমার টিকিট যে বালামৌর?'

তিনি বললেন, 'পথে বদ্‌লে নিলেই হবে।'

চুপ করে রইলাম। তিনি যেন আবার চিন্তার সমুদ্রে ডুব দিলেন। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তারপরেই আমার দিকে ফিরে উজ্জ্বল চক্ষে চেয়ে বললেন, 'এই বা কী? কতটুকুই বা? এও ত' মিথ্যে, এও ত' অর্থহীন! আপনি কি কিছু বিশ্বাস করেন? ইহকাল? পরকাল? পুনর্জন্ম?'

তাঁর ললাটে, চক্ষে, অধরে, হৃৎপিণ্ডে—এ কি অধীরতা, এ কি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ! কিন্তু সাধ্য ছিলনা তাঁর কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবার। দ্রুতগামী ট্রেনের বাহিরে ঘন অন্ধকার রাত্রিও রইলো তাঁর প্রশ্নে নিরুত্তর। চির নিরুত্তর!

দেখতে-দেখতেই গাড়ি এসে বালামৌ স্টেশনে থাম্‌লো। রাত তিনটে বাজে। নামা হ'লো না বটে কিন্তু গাড়ির ঝাঁকুনিতে সবাই জেগে উঠলো। দিদিমা উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি নামলে না ভাই এখানে?'

বললাম, 'আর থাকগে দিদিমা, এ-যাত্রায় নৈমিষারণ্য আর হ'লো না।'

'তা বটে, এত পরিশ্রমের পর,—ওমা, বসে-বসেই তোর নাক ডাকচে গা, বলি, অ রাণী? আঁহা, একেবারে বেহুঁস হয়ে ঘুমোচ্চে,—আর খাওয়া-দাওয়া নেই কিনা আজ দু'দিন—'

নিদ্রার এমন চমৎকার নিখুঁত অভিনয় দেখে পেটের ভিতর থেকে হাসি ফেনিয়ে উঠতে লাগলো। রাণী জানাতে চান না যে, তিনি এতক্ষণ জেগে ছিলেন। আমাদের মনের আকাশ আবার স্বচ্ছ হয়ে গেছে!

প্রভাতে পৌঁছলাম লক্ষ্ণৌ। প্যাসেঞ্জার-গাড়িতে গেলে অনেক দেরি হবে তাই লক্ষ্ণৌতে গাড়ি বদ্‌লে নেবার জন্য আবার নেমে পড়লাম। অনেক সময় আছে,—ঝোলা-কম্বল রেখে স্টেশনের রেস্তঁরায় চা খেয়ে বাইরে এসে একখানা টাঙা ভাড়া করে শহর-ভ্রমণে বেরোলাম। প্রভাতের আলোয় সুন্দর লক্ষ্ণৌ নগরী তখন চোখ মেলেচে। পথঘাট, দোকান-বাজার পার হয়ে, নবাবগণের প্রাসাদের কোল ঘেঁষে গাড়ি চললো। পুরাতন-দুর্গ, ঐতিহাসিক ভগ্নাবশেষ, লাটের প্রাসাদ, ময়দান, গোমতী নদী, ওপারে বিশ্ববিদ্যালয়—সকলের উপর চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে ঘণ্টা দুই পরে বাজার থেকে একজোড়া শ্লিপার কিনে আবার স্টেশনে এলাম। দেরাদুন এক্‌সপ্রেস আসতে তখন আর দেরি নেই। গাড়ি এল, জিনিসপত্র নিয়ে সবাই উঠলাম, ওঠবার সময় ছেঁড়া সাদা ক্যাম্বিশের জুতোটা লক্ষ্ণৌ স্টেশনকে উপহার দিয়ে এলাম। দুস্তর হিমালয়ের বিচিত্র ইতিহাস ও অজস্র স্মৃতি নিয়ে অনাদৃত সে পথের প্রান্তে পড়ে রইলো। কাঁকরে-পাথরে, তুষারে, বর্ষায় ওই জুতোজোড়াটা ছিল আমার পরম বন্ধু। আমার পায়ের তলায় আশ্রয় নিয়ে আমাকে সকল দুরবস্থা থেকে উত্তীর্ণ করে দিয়েচে। ওকে পথের উপরে ফেলে প্রতি পদক্ষেপে ওর হৃদয় দলিত করেচি। আজ করুণ দুই চক্ষু মেলে ও যেন বহুদূর পর্যন্ত আমার দিকে চেয়ে রইলো।

রোদ প্রখর হতে লাগলো, খোলা প্রান্তরের চারিদিকে আগুন ছুটচে। আকাশ ধূসরবর্ণ, কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই, জল-জলাশয় শুকিয়ে গেচে,—গাড়ি চলেচে দ্রুতগতিতে। দেশ-দেশান্তর পার হচ্চি, সব যেন নতুন বলে মনে হচ্চে। সমস্তই যেন পূর্বজন্মের পরিচয়, জন্মান্তরে এসে কিছুই যেন চিন্‌তে পারচিনে।

ফয়জাবাদ, অযোধ্যা, শাহাগঞ্জ পার হ'লো, পার হ'লো, জৌনপুর,—অবেলার পড়ন্ত রৌদ্রে আমরা পুনর্জন্মপ্রাপ্ত তীর্থযাত্রীর দল আবার কাশী স্টেশনে এসে পৌছলাম। সমস্ত দেশটা শেষ জ্যৈষ্ঠের আগুনে হা হা করে জ্বলচে।

স্টেশন্ থেকেই সকলকে বিদায় দিলাম। লোকালয়ের মাঝখানে এসে সকল সম্পর্ক আমাদের শেষ হয়ে গেল। আজ অনুভব করলাম আমরা নিতান্তই পর, আত্মীয়তার বন্ধন কোথাও নেই। পথের পরিচয়, পথের শেষেই চুকে গেল। ভীড়ের ভিতরে দাঁড়িয়ে রাণী কি-যেন বল্‌তে গেলেন, কিন্তু সুযোগ মিললো না, তাঁর কণ্ঠও রুদ্ধ হয়ে এল। রুদ্ধ হ'লো চিরদিনের জন্য।

নির্জন রৌদ্রের পথে পরিশ্রান্ত আমি একখানা একায় চলেচি, অতি মন্থর স্তিমিত গতি, ঘোড়ার গলায় ঝুম্‌ঝুম্ করে ঘুঙুর বাজচে। উৎসাহহীন, নিরানন্দ, নিস্পৃহ। আমি কি নিদ্রিত, আমি কি জাগ্রত? কোথায় চলেচি, কে রয়েচে পথ চেয়ে? কে চলে গেল পথ দিয়ে? মনের চেহারা এমন কাঙালের মতো হয়ে ওঠে কেন? এতবড় তীর্থ-পর্যটনে কেন নেই আনন্দ? আমি যে চিরপরিব্রাজক, চির-তীর্থপথিক! তবে কি সব মিথ্যে, সমস্তই অর্থহীন! ইহকাল, পরকাল, পুনর্জন্ম,—তবে কি বিশ্বাস নেই জীবনে, সান্ত্বনা নেই মরণে?

আধনিমীলিত চক্ষে দূরে রৌদ্র-জ্বালাময় আকাশের দিকে চেয়ে মৃদুকম্পিত স্বরে বললাম—

"কোথা বক্ষে বিঁধি কাঁটা ফিরিলে আপন নীড়ে
হে আমার পাখী,
ওরে ক্লিষ্ট, ওরে ক্লান্ত, কোথা তোর বাজে ব্যথা,
কোথা তোরে রাখি?"

শেষের কথা বলে শেষ করে চলে যাই। দিন চল্‌চে,—বছরের পর বছরও ঘুরবে। চল্‌তি সংসারের তীরে-তীরে একাকী আনাগোনা করচি। সে পথ এখনো পার হতে পারিনি, তার শেষ নেই, বিচ্ছেদ নেই। যাদের ধরে রাখতে চাই তাদের ধরাছোঁওয়া পাইনে—মাঝখানে বিপুল ব্যবধান। যাদের দূরে ফেলে গিয়েছিলাম তারা দূরে সরে গেচে। মন বল্‌চে, তীর্থ করেচ, 'সুফল' কী পেলে?—পাইনি কিছুই, কিন্তু গেচে অনেক। সেই অফুরন্ত পথের ধারে-ধারে জীবনের বহু পাথেয় ফেলে এসেচি,—বন্ধুত্ব, প্রেম, বাৎসল্য, মায়া ও মোহ। পুণ্যসঞ্চয় করতে গিয়ে আর সকল সঞ্চয়কে উৎসর্গ করে এসেচি। লোভ, লালসা, কামনা—এদের হাত বাড়িয়ে ধরতে যাই কিন্তু নাগাল পাইনে। বিদ্বেষবুদ্ধি, বিষয়লিপ্সা, আত্মপরতা ও দম্ভ—এরাও যদি একে-একে বিদায় নেয় মানুষ বাঁচে কী নিয়ে?

কোথাও যাবার জন্য পা বাড়ালেই পথ অবরোধ করে সেই মহাপ্রস্থানের পথ। সেই দুর্গম ও দুস্তর, সেই আদিঅন্তহীন অবিচ্ছিন্ন পথরেখা আমার জাগরণে, স্বপ্নে, আহারে-বিহারে, কল্পনায় ও রচনায়, আমার সকল কর্মে ও অবকাশে সাপের মতো হিল্‌হিল্ করে ওঠে, নিয়তির মতো নিরন্তর সে আমাকে আকর্ষণ করে, পথ ভুলিয়ে নিয়ে যায় ভুল পথে। সেই পথরেখা আমাকে রিক্ত ও নিঃস্ব করেচে, তবু তৃষ্ণার্ত জিহ্বা মেলে ব্যাকুল বাহু বাড়িয়ে বলে, আরো দাও, ক্ষুধা আমার মেটেনি! চলে এসো, ছুটে এসো, ছিঁড়ে এসো তোমার সকল বন্ধন!

আজ তারা কোথায় গেল যারা আমার সকলের চেয়ে নিকটের?

চিনতে পারিনে আজ অতি নিকট আত্মীয়দের; মাঝখানে অপরিচয়ের বিরাট ব্যবধান। যাদের পাশে বসি, কাছে থাকি, দুই হাতের মধ্যে যাদের জড়িয়ে ধরি, তারাও যেন অনেক দূরে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে-ছুটতেও তাদের যেন ধরতে পারিনে, তারা যেন স্মরণের সীমানার বাইরে চলে গেচে। ঘর থেকে বারান্দা, বারান্দা থেকে কলতলা, কলতলা থেকে রান্নাঘর,—মনে হয় একটা থেকে আর একটা যেন শত-শত ক্রোশ দূরে, যেন আর চলতে পারচিনে, নাগালে আসচে না। আজ দেয়ালঘেরা ক্ষুদ্র কক্ষের স্তিমিত দীপালোকে বসে ভাবচি, সেদিন যারা সঙ্গের সাথী ছিল তারাও কি আমার মতো এমনি অভিশপ্ত 'সুফল' সঞ্চয় করেচে, তারাও কি আমার মতো পারচে না সংসারের অকিঞ্চিৎকর সুখ-দুঃখের মধ্যে ফিরে আসতে? তারাও কি পথে-পথে প্রেতের মতো ঘুরে বেড়ায়?

অতীত স্মৃতির পিছনে থাকে একটি সকরুণ বেদনা, ছেড়ে চলে আসার একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস। আজ তাদের সবাইকে ভালো লাগচে, যারা ছিল আমার দুর্গমের সঙ্গী। ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যের নানা আড়ম্বর, সেখানে প্রতিযোগিতার তাল-ঠোকাঠুকি, আমরা সবাই সেখানে পরস্পর বিচ্ছিন্ন—কিন্তু দুঃখের দুস্তর তীর্থে আমাদের মধ্যে আর ব্যবধান থাকে না,—সেখানে হয় রাজার সঙ্গে রাখালের বন্ধুত্ব, সেই দুঃখের পূত সলিলে অস্পৃশ্য ও অভিজাতের ভেদাভেদ নেই।

বহুদিন পরে শা-নগরের এক পথের ধারে গোপালদার সঙ্গে দেখা।—

'কেমন আছেন গোপালদা? ভালো ত সব?'

'ভালো! তুমি?'

আর উত্তর দিতে পারিনে।

'এই আমার মণিহারি-দোকান, এসো ভাই, একটু তামাক ধরাই!'

কিন্তু ওই পর্যন্তই, তারপরে আর আলাপ জমে না। সেদিন কথা ফুরোত না, আর আজ তার কী বিপরীত, মাঝখানে আজ অনতিক্রম্য বিচ্ছেদ, পরস্পরের আর নাগাল পাইনে। তামাক পুড়তে থাকে, তিনি তার কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে এক সময় বলে ওঠেন, 'ভাবচি এবছর আবার যাবো—পালিয়ে যাই সেখানে!'

মৌখিক সৌজন্যের পর দোকান থেকে উঠে চলে আসি। দিনের পর দিন চলে যায়।

শ্যামবাজারের পথে যেতে একদা পিছন থেকে কানে এল, 'দাদাঠাকুর, কেমন আছেন?'

মুখ ফিরিয়ে দেখি, একটি স্ত্রীলোক। নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলাম।

'চিনতে পারলেন না? আমি যে সেই ভুবন দাসী।'—সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে সে পুনরায় বললে, 'আপনার দয়া কি ভুলবো কোনোদিন, আপনার জন্যেই ত মা-গোঁসায়ের হাড় ক'খানা দেশে ফিরেচে! শেঠের বাগানে একদিন পায়ের ধূলো দেবেন, দাদাঠাকুর। এই যে কাছেই উল্টোডিঙিতে।'

নানা কথার পর সে একসময় বিদায় নেয়। এরা সেদিন আমার চোখে ছিল অতি বিচিত্র, রহস্যময় মানুষ, অপার্থিব ও অলৌকিক, যুগ-যুগান্তরকালের জন্ম-মৃত্যু পার হয়ে যাওয়া তীর্থযাত্রী, দূর আকাশের কোনো অনাবিষ্কৃত গ্রহলোকের জীব,—শহর-সভ্যতার কোলাহলের ভিতর দাঁড়িয়ে এদের চিনতে পারার কথা নয়। আবার সেই হিমালয়ের পর্বত-চূড়ায়, তুষার-নদীর তীরে, অরণ্যের নিস্তব্ধতায়, প্রাণান্তকর পথের পীড়নের মধ্যে দেখা না হ'লে এদেরকে আর পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করা যাবে না।

মহানগরের রাজপথ দিয়ে ছুটে চলে যাই। পথে লোকজন জড়ো করে

বলতে ইচ্ছা করে, আমাকে তোমরা চিন্‌তে পারচো না, কিন্তু আমি যে সেই! কী পরিবর্তন আমার ঘটেচে? কেন সর্বান্তঃকরণে সবাইকে গ্রহণ করতে পারিনে? কেন এই হৃদয় হ'লো নির্দয়?

গল্প লিখি, উপন্যাস রচনা করি, কিন্তু তার ভিতরে অতি সঙ্গোপনে মানব-জীবনের এই প্রশ্ন থেকে যায়—জীবন কি সাহিত্যের চেয়ে বড় নয়? মানব-যাত্রী কি একদিন স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনায় তীর্থযাত্রা করবে না? পরম আশার বাণী কি তাদের কানে ধ্বনিত হবে না? মহত্তর জীবন, নিষ্পাপ প্রেম, অকলঙ্ক মনুষ্যত্ব, আনন্দময় মানস-সত্তা—এরা কি সেই অপরূপ তীর্থপথের পাথেয় হয়ে উঠ্‌বে না?

গেরুয়া গেচে কিন্তু বৈরাগ্য যেতে চায় না। মহাপ্রস্থানের পথের ধূলিতে ধূসর সে-বৈরাগ্য। সে-বৈরাগ্য উঠেচে ইহকাল, পরকাল, পুনর্জন্ম,—সকল প্রশ্নেরও উর্ধ্বে। তার চারিদিকে ঈশ্বর নেই, সৃষ্টি নেই, জন্ম-জরা-মৃত্যু নেই; তার পথ চিররাত্রি-চিরদিন উত্তীর্ণ হয়ে লোক-লোকান্তরের দিকে চলে গেচে। পার হবে সে মর্ত্যলোক, পার হয়ে যাবে গ্রহ-নক্ষত্র-সৌরজগৎ, মহাব্যোমের অকূল আলোক-সমুদ্র সন্তরণ করে একদা সে পৌঁছবে জীব-কল্পনার অতীত কোন্ এক স্বর্গলোকে।

'যা কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল প'ড়ে;
যে-মণি দুলিল যে-ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে;
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক্ অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে ॥'

প্রবোধকুমার সান্যাল

প্রণীত

—গল্প সংগ্রহ—

শ্রেষ্ঠ গল্প

অঙ্গার
অঙ্গরাগ
এই যুদ্ধ
যত দূর যাই
পঞ্চতীর্থ
আদি ও অকৃত্রিম

মধুচাঁদের মাস

চেনা ও জানা
বন্যাসঙ্গিনী
তরঙ্গ
কল্লান্ত
নীচের তলায়
লালরঙ্

—ভ্রমণ বৃত্তান্ত—

দেশদেশান্তর
ভ্রমণ ও কাহিনী

অরণ্যপথ
ইতস্ততঃ

পাঞ্জাব সীমান্তের পথে

—উপন্যাস—

জীবন মৃত্যু
শ্যামলীর স্বপ্ন
কাজল-লতা
স্বাগতম
সরল রেখা
জয়ন্ত
আঁকাবাঁকা
জলকল্লোল

নদ ও নদী
সায়াহ্ন
দেবীর দেশের মেয়ে
নববোধন
অগ্রগামী
ঝড়ের সঙ্কেত
আলো আর আগুন
উত্তরকাল

—চিত্র—

আগ্নেয়গিরি

তুচ্ছ

রঙীন সূতো

—ছোটদের—

শুক্‌নো পাতা
সত্যি বলছি
ওপারের দূত

আমার কথাটি ফুরোলো
দুরাশার ডাক
ছোটদের মহাপ্রস্থানের পথে

—প্রবন্ধ—

মনে মনে
পায়ে হাঁটা পথ